আদান-প্রদান

শাস্তি

কান্হুচরণ মহান্তি

অনুবাদ

অভিজিৎ সরকার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের একশো বছরের ইতিহাসে কান্হুচরণের মহত্ত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রথম ওড়িয়া উপন্যাস 'সৌদামিনী', (1877-78)-এ 'উৎকল মধুপ'-এ প্রকাশিত হয়। 'উৎকল মধুপ' মাসিক পত্রটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'সৌদামিনী' উপন্যাসের লেখক রামশঙ্করের প্রথম প্রয়াস অসার্থক হয়ে যায়। তারপর 1885-তে ওড়িয়া পত্রিকা 'প্রদীপ'-এ 'মঠর সংবাদ' (মঠসংবাদ) ও 'অশথিনী' নামে দুটি উপন্যাসোপম রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ওড়িয়া ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ উপন্যাস 'পদ্মমালী' 1888-তেই প্রকাশিত হল। এই উপন্যাসের রচনাকার উমেশচন্দ্র সরকার। দু-বছর পরে রামশঙ্করের দ্বিতীয় প্রয়াস সফল হল এবং তাঁর 'বিবাসিনী' উপন্যাস 1891-এ প্রকাশিত হল। এই উপন্যাসগুলি প্রকাশের মাধ্যমেই ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের শিলান্যাস হল। ওড়িয়ার 'উপন্যাস সম্রাট' নামে পরিচিত ফকীরমোহন এই ভিত্তিকেই অবলম্বন করেছিলেন। ফকীরমোহনের প্রথম উপন্যাস 'ছ মাণ আট গুন্ঠ' (ছয় একর আর আট গুন্ঠ জমি) 1898-তে 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল। ফকীরমোহন একজন

অসামান্য লেখক ও জীবন রহস্যের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি মাত্র চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু এই চারটি উপন্যাসে কাহিনীর গঠন, চরিত্রচিত্রণ ও ভাষাবিন্যাসের শৈলী ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যকে নতুন আদর্শ দিয়েছে। তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

1918-তে ফকীরমোহন স্বর্গারোহণ করেন। তারপর ফকীরমোহনের যুগ ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমবিকাশে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। সাতজন লেখকের সহযোগে এক অপূর্ব রচনা 'বাসন্তী' 1924-26-এ প্রকাশিত হয়। তারপর মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস 'মনে-মনে' (1928), সামাজিক রাজ-নৈতিক পৃষ্ঠভূমি অবলম্বনে রাষ্ট্রচেতনাবোধক 'মাটির মণিষ' (মাটির মানুষ) 1931-এ প্রকাশিত হয়। 'মুকুর উপন্যাসমালা' ও 'আনন্দ লহরী উপন্যাসমালা' ইত্যাদি প্রকাশন সংস্থার সংগঠিত প্রচেষ্টায় ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের গুণাত্মক ও সংখ্যাত্মক বৃদ্ধি হয়েছে। ফলত কাব্যরসিক ওড়িয়া পাঠকদের মধ্যে উপন্যাস বিভাগ অধিক লোকপ্রিয় হতে শুরু করে। ওড়িয়া উপন্যাসের বিকাশের এই দ্বিতীয় পর্বে যাঁরা সফল রচয়িতা, তাঁদের মধ্যে তরুণ উপন্যাসিক কান্হুচরণ।

1924-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উৎসবে ব্যসন' (উপন্যাসটি অপ্রকাশিত) রচিত হয়। তারপর পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সীমায় তিনি লেখা অব্যাহত রেখেছেন এবং প্রায় 50 টি উপন্যাস লিখেছেন। ফলত আজ তিনি বিশ্বের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন।

□

কান্হুচরণের জন্ম হয়েছে 1906-এ। বি.এ. পর্যন্ত পড়ার পর 1930-এ তিনি ওড়িষা সরকারের চাকরি নেন। কেরানী হিসেবে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু অবসরের সময় তিনি ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে কারোর এক ব্যঙ্গপূর্ণ ঠাট্টা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। কথাটা হ'ল—"ওড়িয়া ভাষায় একটিও ভালো উপন্যাস নেই।" প্রথম থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল,

এই ব্যঙ্গের ফলে তা আরও গভীর হতে শুরু করল। ফলত ওড়িয়া উপন্যাসের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একদিনও কলম ছাড়েন নি। সরকারী ও পারিবারিক কাজে সারাদিন তিনি ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রে নিদ্রাসুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে লিখতে বসে যেতেন। তাঁর নিরলস একনিষ্ঠ সাধনাতেই ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্য সমৃদ্ধ ও লক্ষণযুক্ত হয়েছে। প্রতি দু-এক বছর অন্তর কোন-না-কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 1926-এ 'তথাস্তু', 1929-এ 'বালি-রাজা' 1930-এ 'অরুণা' ও 'পলাতক', 1931-এ 'নিষ্পত্তি', 1933-এ 'স্বপ্ন না সত্য' ও 'সডর শেষ', 1934-এ 'দুনিয়ার দাউ', 1935-এ 'হা অন্ন', 1937-এ 'উলটপালট', 1939-এ 'পরকিয়া' ও 'উদ্‌দণ্ডী', 1940-এ 'অদেখা হাত', 1943-এ 'তুণ্ড বাইদ', 1945-এ 'ভলপাইবার শেষ কথা', 'এপারী সেপারী' ও 'শাস্তি', 1947-এ 'অভিনেত্রী' ও 'ভুলি হুয়ে না', 1948-এ 'অন্তরায়', 1950-এ 'মিলনর ছন্দ' ও 'ঝঞ্ঝা', 1953-এ 'শর্বরী', 1954-য় 'পরী', 1955-এ 'কা' (সাহিত্য অকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত), 1959-এ 'বজ্রবাহু', 1963-তে 'ঢেউ ঢেউকা,' 1966-তে 'ইতিহ', 1968-তে 'তমসা তীরে' এবং 1969-এ 'মন জানে পাপ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া 'মন গহনর তলে' 'বগ বগুলী', 'প্রতীক্ষা', 'কাডাকা লেলি' গ্রন্থ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

কান্‌হুচরণ 'মানসী' নামে একটি কবিতা গ্রন্থ-ও লিখেছেন। তিনি কয়েকটি কাহিনী সংকলনেরও রচয়িতা— 'নামটি তার চম্পা', 'চোরা চাহাণী' ইত্যাদি। এখনও তাঁর রচনা অব্যাহত। আমাদের বিশ্বাস, দীর্ঘদিন তাঁর রচনাতে ওড়িয়া সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ হবে।

কান্‌হুচরণের দৃষ্টি শুধু বিশালতায় নয়, বৈচিত্র্যের দৃষ্টিতেও মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে নবীন মানবের নতুন কথা সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে জগৎ ও জীবনের নতুন সমস্যা উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয় ও রচনাশৈলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, প্রতিটি উপন্যাসের কল্পনা একটি উদ্দেশ্যের ওপর অবলম্বিত। সেই উদ্দেশ্য একটি কাহিনীর মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং কাহিনী জীবন্ত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির মাধ্যমে। কোনো বিচার বা

প্রথার সমর্থন বা বিরোধ কথাসাহিত্যের আদর্শ হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলির মাধ্যমে সেই আদর্শ-সৃষ্টি হয়ে থাকে ('ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্য পরিচয়,' 1966)। 1930-এর পরে সমাজ-জীবনের পারস্পরিক মূল্যের যে পরিবর্তন হ'ল, যে আশঙ্কা ও বিসঙ্গতি দেখা দিল। তার প্রতিফলন কান্হুচরণের উপন্যাসে পড়েছে। তিনি সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সামাজিক পৃষ্ঠভূমিতে ব্যক্তিচরিত্রের সংঘর্ষময় করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রগুলিতে জীবন্ত হয়েছে অজ্ঞ অস্পৃশ্য দরিদ্র গ্রামবাসী, শিক্ষিত ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের নাগরিক ইত্যাদি। এক অন্ধবিশ্বাসী রূঢ়বাদী সমাজের অনুশাসন থেকে তিনি আত্মিক মুক্তি চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন জাতি, ধর্ম, ধন, মান ইত্যাদির ভেদভাবশূন্য এক আত্মপ্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিচেতনার ব্যাকুল আর্তনাদ, সমাজের স্তর গঠনকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে এসেছে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে আদর্শ ও ঔচিত্য এবং লালসা ও সংযমের মধ্যে এক সংঘর্ষভূমি হ'ল কান্হুচরণের শিল্পলোক।

কিন্তু কান্হুচরণ তাঁর আদর্শকে প্রমাণ করার জন্য ঔচিত্যকে বিকৃত বা বিভ্রমযুক্ত চিত্রে অঙ্কিত করেন নি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মানুষের অনেক স্বাভাবিক দুর্বলতা, সমাজের অনেক কঠোর নিয়ম আছে— সেগুলি অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া এবং নিজের আদর্শকে লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। সেই কারণে তাঁর রচনায় আদর্শ ও ঔচিত্যের সংঘর্ষ ঘটেছে। ফলে মানুষকেই আত্মবলি দিতে হয়েছে। সংঘর্ষের এক স্বাভাবিক পরিণাম— আত্মবলি। কিন্তু এ ব্যতীত তিনি এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন নি, যা যথার্থ নয়। তিনি স্বীকার করেছেন যে, উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের যথার্থ চিত্রণ অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। সেইদিকে তিনি সব সময় সতর্ক থাকতেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "আমার বিচারে উপন্যাসের জীবন হ'ল কথ্য। কথ্য হৃদয়গ্রাহী না হলে নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্র চিত্রণ সজীব হলেও উপন্যাস স্বাদু হয় না। পাঠক চায় যে, উপন্যাস এমন হোক যার কল্পিত কাহিনী হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কাহিনীর চরিত্রের মধ্যে পাঠক দেখতে চায় নিজেকে ও তার আত্মীয়স্বজনকে, পরিচিত

লোকজনকে এবং এমন অপরিচিত লোকজন যাদের যেন আপন বলে মনে হয়" —('ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্য পরিচয়', 1966)। কান্হুচরণ যথার্থবাদী। তাঁর এই দৃষ্টিকোণে শুধু মাত্র তাঁর উপন্যাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় নি, উপরন্তু তাঁর আদর্শবাদী উদ্দেশ্য প্রমাণ করার ব্যাপারে এক হার্দিক পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে।

কান্হুচরণের উপন্যাসগুলিতে সামাজিক ও ব্যক্তিচেতনার সংঘর্ষে ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যক্তিজীবনের প্রেম, প্রণয় ও বিবাহের গ্লানি ও ব্যর্থতা। আমাদের সমাজব্যবস্থায় জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদ তো আছেই। এ ছাড়া পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য-আচার ইত্যাদি। বহু ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, পুরুষের প্রাধান্য— স্ত্রী-পুরুষের যুগল জীবনে পর্বত-প্রমাণ প্রতিরোধ তুলে ধরে। মনের মতো স্বামী বা স্ত্রী না পাবার দরুন স্ত্রী ও পুরুষের পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন, ভ্রষ্ট ও ভারস্বরূপ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, পুরুষের অপেক্ষা কম স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী নারীই বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পুরুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তর্ক করে, বিদ্রোহও করে; কিন্তু বেচারী নারী, যে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকে, সে কোথায় যায়? কাকেই বা বলে তার কাতর হৃদয়ের কাহিনী? যুগ যুগ ধরে অপমানিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত অবলার অব্যক্ত কাহিনী— কান্হুচরণের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ওড়িয়া শিল্পকলা ও সাহিত্যে 'লাবণ্যবতী'র মতো সোহাগী কন্যাদের ত্যাগ ক'রে তিনি এই অভাগী কন্যাদের অশ্রুময়ী কাহিনী লিখেছেন।

কান্হুচরণের প্রত্যেক উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র— এক নারী। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব হরিজন কন্যা, শিক্ষিতা সুন্দরী আধুনিকা, কুৎসিত বিকলাঙ্গ মহিলা, শিশুসরল বেপরোয়া বালিকা, বিবাহিতা প্রৌঢ়া। এরা সবাই প্রেমিকা, কিন্তু এদের প্রেমে রোমান্স নেই, আছে শুধু সমস্যা। ওদের হৃদয়ে প্রেম, স্নেহ আর দেহে কামনা ও উত্তেজনা। কিন্তু সমাজের নীতিনিয়ম ও ঐতিহ্যকে কি ক'রে অতিক্রম করে? এ সম্ভবপর নয়। ফলে হয় কি, সত্যতা আর আদর্শের সংঘর্ষে তারা

অসহায় মাংসপিণ্ড হয়ে থেকে যায়। পৃথিবীর চোখে তারা আদর্শ স্ত্রী, ভগ্নী, মাতা হোক-না কেন, বাস্তবে কিন্তু তারা অসার্থক প্রেমের জীবন্ত নিদর্শন। সমাজ চেয়েছে, তাদের ওপর পুরুষের দাপট থাকুক, অধিকার থাকুক। কিন্তু তারা তাদের মনের মানুষকে পায় নি। দারিদ্র্য, বৈধব্য, জাতিধর্ম ভেদ ও বেশ্যাবৃত্তির শিকার হয়ে বিপথে গিয়ে তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে অথবা মিথ্যে ঘরনী সেজেছে। অনেকে দুঃখ সহ্য করতে করতে আত্মহত্যা করেছে। তবুও কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। প্রত্যেক নারীর অন্তরে মাতৃশক্তির যে আগুন আছে, কেউ তা উদ্দীপ্ত করে নি। "স্ত্রী-জন্ম সৃজনের জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়"— এই হ'ল কান্হুচরণের আদর্শ। "স্ত্রী পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছে। সে জননী। মাতৃত্বের জন্য সে পুরুষের সন্ধান করে। কোমলতাই তার শক্তি"—('শাস্তি')। এই কারণে উপন্যাসে কান্হুচরণ, যে নারী চরিত্র চিত্রণ করেছেন, সে অন্যায় সহ্য করে। সে ত্যাগ, পবিত্রতা, ধর্ম, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য, মমতা ইত্যাদি মহান গুণের এক আদর্শ ভারতীয় নারীর প্রতিক।

সমাজের পুনঃরচনাই কান্হুচরণের আরাধ্য। তিনি এমন এক মহান সমাজের কল্পনা করতেন যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও বর্গের কোন ভেদ নেই— যেখানে নারী-পুরুষের বিবাহের প্রধান অবলম্বন দুই হৃদয়ের মিলন। যেখানে দান-পণ বা ধনদৌলতের কোন প্রভাব নেই। যেখানে নির্বিঘ্নে বিধবা-বিবাহ হতে পারে। যেখানে দরিদ্র ও হতভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি আছে, রোগী ও বিকলাঙ্গ মানুষেরা সেবা পায়, যেখানে পরিশ্রমের মর্যাদা ও প্রত্যেকের প্রতি সম-ভাব রয়েছে। কান্হুচরণ মুখ্যত একজন লেখক, নেতা বা প্রশাসক নন। তাই নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তিনি সমাজকে ভাঙার চেষ্টা করেন নি। ভাঙার জন্যে উত্তেজনাপূর্ণ রচনা লেখেন নি। তার পরিবর্তে তাঁর মহান আদর্শের মূর্ত রূপ দিতে তিনি সংবেদনশীল রচনা লিখেছেন। 'শাস্তি' এই করুণ জীবন-গাথার করুণতম অধ্যায়।

□

'শাস্তি' কানহুচরণের এক আদর্শ রচনা। 1867-68'র 'নবম শাসনকালে আকালে'র পৃষ্ঠভূমিতে এর কথাবস্তু রচিত হয়েছে। আকালের সময়ে 'অন্ন দাও, অন্ন দাও'-এর করুণ আর্তনাদের রূঢ় বাস্তবময়তা এর অবলম্বন। এই আকালের উড়িষ্যায় যে প্রলয় ঘটে গেছে, তার বীভৎস চিত্র ফকীরমোহনের প্রত্যক্ষ বিবরণে পাওয়া যায়। যথা—

"বাড়িতে এক-আধটা যা পিতল জাতীয় ধাতুর বাসন ছিল, রোজ-মজুরেরা তাই বেচে দিন কাটিয়েছে। কার্তিক মাস শেষ হতেই তারা যে-যার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র— সবাই গিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। পরস্পরে তাদের দেখাও হয় নি। কিন্তু ফাল্গুনের পরে চাষীরা ও কারিগরেরা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। ঘাসপাতা চিবিয়ে পর্যন্ত প্রাণে বেঁচেছে। তেঁতুল গাছে যখন নব কিশলয় দেখা দিল, তখন লোকে গাছে উঠে সেগুলিকে আর পাতা খেতে শুরু করেছে। এক-একটা গাছে দশ-বিশ জন মানুষ বাঁদরের মতো উঠে বসেছে। প্রত্যেকে এক-একটা কঙ্কাল। ভালো বংশের তরুণী, মেয়ে-বৌয়েরা ছেঁড়া পুরনো কাপড় পরে মেঠো রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের বুকের স্তনের জায়গায় নিষ্প্রাণ শুষ্ক চামড়া। অনেকেই বাচ্চা কোলে। বাচ্চারা ওই শুকনো চামড়াই চুষছে। চৈত্র মাসে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। যেখানেই যাও, মৃতদেহ নজরে পড়ে— রাস্তার ধারে, ঝোপে বা পুকুর ঘাটে। মেথরেরা দু-মাস ধরে গোরুর গাড়ি করে মৃতদেহ নদীতে নিয়ে গেছে। এই দৃশ্য লেখক স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছে। —('আত্মকথা')।

কানহুচরণ তাঁর 'হা অন্ন' উপন্যাসে এই নরমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। রজবাড়ের 1915-16'র আকাল-দৃশ্য তাঁর মনে ছিল। যৌবনে তিনি যখন নবম শাসনকালের আকালের মর্মান্তিক বিবরণ পড়েছেন, তাঁর চোখের সামনে সেইদিনের করুণ দৃশ্য ভেসে উঠেছে।

সেই চিন্তা 'হা অন্ন' উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। 'হা অন্ন' (চতুর্থ সংস্করণ) -এর ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন—

"আমি সম্পূর্ণ বিবরণ পড়েছি। আমার শরীর-মন কেঁপে উঠেছে। অজান্তেই চোখে জল এসে গেছে। আমার সামনে ভেসে উঠেছে দুর্ভিক্ষের করুণময় চিত্র। ফেমিন কমিশন (1866-68) রির্পোট প্রকাশিত করেছে। তিনটি বড় বড় পুস্তক। আমি এই তিনটিই পড়েছি নিজের মন্তব্য নোট করেছি। 1915-16-র আকালের ছবি যেন প্রতিটি পৃষ্ঠায় মূর্ত হয়ে আছে। যা অনুভব করেছি, যাতে আমার বুক কেঁপে উঠেছে, রক্ত গরম হয়ে গেছে আর চোখে জল এসেছে— নিজের ভাষায় তা মূর্ত করার চেষ্টা করেছি। আমার মনের এক অজ্ঞাত প্রেরণা আমার কলমকে এগিয়েছে আর 'হা অন্ন' উপন্যাস লিখিয়েছে।"

'হা অন্ন'-এর নায়ক জগু আর নায়িকা উমা খিদের জ্বালায় একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এক মঠে ভাবী মোহান্তের নজরে পড়ে উমা এবং যখন মোহান্তের সঙ্গে উমা নতুন জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখছে, তখন হঠাৎ সে মরণাপন্ন জগুকে সেবাসদনে দেখতে পায়। 'হা অন্ন' উপন্যাস এখানেই শেষ হয়। জগু ভালো হয়ে যায় কি না, আর উমাকে পেয়ে ঘর-সংসার বাঁধে কি না— তা আমরা জানি না। কিন্তু 'শাস্তি' উপন্যাসেও জগুর মতো সনিয়া আকাল থেকে বেঁচে গাঁয়ে পালিয়ে আসে। ধোবীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তা হয় না। সনিয়া তার প্রেমিকার পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা পায় নি। বরং শাস্তিই পেয়েছে। তৎকালীন সমাজের এই ছিল প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যাদের ওপর কান্হুচরণের সহানুভূতি ছিল এবং যাদের জন্য তিনি চোখের জল ফেলেছেন, তাদের কি করে শাস্তি দিতে পারেন? সেই কারণে 'হা অন্ন'র পর 'শাস্তি' রচনার মধ্যে দশ বছর কেটে গেছে। ফকীরমোহনের মতো তিনিও অনুভব করেছেন— "হিন্দু সমাজ কি মোটে কাঙালদের সমাজচ্যুত করেছে। তার জন্যে কিন্তু হিন্দু ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী এক বিবেকশূন্য সমাজ।"—('আত্মকথা')। বিবেকশূন্য সমাজের অত্যাচার থেকে সনিয়ার মতো মানুষকে কি করে বাঁচানো যায়।

তিনি এক রচয়িতা হয়েও এই সম্পর্কে বোধ হয় দশ বছর ধরে কল্পনা করেছেন। তাই 'শাস্তি' শুধু মাত্র 'হা অন্ন'-এর পুনরাবৃত্তি নয়, এ হ'ল, 'হা অন্নে'র শ্মশানে এক নতুন পৃথিবী তৈরির মহৎ প্রচেষ্টা।

কান্হুচরণের সামাজিক আদর্শের পিছনে যুক্তি এই : প্রাকৃতিক বিপত্তিতে দেশে আকাল হয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ পাগল হয়ে গেছে। ফলে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে সে সমাজের ঐতিহ্য-নিয়ম পর্যন্ত ভুলে গেছে। এক দুঃস্বপ্নের মতো এই দুর্দিনও কেটে গেছে। আকাল থেকে বেঁচে নতুন জীবনের নতুন জীবনের নতুন আশা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরল। যা হবার ছিল হয়েছে। বাধা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সমাজ এ কথা মানে নি। সমাজ চেষ্টা করেছে ফিরে-আসা মানুষগুলোকে শাস্তি দিতে। চিন্তেই স্বাঁইয়ের মতো সমাজের শিরোমণি, প্রহরাজের মতো পুরোহিত একথা ভাবে নি, সনিয়া গরীব অসহায় হয়েছে কোন্ কারণে? কোন্ কারণে পুনী অচ্ছুত জাতের স্ত্রী? কঁই কেন পতিতা হয়েছে? ধোবী বিধবা হয়েছে কেন? চিন্তেই স্বাঁই বা প্রহরাজ এ কথা ভাবতে পারে নি। তারা এদের নিরুপায়তা বা অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে। ধোবীর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি হাতাবার সুযোগ পেয়েছে চিন্তেই স্বাঁই। সনিয়ার বাবা উঁচু জাতের গর্ব করেছিল, তা চূর্ণ করার সুযোগও সে পেয়েছে। প্রহরাজ পুরোহিত হিসেবে দক্ষিণা পেয়েছে আর লোকে পেয়েছে অন্যের দুর্দশায় দয়া ও আহা-উহু করার সুযোগ। একজন রচনাকার হিসেবে কান্হুচরণ নীতি ও ধর্মের নামে এত বড় অন্যায় সহ্য করতে পারেন নি। সমাজ-ব্যবস্থায় জাতি, বর্ণ, বর্গ ইত্যাদির ভেদ-ভাব যাবতীয় অন্যায়ের মূল। এই ভেদ-ভাব কাটাতে তিনি সনিয়ার চরিত্রে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে সমাজের শিরোমণির বিবেকশক্তি জাগাতে তিনি ধোবীর চরিত্রে নীরব সত্যাগ্রহের ভাব সৃষ্টি করেছেন।

হৃদয়ে অনেক আশা নিয়ে সনিয়া শ্মশান থেকে গাঁয়ে ফিরেছে। অনেক আশায় ধোবী তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু দুজনের মাঝখানে পর্বত-অটল সমাজের কঠোর নিয়ম। ধোবী দেখে, সমাজের রীতিনীতি,

পিতৃ-বাসনা, অর্থের অসাম্য, ধর্মের নামে কিছু নিয়ম দুজনের মাঝখানে প্রতিবন্ধক। সনিয়ার হাত ধরে সে নম্রভাবে বলেছে—"সনিয়া দাদা, আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা করো। আমি বিধবা। সমাজ, ধর্ম, জাতবিচার-ভেদ— হাজার রকম বাধার ঘেরাটোপে বাঁধা। এ-অবস্থায় আমি মনে মনে এক বন্দীর মতো ছটফট করছি। সনিয়াদাদা! কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারে না।" ধোবীর এই করুণ-কাতর ভাষা সনিয়ার চোখের সামনে সামাজিক বন্ধনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। সে দেখে, ধোবী যা বলেছে, সব সত্যি। এই ঐতিহ্যবাদী সমাজে তাদের মতো হতভাগ্যদের মুক্তি-দ্বার বন্ধ। সে উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করল, "এই বাড়ী সকলের। এখানে জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ থাকবে না। ...এই কুটিরেই আমরা নতুন পৃথিবী রচনা করব। মানুষের নতুন সমাজ সৃষ্টি করব।" ফলে, পতিতা কঁই হল তার গৃহিণী, মুসলমান ছেলে রহিম তার ভাই। খ্রীস্টান জন তার কাকা। এ ছাড়া খোঁড়া চামার ভরতিয়া ও অন্ধ কাশী তার পোষ্যপুত্র। অনুর্বর জমিতে সোনা ফলিয়ে সে এক নতুন পৃথিবী রচনা করল।

সংঘর্ষের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে ধোবী যদি পুনী কিংবা টিমির মতো সমাজের সব বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসত, তাহলে কান্হুচরণের আদর্শ এক যুগান্তকারী আদর্শ হয়ে যেত। কিন্তু তার প্রতিফল কী হ'ত? হ্যাঁ, এক বিপ্লব— প্রতিক্রিয়াশীল সমাজকে নিশ্চয় কাঁপিয়ে দিত। কিন্তু সমাজের বিবেক-বুদ্ধিও জাগ্রত হত না, কারোর ধারণার পরিবর্তনও হত না। এই কারণে তিনি ধোবীর জীবন উৎসর্গ করে, তার অশ্রু ও রক্তে সমাজের ধারকদের কঠোর ধারণা বদলে দিয়েছেন। 'শাস্তি' উপন্যাসে সামাজিক বিচারহীনতার দণ্ড যদি কেউ পেয়ে থাকে, সে ধোবী। কান্হুচরণের লাঞ্ছিত পদদলিত নায়িকাদের মধ্যে সে একজন। সনিয়ার বাবা বনেই পরিডা নিজের জাতের গর্ব করেছেন। তিনি ধোবীকে নিজের পুত্রবধূ করতে রাজী হন নি। অর্থের লালসায় চিন্তেই স্বাঁই তাঁর একমাত্র মেয়ে ধোবীর বিয়ে দিয়েছেন ধনবান নায়কের সঙ্গে। ঈশ্বর এ-ব্যাপারে সায় দেন নি। কয়েকমাস পরে ধোবী বিধবা হয়ে

গেছে। সে কী পেল আর কী বা হারাল? আকালের দুর্দিন এসেছে আর তার পারিবারিক জীবন যেন এক দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেছে। তার মনের নতুন কামনা মূর্ত হয়ে উঠেছে সনিয়ার অবয়বে। সনিয়াকে দেখে আবার তার মনে জেগেছে অতীতের অনেক স্মৃতি। সে আরেক-বার ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ধোবীর এই নবীন অবস্থাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় নি। ধোবী এক আবদ্ধ জ্বালামুখী পর্বতের মতো তার সমস্ত কামনা, সমস্ত আশা বুকে চেপে রেখেছে। সে চেয়েছে, তার স্বর্গত স্বামীর আত্মা শান্তি পাক— তার পিতার অর্থ ও মান বাড়ুক এবং সনিয়া মানসম্মানের সঙ্গে আবার ঘর-সংসার করুক। সে একজন ভারতীয় নারী। ভারতীয় নারীর মহান আদর্শে সে কাজ করেছে। সে চায় নি—পৃথিবী ধ্বংস হয় হোক, আমার স্বার্থ যেন সিদ্ধ হয়। সে তার ন্যায্যটুকু আদায় করতে বিদ্রোহ করে নি। কিন্তু সমাজের শিরোমণিদের পরিবর্তিত করতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করেছে। তার স্নেহময়ী মায়ের ধারণার বদল হয়েছিল আর মা যখন চিরকালের জন্য চলে গেলেন তখন বাবার-ও মন ঘুরে গেছে। এখানেই ধোবীর সাধনা সার্থক। কিন্তু এই সাফল্যের আগেই কোন কারণে সনিয়া অন্য পথ ধরেছে। ধোবী তা সহ্য করতে পারে নি। যাবতীয় সুখ থেকে সে বঞ্চিত। তার নিঃসঙ্গ আত্মার কাতর প্রার্থনা ছিল— "আমাকে পাথরের মতো কঠিন করে দাও ভগবান···। আমাকে বোবা করে দাও ভগবান···। ঠিক তোমারই মতো···।"

'শাস্তি'র এই শেষ শব্দে শুধু ধোবীরই নয় উপরন্তু আমাদের রূঢ়বাদীসমাজ-বন্ধনে লাঞ্ছিতা পদদলিতা নারীর যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সনিয়ার ধ্বংসাত্মক উৎক্রান্তি ঘোষণা এবং ধোবীর কাতর প্রার্থনার মাধ্যমে সামাজিক উগ্রতা ও ধর্মান্ধতা ত্যাগ করার পরিপ্রেক্ষিতে কানহুচরণের আহ্বান অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাবে শোনা গেছে।

এমনও মনে হয়, 'হা অন্ন'-এর প্রেক্ষাপটে 'শান্তি' যেন ঔচিত্যের বিপরীত আদর্শের কাহিনী। মৃত্যুর ভূমিতে জীবনের জয় এবং সমাজের

অন্ধবিশ্বাস থেকে মানবের মুক্তি-কাহিনী। অবশ্যই, সনিয়া স্বীকার করে নিয়েছে যে, সবাইকে আপন করে নেওয়ার আদর্শ তার বিফল হয়ে গেছে। ধোবীর সমস্ত দান সনিয়া ফিরিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ধোবীও তার আদর্শের অসাফল্য অনুভব করেছে। তথাপি চিন্তেই স্বাঁইয়ের গর্বিত বুকে সনিয়া যে চিরস্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, তা-ই তার আদর্শের জয়-চিহ্ন।

ডঃ খগেশ্বর মহাপাত্র

গুণপুর (কোরাপুর–ওড়িশা)
6-10-1945

অশরীরে !

সন্ধ্যার শীতল বাতাস নদীর ওপার থেকে আপনার বাণী বয়ে আনছে— "শেষ হয় নি কি, বাবা ?"

দুই মহল প্রাসাদের এই ঘর একেবারে নিরিবিলি। কিন্তু কার কণ্ঠস্বর যেন শোনা যাচ্ছে ? কে যেন বলছে— "শেষ হয় নি, বাবা ?"

মনে হচ্ছে, এখনো আপনি এখানে কোথাও আছেন।

কিন্তু এ কী করে সম্ভব ? হে ব্রজসুন্দর ! আমি যে স্বয়ং আপনার মরদেহ কটকের সতীচৌরা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছি ; নিজে আগুন জ্বেলে দিয়েছি আর নিজের সামনেই জ্বলে ছাই হয়ে যেতে দেখেছি। বেশি দিনের কথা নয়। যেন এ-ঘটনা কালই ঘটে গেছে।

অনেক সুন্দর সন্ধ্যা আমি আপনার সঙ্গে কাটিয়েছি। বার বার শুনেছি আপনার আদরের ডাক— "বাবা··· !"

আমি একজন নগণ্য সাধারণ মানুষ। কিন্তু এমন একজন লোককে আপনি কেন শোনাচ্ছেন আপনার হৃদয়-যন্ত্রণা··· আপনার শেষ আশার কাহিনী ? আপনি বলেছিলেন···"বাবা, আমার দেশ খণ্ডিত— আমার সাহিত্য অপূর্ণ— আমার দেশের শিশুরা ক্ষুধার্ত···" এ-জাতীয় আরও অনেক কথা।

চোখে জল এসেছে··· অন্তরাত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠেছে···"আমার জীবন নিষ্ফল গেল··· আমার শেষ সময় ঘনিয়েছে···আমি কিছু করতে পারি নি।"

হে দেশগৌরবময় মহাপুরুষ! আপনি বলেছেন নিজেই, কিন্তু সাক্ষী মেনেছেন আমায়। আজ জানতে পেরেছি যে, আপনি ফিরে এসেছেন। এক রূপে নয়, আমার মায়ের দেড় কোটি সন্তানের রূপে আপনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। পৃথিবী আজ জাগ্রত। আপনিও জাগ্রত। আপনিই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ ক'রে আমার দেড় কোটি ভাইবোনের ঠোঁটে হাসি ফোটাবেন—আবার ওদের মুখেই বলবেন —বাবা, শেষ হয় নি, না? কোথায় গঙ্গা? কোথায় গোদাবরী? কোথায় আমার সিংহভূমি?

হে সাহিত্যরথী! তুমি তোমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছ। আমি কি তার যোগ্য? আজ তুমি সন্ধ্যাবাতাসের সঙ্গে আমার নিভৃত ঘরে এসেছ··· সত্যিই কি এত ভালোবাস আমায়?

আমি আপনার এক অধম সন্তান! সাহিত্য ব্যতিরেকে আমি অন্য কিছু রচনা করেছি। আপনার হাতে এই 'শাস্তি' অর্পণ করার সাহস আমার নেই। এতই যদি ভালোবাসেন, হে পিতা! আপনি একে স্বীকার করে নিন আর সেইসঙ্গে আমার প্রণামও নিন।

কানুহচরণ

সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সূর্য ওঠে নি। পৌষের হাড়-কাঁপানো শীত। সনিয়া তবু হাঁটছে। রাতের শিশিরে তার পায়ে খুব কষ্ট হচ্ছে। শুধু পা-দুটোই নয়, দেহের হাড়গুলোও কেঁপে উঠছে। গা ঢাকবার মতো কোনো জামা নেই। ছোট্ট একটা কাপড়ের ফালি, সেটাকে সে কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, ছেঁড়া ফালিটার সামান্য অংশ হাঁটু ছুঁয়ে ঝুলছে। গায়ের জড়ানো কাপড়টাও অনেক পুরনো— শতচ্ছিন্ন। তাতে গা ঢাকা যায় না। তবুও সনিয়া এগিয়ে চলেছে— খালি পায়ে, খালি গায়ে।

কি হয়ে গেছে সনিয়ার ? তার শরীরে একটুও রক্ত নেই, মাংস নেই। অনেক কষ্টে হাড়গুলো চামড়ায় ঢাকা পড়েছে। তার চোখে কোনো জ্যোতি

নেই। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। দুর্বলতার দরুন ঠিকঠাক হাঁটতেও পারছে না। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকর খাচ্ছে। শরীরটা ঝুঁকে গেছে। মনে হচ্ছে, একটু ঠেলে দিলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হাতের লাঠিটা একটা ভারী বোঝার মতো লাগছে। তবুও সেটাকে ছাড়তে পারছে না। এখন এই লাঠিটা ছাড়া তার অবলম্বন কি বা আছে? হাতের লাঠিই তার পরম বন্ধু, বাবার স্মৃতি।

সামনে যে গ্রামটি দেখা যাচ্ছে, ওইটিই সনিয়ার জন্মভূমি। গ্রামটি নজরে পড়তেই সনিয়া খুশি হয়ে উঠল। দীর্ঘশ্বাস নিল। ঐ তো তার গ্রাম— তার প্রিয় গ্রাম, যাকে সে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এই সেই গাঁ, যেখানে তার পূর্বপুরুষেরা জন্ম নিয়েছে, ঘর-সংসার করেছে, আর আনন্দে খেলাধুলো করে জীবন কাটিয়েছে। যখন সময় ঘনিয়েছে তখন গাঁয়ের মাটিতে মিশে গেছে। গাঁয়ের শ্মশানে পূর্বপুরুষদের অশরীরী আত্মাদের দেখা মেলে।

সাধের আপন গাঁ।

সনিয়া খুশি হল। সে-যে সাহসী। সে বরাবর যুঝে আসছে মৃত্যুর সাথে। আজ অবধি হারে নি। 1890-এর (পুরীর মহারাজার নবম শাসনকালের) আকালও তাকে গ্রাস করতে পারে নি। বলতে কি, সে আকালের মুখ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। মাত্র তিন বছরের তো কথা। নিজের প্রাণ বাঁচাতে সনিয়া কী না করেছে। আজ সে-কথা ভাবলে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। ওঃ! তার এই অবস্থা কারো নজরে পড়ে নি তো! সনিয়া চারদিকে নজর বোলালো। পেট চালানো চূড়ান্ত হ'লে সনিয়া বাধ্য হয়ে নিজের জমি-জায়গা বাসন-কোসন— সবই বেচে দিয়েছে। যেখানে বিক্রি করা সম্ভব হয় নি, জিনিসপত্র বাঁধা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সনিয়ার পেট ভরে নি।

পেটের জ্বালায় লোকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। সনিয়ার বাবা-ম পালিয়ে গেল। তারপর তার ছোটো ভাই মনিয়াও গেল পালিয়ে। শেষটায় তার দশ আর বারো বছরের দুই বোন— কুনী আর পুনীর সঙ্গে সে-ও ভিটে ছাড়ল। বেশিদিন তারা একসঙ্গে থাকতে পারে নি।

বাঁচবার মায়া— নিজের বাঁচার ইচ্ছে যখন প্রবল হল সংসারের প্রেম-প্রীতির সব বন্ধন আপনিই ছিঁড়ে গেল। একদিনকার ঘটনা : সনিয়ার বাবা কিছু-একটা খাচ্ছিল। আচমকা সনিয়া জোর ক'রে বাবার খাবার কেড়ে নিল। বাবার বাধা দেবার মতো শক্তি ছিল না— তিনি ছিলেন একটা নরকঙ্কাল। তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল একটা লাঠি। লাঠিটা তুললেন, কিন্তু হাত থেকে পড়ে গেল সেটা। আর, তারপর সেই নরকঙ্কালটিও— চিরকালের জন্যে····।

সেদিন কি কেউ কেঁদেছিল? সনিয়ার এখন মনেও পড়ে না। মৃতদেহের হাত থেকে সে লাঠিটা তুলে নিয়েছিল, আর হাঁটা দিয়েছিল। তার বুড়ী মা, ছোটো দুই বোন আর ভাই তখন শ্মশানে বসে কাঁদছিল। কিন্তু সনিয়া হাঁটা দিয়েছিল। ফিরেও তাকায় নি সেদিন।

একটা নয় বরং হাজার হাজার দুর্যোগ এসেছে। বন্যা, খরা, আকালের কবলে সে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এটুকুও ভুলে গেছে, কি উচিত আর কি অনুচিত। শুধু বুকে তার বাঁচবার প্রচণ্ড বাসনা। ভিক্ষে ক'রে সে দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে মরেছে। যখন শরীরে একটু জোর পেয়েছে, পা বাড়িয়েছে নিজের গাঁয়ের দিকে।

লঙ্গরখানায় সে খেয়েছে। খানিকটা স্বস্তিতে সে খেতে পেরেছে। তার জন্যে ক্ষেতে কাজ করেছে— আর বহু বণিক-মহাজনের উপদেশও শুনেছে। কিন্তু কোথাও তার মন বসে নি। গাঁয়ের মাটির টান অস্বীকার করতে পারে নি সে। তাই যেই সুযোগ পেল গাঁয়ের পানে হাঁটা দিল।

সনিয়ার সামনে সবুজের মেলা। সবুজ ধানক্ষেত চারপাশে হাসি ছড়াচ্ছে। কিন্তু তার দৃষ্টি সেদিকে নয়। যখনই কোনো শ্মশান দেখেছে, থমকে গেছে সে। তার মা, ছোটো ছোটো দুই বোন, পনেরো বছরের ভাই মনিয়া··· সবার কথাই মনে পড়েছে। শ্মশানের হাড়ের স্তূপের মধ্যে হয়তো ওদের সবার হাড় পড়ে আছে। উঃ! সনিয়া কেঁপে উঠেছে।

আজ সনিয়া শোকে কাতর। কিন্তু সেদিন তো দুঃখ হয় নি। সেদিন যখন লাখে-লাখে নারী-পুরুষ ভিক্ষের পাত্র হাতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিল— সনিয়াও বাঁচার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিন তার চোখে জল

আসে নি। কিন্তু সবাই তো বাঁচার জন্যে, বলতে কি, শপথ নিয়েছিল। মৃত্যুর কবল থেকে সবাই কি বাঁচতে পেরেছিল? না। অনেকেই মৃত্যুর মুখে পড়েছে, আর চিরদিনের জন্যে চেতনা হারিয়েছে। যারা বাকী থেকে গেল, তাদের আর বাঁচার ইচ্ছে রইল না। পরিবার-পরিজনের স্মৃতি সনিয়াকেও অস্থির করে তুলছিল। নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করছিল— শেষটায় সে কেন বেঁচে আছে? কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষায়? কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে? মানুষ তার সুখের ছবি অপরের চোখে, নিজের স্বজনের মুখেই দেখতে চায়।

শেষমেষ সনিয়া কেন বেঁচে রইল?

সনিয়ার কঙ্কালের ভেতরে যে জীর্ণশীর্ণ মন, সেখানে অনুভব করল সে ভীষণ উথাল-পাথাল। তার মা, ভাই, বোনেদের ছেড়ে সে কোন্ বাসনা নিয়ে বেঁচে থাকবে? জন্মভূমির টান সে অস্বীকার করতে পারে নি। সে ফিরে এসেছে। সম্ভবতঃ তারাও ফিরে এসেছে।

তার গ্রাম। এখন তার সামনে তার প্রিয় গ্রাম।

সকালের সূর্য এখন আকাশে উঠছে। উঁচু নারকোল আর দেবদারু গাছের শিশিরে ভেজা পাতা সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। সনিয়া এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে পা ফেলছে সে।

সনিয়ার সামনে পাকা-ধানে-ভরা ক্ষেত। দূরদিগন্ত অবধি তার বিস্তৃতি। যেন কেউ হলুদ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। ধান-কাটতে-আসা-চাষীদের ভীড় দেখা যাচ্ছে। রোদ একটু চড়লেই ধান কাটা শুরু হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, চেনাজানা লোক। ডাকবে কি তাদের? মন তো তাই চাইছে। কিন্তু গলায় এত জোর কই যে ডাক দেয়? সে চেষ্টা করল। কিন্তু না, আওয়াজ-ই বেরুল না।

সনিয়া হাঁটতে থাকল। সামনে এগোতে থাকল।

গাঁয়ের রাস্তার দু-ধারে দু-সারিতে অনেক ভিটে ছিল। কিন্তু সেই-সব ঘর এখন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। গাঁয়ের পাশেই ছিল একটা আমবাগান। ছোটোবেলায় ঐ-সব গাছের ডালে-ডালে সে 'গাছ-বানর' খেলা খেলেছে। গাছের ছায়ায় বউ-চুরি আর কেয়া ঝাড়ের ফাঁকে লুকোচুরি

খেলেছে। আমগাছগুলো তেমনই আছে। একটাও বদলায় নি। একটাও গাছ মরে নি, একটি ডালও শুকোয় নি। আমগাছগুলোর পেছনে লতার যে ঘন ঝোপ ছিল, তা-ও তেমনি আছে। গাঁয়ের শেষ প্রান্তের বটগাছটা এখনো আছে। তার নীচটা একটা ভয়ানক জায়গা। একটা সাপ থাকত সেখানে। সেটাও আছে। ছোটোবেলা থেকেই সনিয়া সাপটাকে চেনে।

সবই বেঁচে আছে— গাঁয়ের জন্তু-জানোয়ার, গাছ, লতা, পাতা, বাতাস, ক্ষেত, উঁচু উঁচু জায়গা সব। যারা জীবিত নেই— তারা হল মানুষ। হ্যাঁ, এই গাঁয়ের মানুষ— যারা এই পৃথিবীর বুকে নেচে গেয়ে তাকে সবুজ করেছে, এই জন্তুগুলোর ওপর প্রভুত্ব করেছে— তারা আজ নেই। কোথায় গেল সবাই ? এই হল জগৎ। এমনই হল জগতের নিয়ম।

এবার শুরু হল গাঁয়ের মেঠোপথ। সনিয়ার নজর ছুটে গেল। একটা ভাঙা দেয়াল। ওপরে কোনো ছাদ নেই। জংলা ঘাসে নীচের জমিটা ছেয়ে আছে। হায়, হায়, কেউ-ই বেঁচে নেই ? কেউ কি ঘরে ফেরে নি ?

দু-সারিতে সুন্দর ভিটে ছিল। কিন্তু এখন বেশিরভাগ বাড়িই ভেঙে গেছে। দুয়েকটা বাড়ি মেরামত-ও হয়েছে। সে-সব বাড়ি থেকে যারা বেরিয়ে আসছিল, সনিয়া সবাইকে চিনতে পারল। কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারে নি। কেউ ওকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

সনিয়া ভাবল, হাজার হোক কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে কেন। এটা তো কিছু নতুন ব্যাপার নয়। এমন তো প্রত্যহ শ'য়ে শ'য়ে কঙ্কাল, ভিখিরি আসে। এক মুঠো চাল, বা একটু ফেনের জন্য হাত পাতে। এই গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় কত কঙ্কাল সবসময় আছে। আর, শেয়াল-কুকুরের ফূর্তির ভোজ হয়ে উঠছে। মানুষ-ই বদলে গেছে। হৃদয়ে তার সহানুভূতির নাম-চিহ্ন রয়ে যায় নি। সনিয়ার মন-ও পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে। চারিদিকে অনাহার, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তার মর্মস্পর্শী কাহিনী। যারা বেঁচে আছে, লোকের করুণ হাহাকার শুনতে শুনতে তারা একেবারে নির্দয় হয়ে গেছে।

সনিয়াকে সবাই দেখছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, কেউই তাকে যেন লক্ষ্য

করছে না। বিশ বছরের যুবককে আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধের মতো দেখাচ্ছে তার চার বছর আগের স্বাস্থ্য আজ নেই। সনিয়া ছিল এক সাহসী নওজোয়ান। চওড়া ও মজবুত ছাতি, মোটাসোটা মজবুত হাত আর গোলগাল মুখ। পেঁয়াজের ক্ষেতে যখন সকাল-সন্ধ্যা জল দিত কোনো পরোয়া ছিল না তার। কখনো কখনো জলসেচ করতে করতে কাঁপকলই ভেঙে যেত। কিন্তু সনিয়ার দম ফুরত না। যে-কেউ দেখত, প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারত না। বনেই পরিডার দুই ছেলে— সনিয়া ও মনিয়া সত্যিই সপ্রতিভ। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লেখাপড়াও করেছে: "গোপীভাষা", "মথুরামঙ্গল", "বিধিরামায়ণ" ইত্যাদি যেন কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছিল। বনেই পরিডা ভাগ্যবান। ছেলেরা নিশ্চয় তার মুখোজ্জ্বল করবে।

বনেই পরিডার বাবার নাম কনেই পরিডা। মরার সময় কনেই মাত্র কয়েক বিঘে জমি আর ঘাস-পাতার ছোটো কুঁড়ে রেখে যায়। সারা জীবন সে মজুরী করেই পেট চালিয়েছে। কিন্তু কনেই পরিডার বংশ গরীব ছিল না। লোকে বলত যে কনেই আজ গরীব হয়ে গেছে, কিন্তু তার ঠাকুর্দা ধনেই পরিডা এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ধনী ছিলেন। লোকে তাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করত।

বনেই পরিডা মজুরী খেটে যা-কিছু আনত, তার থেকে কখনো প্রাণ পুরে খেত, কখনো উপোসী থাকত। এইভাবেই জীবন কাটাত। কিন্তু কিছু-না-কিছু সে জমাত। এইভাবে জমাতে জমাতে সারা জীবনে সে দশ একর জমি কিনেছিল। চনীকে বিয়ে করেছিল— তার তালিম পেয়ে সে-ও সুগৃহিণী হয়েছিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই আহার-নিদ্রা ভুলে কাজে-কর্মে লেগে থাকত। আর, তাদের চারটি সন্তানকে যত্নে-আত্তিতে লালন-পালন করত। তারা ছিল ধরিত্রীর সন্তান। মাটির ওপরই নির্ভরশীল ছিল তাদের সারা জীবন। সব কাজকর্মের— তা, ভালো হোক, কি মন্দ— মাটির সঙ্গে যোগ ছিল। তাদের দু'জোড়া বলদ আর দুধেল দুটি গাই ছিল। চনী আর বনেই দুজনেই নিজের ছেলেমেয়েদের থেকেও গ্রামকে বেশি ভালোবাসত। কারুর সঙ্গে তাদের কোনো শত্রুতাও ছিল না, বিশেষ

বন্ধুত্বও ছিল না। দুই ছেলে, দুই মেয়ে, দুটি গাই, দু'জোড়া বলদ ক্ষেতের ধান, মুগ -- এই-ই ছিল তাদের সংসার।

লোকে বলত— বনেই পরিডার ক্ষেতে সোনা ফলে। তার ক্ষেতের দিকে যে গেছে দু' মিনিট থমকে দাঁড়িয়েছে। বাঃ! কী সুন্দর ভরা-ফসল —এমন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছেই। কিন্তু লোকে তার ফসল দেখে খুশি হত না। বুকে যে তাদের ঈর্ষার আগুন জ্বলত। কিন্তু যারা বনেই পরিডাকে ভালো ক'রে চিনত, তারা বলত— আরে, এ তো ফসল নয়— এ-যে বনেই আর চনীর হাড়ভাঙা খাটুনির ফল। দুজনে যেন ক্ষেতে নিজেদের রক্ত বইয়ে দিয়েছে।

বনেই পরিডা তার দুই ছেলের ওপর অনেক আশা করেছিল। সে ভাবত: আমার জীবন তো পরিশ্রম করে করেই গেল। কিন্তু আমি চাই যে ছেলেরা যেন মানুষ হয়। তা হলে আমাদের চার পুরুষ আগের বংশগৌরব ফিরে আসবে। লোকে তো আবার বলবে, যে হ্যাঁ, বনেই এই পরিবারটাকে আবার দাঁড় করিয়েছে।

মান ও সম্ভ্রম! একজন সাদাসিধে চাষীর কাছে মান-সম্ভ্রম কি বস্তু? মান-সম্ভ্রম এমনই জিনিস যা, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একের পর এক মাথা তুলে আসে। আবার মাথা নীচু ক'রে সমুদ্রতটে বিলীন হয়ে যায়। তারপর আরো বড়ো বড়ো ঢেউ আসে। কিন্তু কতক্ষণই বা টিঁকতে পারে এই ঢেউ? গাঁয়ের থেকে দূরে, ক্ষেতে রক্তজলকরা পরিশ্রমী মানুষকে সাপে কাটল। মরে গেল বেচারা। সে ছিল অমুক ব্যক্তির নাতি। এ সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্ভ্রম ছিল— শুধু নিজের গাঁয়ে নয়, আরো দশটা গাঁয়েও। যাই হোক, আজ তাঁর নাতি পরিশ্রম করতে করতে মরে গেল। কিন্তু অন্যজন, যাঁকে এখনো দশ গাঁয়ের লোকে জানে, কদর করে, "গোটিপুঅ" নাচ দেখতে দেখতে সিদ্ধির নেশায় ঘুমিয়ে পড়ল— চিরকালের জন্য। এই মহাশয়টি কে? পাঁচ কি সাত পুরুষ আগে এঁর পূর্বপুরুষ এই গাঁয়ে এসেছিল ভিখিরি হয়ে। মান-সম্ভ্রম, বংশ-গৌরবের এই হ'ল দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু বনেই পরিডার মতো একজন সরল, অকপট, সাদাসিধে চাষী কি বুঝবে এ-সব কথা?

অনন্ত মহাকাশে আমাদের এই সৌরজগৎ বস্তুতঃ কত ক্ষুদ্র। তারই মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর বুকে আমাদের প্রিয় দেশ ভারত। ভারতের মধ্যে আমাদের আরোই ছোটো প্রদেশ— উৎকল। এই উৎকলের প্রান্তে আমাদের জেলা, যার কোনো লেখাজোখা নেই। আর এই জেলাতেই বনেই পরিডার অজানা গ্রাম। সেই গাঁয়ে বনেই পরিডার মতো একজন লোক ছিল, বলতে কি, যার কোনো অস্তিত্ব-ই নেই। কিন্তু সে চেষ্টা করেছিল, জীবনে একটা-কেউ হবে, উন্নতি করবে, বংশের সুনাম রাখবে।

দেশে আকাল দেখা দিল। মহারাজা খারবেল তথা পুরুষোত্তমদেবের সন্তান-সন্ততিদের একমুঠো অন্ন-ও জোটে নি। তারা মাছির মতন রাস্তায় পড়ে মরেছে। এমন দুর্দশা হবে— এ কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। বনেই পরিডা তো চেষ্টা করছিল কি ক'রে বড়ো হবে, ধনী হবে, পরিবারের সুনাম রাখবে। যা-কিছু ধান সে জমিয়েছিল, বড়ো হবার নেশায় বেচে দিয়েছে। পরিস্থিতি এত শোচনীয় হবে তা তার ভাবনাতেও ছিল না। কিন্তু এমনই সময় এল, যখন তাকে সমস্ত ধন-দৌলত খোয়াতে হ'ল ; জমি, ঘর, সম্পত্তি সব-কিছু বেচতে হল। কিন্তু তার বিনিময়েও সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে নি।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের মেয়ে ধোবীর সঙ্গে যখন সনেইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হল, বনেই পরিডা তখন নাক সিঁটকে ছিলেন। ফিস ফিস করে বলেছিলেন —প্রহরাজ মশাই, আমরা গরীব তো কি হয়েছে ? নীচু জাতে তো বিয়ে দিতে পারি না। প্রয়োজন হলে মজুরীও করব। শুকনো শাকপাতা খেয়ে থাকব। কিন্তু এমন নীচ কাজ করব না। দেখুন, চিন্তেই স্বাঁই কার বংশধর ? লোকে বলে, তার ঠাকুর্দা এমনই এক মেয়েকে ঘরে এনেছিলেন যার বাবা খণ্ড জাতের কিন্তু মা ছিল তাঁতি এতে হ'লটা কি ? হ্যাঁ, সম্পত্তি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু খণ্ডায়তের রক্তে. এবার কি বস্তুটা মিশল ? একবার ভাবুন তো! এখন এমন লোকের নাতি হল চিন্তেই স্বাঁই। তার মেয়ে ধোবীর সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব ? হুঁঃ! মশাই, আপনিই ভেবে দেখুন। আমি জেনেশুনে বনেই পরিডার বংশে কলঙ্ক লাগাব ?

প্রহরাজ মশাই নস্যি নিচ্ছিলেন। এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন বনেই পরিডার দিকে। বললেন— দেখো ভাই, বড়ো বড়ো ঘরে তারা বিয়েশাদী করেছে। এখন এত কে দেখে ?— কিন্তু বনেই পরিডা এর কোনো জবাব দেয় নি।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের মেয়ে ধোবী খুবই সুন্দরী। তার গৌরবর্ণ অঙ্গ ছিল কুমুদ ফুলের মতো সুন্দর আর কোমল। বয়সও মোটে তেরো কি চোদ্দ বছর। খুব হাসিখুশি, প্রতিশ্রুতিময়ী। কিছুটা লেখাপড়াও করেছিল। ওর নিষ্পাপ চেহারা দেখলে ভালোবাসতে, আদর করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বনেই পরিডা যখনই তাকে দেখত, এক তাঁতিনীর স্মৃতি তাকে যন্ত্রণা দিত। এই সুন্দরী মেয়ের মধ্যে এক নীচ জোলানীর রক্ত! হরে রাম! আমি কি জেনেশুনে এই বিষ আমার কয়েক পুরুষের পবিত্র রক্তধারায় মিশিয়ে দেব? না, এ কখনো হতে পারে না!

সে সুন্দরী, তাতে কি হল? বাড়িতে তো মাটিকাদায় কাজ করতে হবে। গোবর কুড়োতে হবে। চড়া রোদে আলের ওপর উবু হয়ে বসে ক্ষেতের ঘাস নিড়েন দিতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজে মাথায় বোঝা নিয়ে ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরতে হবে। যাকে এই ধরনের নানান কাজ করতে হবে, তার শরীর মাখনের মতো কোমল হলে সংসার চলবে কি করে? হ্যাঁ, মেয়ে হল মাধো রাউতের। এগার-বারো বছরের, নাম কঁই। ধবধবে ফর্সা রঙ নয়, কিন্তু কাজেকর্মে চটপটে। একটা পায়রার মতো সব সময় চঞ্চল, সব সময় হাসিখুশি। মাধো রাউত গরীব হলে কি হল? তার রক্ত নির্মল, পবিত্র। কঁই তারই মেয়ে। বনেই পরিডার নজর ওখানেই। সনেইয়ের জন্য কঁই-ই ঠিক। বাড়ির মান-সম্মানও বাড়বে।

বনেই পরিডা গোত্রে ভরদ্বাজ। বিনী কাণ্ডি হল জোলা, নিলু সাহু হালুইকর, রাম আচার্য ব্রাহ্মণ, শ্যাম ধল ক্ষত্রিয়— এদের সবাইকার গোত্র ভরদ্বাজ। অনাদিকাল থেকে ভরদ্বাজ বংশের কত শাখা সৃষ্টি হয়েছে। আর এখন বনেই পরিডা, বিনী কাণ্ডি, নিলু সাহু, রাম আচার্য— যারা সব ভিন্ন ভিন্ন জাতের, তারা সবাই ভরদ্বাজ বংশেরই সন্তান। এদের সবার মধ্যেই ভরদ্বাজ বংশের রক্তধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু তা জানা

সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেউ গভীর ভাবে ভেবে দেখে নি। সবাই খুঁজেছে রক্তের পবিত্রতা।

মানুষের রক্ত সব সময়ই নির্মল। সদা পবিত্র। কর্ম অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। দলগুলো থেকে জন্ম নিয়েছে নানান জাতি। এই 'জাতি'র, আসলে নিছক স্বার্থপরতা ছাড়া কোনো অর্থই ছিল না, যা এখনো বর্তমান। সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই জাতিগুলি থেকে জন্ম নিয়েছে। এই 'সংস্কৃতি' তথা 'সভ্যতা'র মূল্য কিভাবে করা যায়? এই পরিমাপের কোনো মানদণ্ড তো নেই। মানুষ নিজের কল্পনায় নিজের ওজন কষে। নিজেকে বড়ো ভাবে— আমি হলাম আচার্য— লোকের গুরু। আমি সূর্যবংশীয়। আমি ধনবান, কুবেরের সন্তান। আমি যাদব বংশীয়। ইত্যাদি।

বনেই পরিডা এ কথাটাই বোঝে নি যে, মানুষ এক। প্রত্যেক মানুষের দুটো হাত, দুটো পা, দুটি চোখ···। কিন্তু এর অর্থ বনেই পরিডা বুঝতে পারে নি। সনিয়াও এ কথা বোঝে নি। কিন্তু তার নজরে যখন ধোবীর তরুণিমা ধরা পড়েছে, ধোবীর চঞ্চল চোখে চোখ পড়েছে, তখনই সে অনুভব করেছে মানবিকতা কি বস্তু। বাইরের ভেদাভেদ পাষণ্ডতা ছাড়া আর কিছু নয়। ধোবীর রাঙা-ঠোঁটের হাসি কতই-না সুন্দর। সনিয়ার রোমহর্ষ হয়েছে। শরীর কেঁপে উঠেছে। সে অনুভব করেছে যে, জাত আসলে দুটি— পুরুষ আর স্ত্রী। এক ছাড়া অন্য অপূর্ণ থেকে যায়। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শুধু দুটি জাতির— পুরুষ তথা স্ত্রী। বাকী সব জাতি মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের তৈরি সেই জাতিরা না হলে সংসারের কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে না।

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। সনিয়ার মন সেদিন ধোবীর জন্যই ব্যাকুল হচ্ছিল, আর কিশোরী ধোবীর হৃদয় সনিয়ার জন্যে। বনেই পরিডা যখন বিয়েতে মত দিল না, সনিয়ার মনে খুবই আঘাত লেগেছে। কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে সে যায় কি ক'রে? তার মনে হল: এমন কিছু করা কি লজ্জার হবে না? বাবা যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। মাথা নীচু করে তা মেনে নিতে হবে। তার মুখ খোলারও অধিকার নেই। তার ভাগ্যে

যে মেয়ে, সে হল কঁই'। কঁই-ই হবে তার ঘরে গৃহিণী। যে পুরুষ মানুষের মতো হেঁ-হেঁ করে বেড়ায়, আর দেখতেও ভালো নয়।

সনিয়া মনে মনে ছটফট করেছে। একদিন: আর সব মেয়েদের সঙ্গে কঁই যখন 'ক্ষুতুরকুনী'র (ভাদ্রমাসে পূজ্য দেবী) জন্য পুকুরে ফুল তুলতে চলে গেছে, ধোবী আটকে পড়েছে আমবাগানের ধারে। সনিয়া একটু কথা বলার সুযোগ পেল। ধোবীর কাছে গিয়ে ধীরে বলল— "কি করব বলো, ধোবী বাবা যে মত দিলেন না।"

ধোবী হেসে হেসে তার উত্তর দিল-- আরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও না, কঁই (কুমুদ ফুল) তুলে নাও!

সনিয়া ধোবীর নরম হাত ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ধোবী সেখান থেকে পালাল।

এরপরও সনিয়া ধোবীর কাছে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ধোবী তাতে সায় দেয় নি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কঁইয়ের সঙ্গে সনিয়ার দেখা হলে, সে ঘোমটা টেনে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ঘোমটার ফাঁক থেকে মুচকি মুচকি হেসে সনিয়াকে দেখেছে। সনিয়া কখনো ফিরেও তাকায় নি।

চিন্তেই স্বাঁই প্রহরাজের কাছ থেকে সব খবর রাখতেন। তিনিও চুপ ক'রে বসে থাকেন নি। বনেই পরিডার দেমাক দেখে তিনিও বলেছেন— আরে বনার বাবা কনেই তো আমাদের ক্ষেতে মজুর খাটত। আমাদের গোয়াল পরিষ্কার করত। এখন এত দেমাক? আরে, কতদিন এই দম্ভ থাকবে?

প্রহরাজমশাই বললেন— এই হ'ল সংসারের খেলা, মশাই! জগৎটা যে বদলাতেই থাকে।

শেষটায় তাই হ'ল। জগৎটা আবার বদলে গেল। এক বছরও কাটে নি। বনেই পরিডা ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন জোগাতে বাড়ির বাসন-কোসন বাঁধা দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বন্ধকীতে বাসন রাখার মতো লোক তো শুধু চিন্তেই স্বাঁই। তাঁর বাড়িতেই যেতে হ'ল। চিন্তেইয়ের কাছে

প্রচুর ধান। বাড়ির লোকজন তলোয়ার হাতে চোরের হাত থেকে ধান বাঁচিয়েছে। বিশ্বাসী চাকরবাকরেরা ধানের ওপর কড়া নজর রেখেছে।

অনেক লোক জড়ো হ'ল চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়িতে। কারোর হাতে বাসন, তো কারোর হাতে সোনার গয়না। হয় কেনো, কি বাঁধায় রাখো, কিন্তু আমাদের পেটে যেন একটু দানা পড়ে। সব-কিছু উচ্ছন্নে যায়, যাক— যে-যার প্রাণে তো বাঁচি। —এটুকুই সবার মিনতি ছিল।

কিন্তু তখনো স্বাঁই পরিডাকে কোনোরকম সহানুভূতি দেখান নি। দর হেঁকেছেন — এক তোলা সোনার বদলে পাঁচ গৌণি অর্থাৎ বিশ কিলো-টাক ধান আর এক একর জমির বদলে দশ গৌণি ধান পাওয়া যাবে। এ-অবস্থায় বাসন-কোসন নিয়ে কে ভাবে? তার ওপর লোকের মুখ দেখে তিনি ধান দিয়েছেন। তাঁর স্বার্থের লোক না হলে ধান দেওয়া বন্ধ। বনেই পরিডা কী এমন কেউকেটা। তিনি এমনই এক জীব, যাঁর কোনো অস্তিত্বই নেই।

বনেই পরিডার ঘরে যা গয়নাগাঁটি ছিল, গোরুবাছুর ছিল— সবই বিকিয়ে গেল। কিন্তু দিন যে পড়ে আছে। না খেয়ে কতদিন কাটানো যায়? চিন্তেই স্বাঁইও নিজের দর চড়ালেন। এখন এক একর জমির বদলে মোটে তিন গৌণি ধান পাওয়া যাচ্ছে। তা-ও আবার সবাইকার জন্যে নয়। চিন্তেই স্বাঁইয়ের যারা স্বার্থের লোকজন, তারাই কেবল ধান পাচ্ছে। তা ছাড়া তাঁর ঘরে তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খোলা নেই। ধানের ভাঁড়ার-ও শেষ হতে চলেছিল।

বনেই পরিডাকে তিন দিন ধ'রে এটাসেটা ঘাসপাতা আর জল-শামুক খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তার ওপর ছেলেপুলেদের মুখেও তো দু-মুঠো দিতে হবে। ওদের কান্নাকাটি আর সইতে পারা গেল না। জমির দলিলপত্র নিয়ে চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়িতে হাজির হলেন বনেই পরিডা। যে জমিতে তিনি সোনা ফলাতেন, তা বিক্রি ক'রে বিশ গৌণি ধান নিয়ে এলেন। তখন গাঁয়ের অর্ধেক লোক যে-যার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। বহু গৃহবধূ আর সোমত্ত মেয়েরা মান-ইজ্জত বাঁচাতে আত্মহত্যা করেছে।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের ধানের ভাঁড়ার শেষ। কিন্তু ঘরে তাঁর সোনারুপোর

ডাঁই। গাঁয়ের যত জমি তার অর্ধেকের দলিল তাঁর বাক্সে। ধান শেষ হয়ে গেছে। শেষকালে যারা আর ক্ষিদের জ্বালা সইতে পারল না— এসে হাজির হ'ল চিন্তেই স্বাঁইয়ের দালানে। কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই সবাইকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর কাছে ধান বা চাল কিছু-ই নেই। যা আছে তা তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে।

বনেই পরিডাও চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছ থেকে এ-কথাই শুনলেন, ধান শেষ। বনেইয়ের কাছে শেষমেষ মোটে তিন একর জমি আর তার বাড়ি রইল। সব-কিছু নিয়ে আমায় একটু ধান বা চাল দাও।— অনেক আকূতি করলেন। কিন্তু চিন্তেই স্বাঁইয়ের একই উত্তর: ধান শেষ।

বনেই পরিডা বললেন— তোমার অনেক চাকর-বাকর আছে। আমার মেয়ে দুটোকে কি তোমার ঘরে আশ্রয় দিতে পারো না? এদেরকে রেখে দাও। বাড়ির অনেক কাজ করবে, গোবর তুলবে, বাসন মাজবে। তার বদলে ভাতের যে এঁটো ফেন পাবে খাবে। তা না হ'লে এই সোমত্ত মেয়েরা কোথায় কোন্ বেরাস্তায় ঘুরে মরবে?

এ-আমার সাধ্যের ব্যাপার নয়, পরিডা মশাই! কত বড়োলোক শেষ হয়ে গেল, আমি তো তুচ্ছ মানুষ! সময় যে বদলে গেছে, হে! স্বাঁই রুকে ঠুকে শুনিয়ে দিলেন।

চিন্তেই স্বাঁই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। পরিডা-বাড়ির লোকেরা নিরাশ হয়ে ফিরছে, সনেই একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চিন্তেই স্বাঁইয়ের দালানের লাগোয়া ঘরে ধোবী ছিল। ধোবীর মুখটা তার নজরে পড়ল। একেবারে শুকিয়ে গেছে— চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

গ্রাম ছেড়ে যখন যেতেই হবে মেয়েদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হয়। বনেই পরিডা নিজে বুড়ো হয়েছেন। তাঁর বৌ চনী-ও বুড়ী হয়ে গেছে। বৌটা যদি রাস্তায় কোথাও মরেও যায় তো বললেই চলবে— যাকগে, যেতে দাও। হাজার হোক বুড়ী হয়ে গেছে যে। দুই ছেলে— সনিয়া আর মনিয়া জাতে পুরুষ। প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা তারা করবেই। চাই কি, তার জন্যে ভিক্ষে করতে হোক বা চুরি করতে হোক।

কিন্তু কোথায় যাবে পুনী আর কুনী ? ওরা দুটো যে মেয়ে ? ওদের প্রাণ বাঁচবে কি ক'রে ?

পরিডা অনেক আশা নিয়ে মাধো রাউতের বাড়ি গেলেন। তাঁর বলার ছিল— তিন একর জমি নিয়ে পুনী আর কুনীকে ঘরে ঠাঁই দাও। সংসারে তোমার মেয়ে কঁই যেমন মানুষ হচ্ছে, এরাও হবে। যদি বেঁচে থাকি তবে ফিরে এসে আমার মেয়েদের ফিরিয়ে নেব। আর মরে যদি যাই তো এদের দায়িত্ব তোমারই ওপর থাকবে।

কিন্তু পরিডার মনের কথা মনেই থেকে গেল। অনেক আশায় রাউতের বাড়ি গিয়ে সবাই দেখল রাউত মাথায় হাত দিয়ে বসে। শুকনো মুখ, চোখে জল। পরিডাকে দেখেই রাউত তার গলা জড়িয়ে ধরল— আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন আমি কঁইকে কি ক'রে বোঝাব।— রাউত বলে উঠল।

মাধো রাউতের পরিবার সংখ্যায় মোটে তিনজন। স্বামী, স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে কঁই। দুটি ছেলে-মেয়ে মারা যাবার পর, বুড়ো বয়সে কঁই জন্মেছে। খুবই আরামে দিন কাটছিল। জমির যা চাল, ডাল, মুগ আরো সব আসত, তাতে এক বছর চলে যেত। কিন্তু একটানা দু বছর কোনো ফসল হয় নি। সংসার চলবে কি ক'রে ? রাউতের বুড়ী বৌ ভালোভাবে অনুভব করল, সংসারের নৌকো আর এগোতে পারে না। একদিন সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।

মাধো রাউত এখন চীৎকার করছে— হায়, হায়, এ কি হল ? এখন আমি কি করব ?

পরিডা অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তিনি নিজেই দুঃখী। নিজেই তিনি এসেছেন তাঁর বেদনার কাহিনী শোনাতে। কিন্তু এ অবস্থায় তিনি চুপ করে রইলেন। কঁইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিলেন— কাঁদিস না, কঁই। যে গেছে, সে গেছেই। ফিরে তো আর আসবে না। কেঁদে কি লাভ ? তারপর তিনি সনিয়ার মাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন— চল্, আজ থেকে ও-ই তোর মা।

বনেই পরিডা মাধো রাউতের বাড়ি থেকে আর নিজের বাড়ি ফেরেন

নি। যে রাস্তায় হাজার হাজার নর-নারী গেছে, তিনিও তা-ই অবলম্বন করলেন। সপরিবারে এগোলেন— অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে…।

কোথায় গেলেন বনেই পরিডা? অজানা শ্মশানে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ছেলেমেয়েরা? ঈশ্বর জানেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু সনেই মরে নি। কঙ্কাল চেহারা নিয়ে সে গাঁয়ে ফিরেছে। জন্মভূমির মমতা তাকে টেনে এনেছে। গাঁয়ের লোকে তাকে ঈর্ষা করত। ধোবীও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেঁদেছিল। কঁই তো নির্বোধের মতো তার দিকে তাকিয়েছিল। আর সব চেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল মায়ের মৃত্যু। এই-সব ভাবছে সনিয়া। মনের গহনে মায়ের ডাক, ছোটো ভাই-বোনেদের মমতা যেন অনুভব করছে। ঈশ্বর করুন তারা যেন ফিরে আসে!

কিন্তু এই কি তার গ্রাম? গাঁয়ের চেহারাই পাল্টে গেছে। এ তো তার সেই গাঁ নয়, যেখানে ভাগ্যবান লোকেদের হাসিতে খুশিতে বাতাস গুঞ্জন করে উঠত। গাঁয়ের সমৃদ্ধি শেষ হয়ে গেছে। এখন মনে হয়, গাঁ যেন একটা শ্মশান। মানুষ নেই, মানুষের কঙ্কাল রয়েছে। শুকনো মুখ এলোমেলো চুল— প্রত্যেকে বিষণ্ণ, দুঃখী।

রোদ কড়া হয়ে গেছে। সনিয়া গাঁয়ের মাঝামাঝি পৌঁচেছে। কদম গাছের কাছে পৌঁছে গেছে। গাছের নীচে গোপীনাথ ঠাকুরের ছোটো মন্দির। তার সামনে একটা বাঁধানো চাতাল। চাতালের কাছেই বড়ো একটা পুকুর, 'গোপীসাগর'। মন্দিরের দেয়ালে একটা পিপুল গাছ ছিল। এখন সেটা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। দেয়ালে আধ আঙুল চওড়া ফাটল ছিল। ওটা এখন বেশ বেড়ে গেছে। তা, দু আঙুল চওড়া হবে। পুকুরের জল-ছোঁয়া পাথরের সেই ধাপ এখন এবড়ো খেবড়ো হয় গেছে।

সনিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গাঁয়ের কিছু লোকজন পুকুরের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। সনিয়া তাদের কাছে বসে পড়ল।

বিশী জেন্না মুখ খিঁচিয়ে তাকে বলল—আরে, সরে বোস্, না! কোত্থেকে এসে জুটেছে, ভিখিরি কোথাকার?

সনিয়া সরে বসল। সামনেই বসে বিশী কাকা। তার পাশে বাম

ওঝা, পরি দলাই। সবাই পরিচিত। কিন্তু কেউই সনিয়াকে চিনতে পারল না।

শেষে সনিয়াই নিজের পরিচয় দিল— বিশী কাকা, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি সনিয়া — সনিয়া··· !

কি হয়ে গেছে এই গাঁ? দূরদূরান্ত থেকে যে তাকে আকর্ষণ করেছিল. সেই গাঁ আজ তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। গাঁয়ের টান সে উড়িয়ে দিতে পারে নি। ফেরার তাগিদে সে আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে তার সাধের গাঁয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু তার গ্রাম তাকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। সে যে আজ কাঙাল ভিখিরি। দেহ তার অপবিত্র, আত্মা অশুদ্ধ। সে যে দীন, হীন, পতিত। জাতে তার কোনো ঠাঁই নেই, সমাজও নেই··· ।

গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরের সামনে সেদিন বহু লোক জড়ো হ'ল। চাতালের ওপর চিন্তেই স্বাঁই, রাম প্রহরাজ, বিশী জেন্না, হরি মহান্তি। আর, চাতালের নীচে বসল বাম ওঝা, পরি দলাই, ভগী সাহু, বগী কাণ্ডি আরো অনেকে। রোগাসোগা বাচ্চারাও জুটেছে— হৈ-চৈ করছে। গাঁয়ের মেয়ে-বৌয়েরা ক'জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সনেই পরিডা হাত জোড় ক'রে খানিক দূরে ব'সে। আজ তার পাপের বিচার হবে, শাস্তি হবে।

কোন্ পাপ সে করেছে? কোন্-সে অপরাধ··· ?

অন্যদের মতো পেটের তাগিদে সে-ও গ্রাম ছেড়েছিল। ভিখিরির দলে ভিড়েছিল। যেখানেই ভিখারী-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল সেখানেই সবার সঙ্গে বসে ক্ষিদে মিটিয়েছে। জাতধর্মের বিচার তখন থাকে নি। থাকা সম্ভবও ছিল না। যেখানেই কিছু পেয়েছে, তা-সে ব্রাহ্মণ বা মেথর— যার ঘরেই হোক— পরমানন্দে খেয়েছে সনিয়া। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কুকুরের মাংস রেঁধে খেয়েছে। গোমাংসও খেয়েছে।

সনিয়ার বাবা মারা গেছে। কিন্তু সে কোনো ক্রিয়া-কর্ম করে নি। তার শুদ্ধি হয় নি। তার ভাইবোনেরা কোথায় ঘুরে মরেছে কে জানে?

হয়তো কোনো বেজাতের আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও জাত নষ্ট হয়েছে হয়তো। কিন্তু এখন যে সনিয়াকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সনিয়া সবই মেনে নিল। গাঁয়ের লোকেরা হাজার হোক তার স্বজন তো। তাদের সহানুভূতি পাবার জন্য সে সব খুলে বলল। গাঁয়ের লোকেরা তার সুখ-দুঃখের সাথী— তাদের দেখার জন্যে সে দূর থেকে পালিয়ে এসেছে···।

গাঁ থেকে প্রায় সব মানুষই পালিয়েছিল। কিছু মরেছে। কিছু নিখোঁজ হয়েছে। সনিয়া ফেরার আগে যারা ফিরেছিল, তাদেরও অনেকে মারা গেছে। শেষে যারা রয়ে গেল, তারা যে-যার সংসারে আবার অংশীদার হল, তার জন্যে তারা একটা ক'রে হোমের আয়োজন করেছিল মাত্র। সময়কালে তাদের উপদেশ জুটেছিল। সনিয়ার মতো তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নি। বলেছে : পরের বাড়িতে দিনমজুরী ক'রে যেটুকু চাল পেত, তাই তারা গাছের নীচে রেঁধে খেত। বেজাতের হাতে তারা কিছু খায় নি। অখাদ্য খায় নি। তাদের জাত ঠিক ছিল।

গ্রামবাসীর বিচার-বিধি শেষ। প্রহরাজ তাঁর মীমাংসা শোনালেন— হোম হবে, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি অনেক ক্রিয়া হবে। ব্রাহ্মণভোজন হবে আর স্বজাতের লোকেদেরও খাওয়ানো হবে। এ ছাড়া হবে গোপীনাথ ঠাকুরের পুজো আর অষ্টপ্রহর কীর্তন। এই-সমস্ত কাজ হ'লে সনিয়াকে জাতে ও সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তা না হ'লে, সে পতিত হয়ে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে থাকবে।

সনিয়া কি অস্পৃশ্য হয়ে যাবে ? তাই যদি হয়, তা হ'লে তো কারোর বারান্দায় বসতে পারবে না। কারোর কুয়োর জল নিতে পারবে না। তাকে কেউ ছুঁয়ে ফেললে, কাপড়চোপড় না ধোওয়া পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে থাকবে। তার মুখ দেখলে লোকের অমঙ্গল হবে। এ-অবস্থায় সনিয়া মন্দিরে ঢুকতে পারবে না। দেবতার প্রসাদও নিতে পারবে না। মানুষের নামে একটা ভূতের মতন জীবন কাটাবে।

সনিয়া বসে সব শুনছে। হ'ল কি এদের ? দু-দিন থেকে সে কিছু খায় নি। পেটে আগুন জ্বলছে। কিছু খেতে পেলে তার প্রাণ বাঁচে।

গাঁয়ের লোকে তো তার খাবার ব্যাপারে কিছু বলছে না। তর্ক চলছে শুধু— জাত নিয়ে, সমাজ নিয়ে। সনিয়া একদৃষ্টে সবাইকে দেখছে। তার মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না। সত্যি কী হয়ে গেছে এরা ? কত বদলে গেছে !

হরি মহাস্তি গাঁয়ের একজন সাহসী লোক। —আরে সনি ! তিনি বললেন— যে মরে গেছে, সে তো গেছেই। কিন্তু যে বেঁচে আছে, তাকে তো জাতধম্মের নিয়ম মেনে চলতে হবে। বুঝলি ? আবার বললেন, প্রহরাজ যা পরামর্শ দিলেন, সব করে ফেল তা হ'লেই আর-কোনো বাধা থাকবে না। যতক্ষণ এই ক্রিয়াকর্ম না করছিস, কারুর বাড়িতে ঢুকতে পারবি না। বুঝেছিস ?

বগী কাণ্ডি হরি মহাস্তির কথায় সায় দিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেহের শুদ্ধি তো করতেই হবে। দেহ যদি অশুদ্ধ থেকে যায়, তোকে কেউ পুঁছবে না, বাবা !

অন্যরাও এমনই আরো কিছু বলল। সনিয়া সব শোনে। তার কিছু বলার শক্তি নেই। দুর্বল দুই হাত জুড়ে সবাইকে সে নমস্কার করে। শেষমেষ সনিয়া মেনে নিল তো ? সবাই এ-কথাই বলল যে সনিয়া সবার বক্তব্য শুনেছে, মেনে নিয়েছে। তার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে তারা থাকতে পারে নি। সভা শেষ হল। যে-যার বাড়ি ফিরে গেল। এ-কথা কেউই জিজ্ঞেস করল না, সনিয়া কি খেয়েছে ? দু-দিন থেকে সে যে অভুক্ত !

নির্জন, নিস্তব্ধ।

তিন প্রহর রাত। আকাশে চাঁদ। ক্ষিদের জ্বালায় সনিয়ার শরীরটা কাঁপছে। রক্ত-মাংস তো নেই, চামড়াটাই কাঁপছে। বিভুঁইয়ে কখনো কখনো গাছের নীচে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তার নিজের জন্মভূমিতে এক কদম গাছের নীচে তাকে রাত কাটাতে হচ্ছে। খালি পেটে কি সে বেঁচে থাকতে পারবে ? কি করবে ? সামান্য ভাতের ফেন — 'পেজে'র জন্য কি কারো কাছে হাত পাতবে ? না, তাতে মন সায় দিচ্ছে না। সাহসে ভর ক'রে সে ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন তার আশা মিটে গেছে, নিভে গেছে বাসনার আলো। সনিয়া উতলা হচ্ছে।

সে বাঁচবে ; কিন্তু কেন ? কোন্ খুশিতে ? জীবনে আর কী সুখ পাবার আছে ? ভাইবোনেরা কোথায় গেল, কোথায় রইল, ভগবানই জানেন। বেঁচে আছে, কি মরে গেছে কে জানে ? বাড়ির লোকজনকে ছেড়ে, বেঁচে থাকা দুঃসহ। গাঁয়ের লোকে তো সমাজ থেকে তাকে বের করে দিয়েছে। সত্যিই সমাজটা কি ? এ-সমাজে জন্ম নেয়া যত না পাপ, তার চেয়ে বেশি পাপ বেঁচে থাকা। এই বিরাট গাঁয়ের লোকজন তাকে লাথি মেরে বের ক'রে দিল। সে বাঁচবে কি মরবে — এটুকুও জিজ্ঞেস করার ফুরসৎ হল না। লোকের বুক পাথর হয়ে গেছে।

বেশি চিন্তা-ভাবনা করার মতো শক্তি নেই সনিয়ার। সে কদম গাছের আরো কাছে সরে এল। মন্দিরের কাছে গিয়েই শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল।

আরে পাগলা, ধর্ম ছেড়ে বাঁচবি কি করে ? প্রহরাজ যা বলছেন, মেনে নে। যতক্ষণ না ক্রিয়াকর্ম করছিস, কারুর বাড়িতে ঢুকতে পারবি না— হ্যাঁ !

চিন্তেই স্বাঁই আর নিধেই স্বাঁই দুই ভাই। চিন্তেই বড়ো। সে রাজীব স্বাঁইয়ের প্রথমা স্ত্রীর ছেলে। চিন্তেই যখন সাতদিনের, তখন তার মা মারা যায়। রাজীব খুব নিরাশ হয়ে পড়ে। চিন্তেইকে কি ক'রে বাঁচাবে— সব সময় এই চিন্তা। গাঁয়ের বৌয়েরা দরদ দিয়ে চিন্তেইয়ের দেখাশোনা করত। কিন্তু চিন্তেই তাদের নিজের ছেলে তো নয়। পরের ছেলেকে যতটা স্নেহমমতা করা চলে, হ'ল। তারপর তারা আর বেশি উৎসাহ দেখায় নি। কী করে এখন রাজীব ? সে ঠিক করল— দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে। তা হ'লে চিন্তেইকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। চল্লিশ বছর বয়সে সে এক তেরো বছরের মেয়েকে ঘরে আনল। মেয়েটি তো ছোটোই। কিন্তু রাজীবের বাড়ি সে পৌঁছতেই মেয়েরা সব বলতে শুরু করল— আরে ও চিন্তেইয়ের মা !

—চিন্তেইয়ের মা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই চিন্তেইয়ের মা নয়তো কি ?

দেখ্-না, ছোট্ট বাচ্চা তোর অপেক্ষায় রয়েছে ?

ধীরে ধীরে চিন্তেই বড়ো হল। রাজীব স্বাঁইয়ের নতুন বৌয়ের একটি ছেলেও হল— নিধেই। নিধেই ছাড়াও রাজীব স্বাঁইয়ের মেয়েও হয়েছে। কিন্তু চিন্তেইকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। মেয়েরা গেল পরের ঘরে। চিন্তেইয়ের বিয়ে হল। কিছুদিন বাদে রাজীব স্বাঁই মারা গেল।

চিন্তেই দেখলেন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর। দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। —আমি গায়ে খাটব। এই গাঁয়ে শুধু নয়, চাই কি, আরো পঁচিশটা গাঁয়ে নাম কিনব। আমি হারব না। চিন্তেই ভাবলেন।

টাকা— প্রচুর টাকা— এই ছিল চিন্তেই স্বাঁইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। টাকা বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। অনেক ধান জমালেন, বেচলেন, আবার কিনলেন বেচলেন। তিনি লোকের— বিশেষতঃ অসহায় বিধবাদের জমি কিনছেন। গয়নাগাঁটি বাঁধা নিয়েছেন। লোককে টাকাপয়সা ধার দিয়েছেন। মহাজনী কারবার জাঁকিয়ে চালিয়েছেন। লোকে জানত যে, চিন্তেই কারুর থেকে অন্যায় সুযোগ নেয় না। কিন্তু নিজের নায্য পাওনাও ছাড়েন না। নিজেরটুকু পুরোপুরি উসুল ক'রে নেন।

ধীরে ধীরে চিন্তেই স্বাঁইয়ের খ্যাতি বাড়ল, অর্থ বাড়ল। তিনি এ-অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক হয়ে উঠলেন। ছোটো ভাই নিধেই ও বড়ো হল। চিন্তেই তার বিয়ে দিলেন। খেতখামার, ঘরদোরের সমস্ত দায়িত্ব তার ওপর দিয়ে চিন্তেই শুধু মহাজনী কারবার সামলাতে লাগলেন। কিন্তু লাগাম ছাড়েন নি। প্রয়োজনে নিধেইকে ডেকে কাজকর্মের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের একটিই মেয়ে— ধোবী। গাঁয়ের বৌয়েরা ঠাট্টা করে বলত— ধোবীর মা যে বাঁজা গো, বাঁজা। যার ছেলে নেই সে বাঁজা নয় তো কি? চিন্তেই স্বাঁই সবই শুনতেন। জবাবে বলতেন— আরে আমার ছেলে নেই তো কি হল? নিধেইয়ের তো আছে। নিজের বৌকেও এ-কথা বলে চুপ করাতেন— নিধেইয়ের ছেলেপুলেরা তো তোমারই। চিন্তেইয়ের বৌ মৃদু হাসতেন, কিন্তু মনে এক অদ্ভুত ব্যথা, অদ্ভুত এক কাঁপন জাগত। ব্রত-উপবাসে তাঁর বহুদিন কেটেছে। যদি

গাঁয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রসন্ন হন, তাঁর কোল ভ'রে যায়। কিন্তু তাঁর কোল শূন্যই থেকে গেল।

ঠাকুরমার কাছে বাচ্চারা সবাই দুষ্টুমি করত। তিনি স্নেহে মমতায় সবাইকে মানুষ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ধোবীকে। সবসময় ধোবীকে কাছে বসাতেন। তার মুখে একটু ধুলোবালি লেগে থাকলেও নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতেন। কোলে বসিয়ে গল্প শোনাতেন।

এ-অঞ্চলে আকাল দেখা গেল। ফলে হ'ল কি, গ্রামবাসীদের ধন-সম্পত্তি চিন্তেই স্বাঁইয়ের ঘরে এল। বিষ্ণুপুর গ্রাম ছেড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যারা চাইরে চলে গেল, তাদের গয়নাগাঁটি, বাসনকোসন এসে জমল চিন্তেই স্বাঁইয়ের ঘরে। গ্রামবাসীদের যাবতীয় জমি-জায়গা, গাই-বলদ এখন তাঁর। গাঁয়ের বাইরে যত জমি নজরে পড়ে, তার মালিক একজন—চিন্তেই স্বাঁই। যারা গাঁয়ে থেকে গেল, তারা চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়িতে মজতুরী করল।

এক গরীব পরিবারে জন্মে চিন্তেই স্বাঁই একজন ধনী। সমস্ত গাঁয়ে তাঁর ঠাটবাট। যা চান, তা-ই হয়। তাঁর ইশারাতেই লোকে যেন প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তিনি সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, সমাজপতি। কিছু যদি বলেও ফেলেন, পণ্ডিত প্রহরাজ তক্ষুনি তার প্রমাণ উদ্ধার করেন শাস্ত্র থেকে। দু-একটা শ্লোকও আবৃত্তি করেন। শাস্ত্রে যদি কিছু না পাওয়া গেল তো নিজেই মন থেকে শ্লোক বানিয়ে আওড়ান। বলেন— মশাই যা বলেছেন শাস্ত্রে তো তাই লিখেছে···।

আকাল। ঘোর আকাল। প্রত্যেক গাঁয়ে মানুষের ঘর-সংসার ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু লোকের কপালও ফিরল। আকাল হয়ে দাঁড়াল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। লোকের রক্তে ঘামে এঁদের নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হল। নতুন সব পুকুর খোদাই হল। তৈরি হল নতুন নতুন মন্দির। মন্দিরের ঘন্টা-মৃদঙ্গের উচ্চরোলে মরণাপন্ন মানুষের কাতর আর্তনাদ ডুবে গেল।

দু-বছর আগে লোকে যখন না-খেয়ে মশামাছির মতো রাস্তার ধারে মরেছে, চিন্তেই স্বাঁইয়ের বিষয়-সম্পত্তি তখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

গাঁয়ের বাতাস তখন কাঙালদের কাতর চীৎকারে কেঁপে উঠেছে। বিনা খাদ্যে লোকে জংলী বিষপাতাই চিবিয়ে খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চিন্তেই ঠিক করলেন, তাঁর আদরের মেয়ে ধোবীর বিয়ে হবে।

ধোবীর বিয়ে হয়ে গেল।

দুর্গাপুর গ্রাম বিষ্ণুপুর থেকে মোটে দুই ক্রোশ। মাঝে বয়ে চলেছে খরস্রুয়া নদী। জিতেই নায়ক দুর্গাপুরের বিখ্যাত লোক। নিতেই তাঁর একমাত্র ছেলে। নিতেইয়ের সঙ্গে ধোবীর বিয়ে হয়ে গেল। লোকের তো খুবই পছন্দ— যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। বড়োমানুষের সঙ্গে বড়ো-মানুষের মিলন তো হবারই কথা। সবাই খুশি। চিন্তেই স্বাঁই দান-সামগ্রীতে অনেক কিছু দিলেন। লোকে বলল, ধোবীকে সোনার চাদরে ঢেকে দিয়েছেন চিন্তেই স্বাঁই।

পণ্ডিত প্রহরাজ ধোবীর হাতে নিতেই নায়কের হাত রেখে বললেন—

"যথা রাবণস্য মন্দোদরী
যথা ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধারী
যথা রামচন্দ্রস্য সীতা···ইত্যাদি। তিনিও খুব খুশি।

কায়দা দেখিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন— স্বাঁইমশাই, ভগবান মহান। জিতেই নায়ক একজন লাখপতি। তাঁর সঙ্গে আজ এই বন্ধন কতই-না ভালো হল। কোথায় লাখপতি জিতেই নায়ক আর কোথায় কাঙাল বনেই পরিডা। একবার ভাবুন তো···

পণ্ডিতমশায়ের এ-কথা ধোবীর কানেও গেল। সে তখন বিয়ের বেদীর ওপর বসে। হঠাৎ অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল তার মধ্যে। দু-বছর আগের কথা তার মনে পড়ে গেল :

বনেই পরিডা ক্ষিদের জ্বালায় চিন্তেই স্বাঁইয়ের দালানে ভিক্ষে চাইছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই পাশে দাঁড়িয়ে। সনেইও দাঁড়িয়ে। কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই তাঁর শেষ কথা বলে দিলেন— কিছুই পাওয়া যাবে না।— সবাই ফিরে যাচ্ছে। ফেরার আগে সনিয়া মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ধোবীর চোখের দিকে। খুবই নিরাশ দেখায় তাকে। কিছু যেন বলতে চায়। কিন্তু পারে না। মনের কথা মনেই থেকে যায়।

সেদিন যদি বনেই পরিডা নিজের ভুল স্বীকার করতেন, চিন্তেই স্বাঁইয়ের কুটুম হতে রাজী হতেন, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। পরিডা বংশকে কাঙাল হয়ে যেতে চিন্তেই স্বাঁই নিশ্চয় দিতেন না। তাহলে আজ ধোবীর কার সঙ্গে বিয়ে হত ?

ওড়নার ভেতরে ধোবীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের জলের অস্পষ্টতায় সে দেখছে এক তরুণের ছবি— সনিয়া—একটা সুন্দর মুখ—স্বাস্থ্যসবল হাত, কিন্তু চোখে নৈরাশ্যের ছায়া। কী বলতে চায় সনিয়া ? ও কিছু-একটা বলতে চাইছে। কিন্তু বলতে পারছে না।

ধোবীর চোখ বুজে এলে। ঢলে পড়ল তার নিষ্ঠুর বাবার পায়ে। চিন্তেই স্বাঁই মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। নাপিতকে ধমকালেন—আরে এই ফগু ! এদিক-ওদিক কি দেখছিস ? পাখা কর ! তাড়াতাড়ি। দেখছিস না হোমের তাতে মেয়েটা ঘামছে। আঁচলটাও ভিজে গেছে !

বাবা নিশ্চয় ধোবীর শরীরের যন্ত্রণা বুঝেছে। কিন্তু হৃদয়ের যন্ত্রণা ? সে-কেবল ধোবীই অনুভব করেছে।

বিয়ের পর পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ি চলেছে ধোবী। দরজার পর্দা থেকে তার দৃষ্টি ছুটে চলেছে। রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে ভিখিরি কাঙাল।

কিন্তু সনিয়া ? এদের মধ্যে সে আছে কি ?

কোথায় সনিয়া ? ধোবীর শরীর শিউরে উঠছে।

দুর্গাপুরেও কাঙালীর ভীড়। জিতেই নায়ক লঙ্গর খুললেন। কুললক্ষ্মী ধোবীর চোখে কাঙালদের দেখে জল এসেছে। ভিখিরিরা না খেতে পেলে সে-ও অভুক্ত থেকেছে। বিছানায় শুয়ে থেকে আত্মহারা হয়েছে। জিতেই নায়ক কত আর সহ্য করেন ? ধোবীর স্বামী নিতেই-ও পাশে বসে সোহাগ করেছে। ধোবীর দুঃখের কারণ জানতে চেয়েছে। কিন্তু জবাবে ধোবী সামান্য হেসেছে। কোনো কথা তার মুখ থেকে বেরয় নি।

একদিন ধোবী বলল, সে আর কাঙালদের দুর্দশা সহ্য করতে পারছে না। জিতেই নায়ক তো ধনী। কাঙালদের জন্য কি তিনি একটা লঙ্গর খুলতে পারেন না ?

নিতেই-ও তার বাবাকে এই পরামর্শ দিল। আদরের বৌমার অনু-

রোধ জিতেই নায়ক ফেলতে পারেন নি। জিতেই একটা লঙ্গরখানা খুললেন।

দূরদূরান্ত থেকে কাঙাল-ভিখিরি আসতে লাগল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অগণিত কাঙাল এল একের পর এক। দুর্গাপুর গাঁ ছেড়ে বহুলোক চলে গেছে। তাদের খালি বাড়িগুলো কাঙালীতে ভরে গেছে। কিন্তু সবাইকে খাবার জোগানো সম্ভব নয়। প্রত্যেকদিন কিছু লোক মারা যাচ্ছে। মড়া সরাবার জন্য কেউ এগিয়েও আসছে না। মশামাছির মতো যেখানে মরছে, সেখানেই পড়ে পড়ে পচছে। মড়ার দুর্গন্ধে দুর্গাপুরের বাতাস অসহ্য হয়ে উঠল। এ কী করেছে জিতেই নায়ক ? এত লোককে খাওয়ানোর মতো সামর্থ্য তাঁর নেই। কি করবেন ? কিছুই ভাবতে পারছেন না। এই সময়ে পণ্ডিত প্রহরাজকে নিয়ে চিন্তেই স্বাঁই দুর্গাপুরে এলেন। জিতেই নায়ককে তাঁরা অনেক বোঝালেন— বেয়াই মহাশয়, এত কাঙালীকে আপনি খাইয়ে বাঁচাতে পারবেন না। ধোবী ছেলেমানুষ। ও কী বোঝে, এই দায়িত্ব কত বড়ো জিনিস। দিনের পর দিন কাঙালীর সংখ্যা বাড়বে। আপনি সামলাতেও পারবেন না।

জিতেই বললেন— ভগবানের ওপর ভরসা করে আছি। নিতেই তো পাগল। শেষটায় এই সম্পত্তি করলাম কার জন্যে ? সম্পত্তি থাকলে ওই-তো মালিক হবে। না থাকলে ওদেরই কষ্ট। আর, সম্পত্তি যদি চলে যায় তো, যাক। এই-সব মানুষের আশীর্বাদ ওদের সঙ্গে থাকবে। তাই নিয়ে ওরা ঘর-সংসার করবে !

পণ্ডিত প্রহরাজ একটু নস্যি নিলেন। বললেন, কলিযুগে দুষ্টের দমন করতে ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠিয়েছেন। এখন, সংসারে যত মহাপাপী আছে, তারা সব রাস্তার ধারে ধারে মরবে। নারায়ণ নিজের হাতে দুর্জনের সংহার করেন না। তিনি অন্ন-জল থেকে বঞ্চিত ক'রে মানুষকে মারেন। নায়কমশাই, কলিযুগ শেষ হতে চলেছে। পাপীদের সহানুভূতি দেখানো ঠিক হবে না।

চিন্তেই স্বাঁই ও পণ্ডিত প্রহরাজ নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। জিতেই নায়ক লঙ্গর বন্ধ করেন নি। নিতেই নায়ক কয়েকজন জোয়ান

ছেলেকে নিয়ে এগোল। পড়ে-থাকা মড়াগুলো কাঁধে নিয়ে দূরে এক জায়গায় ফেলে এল।

কথায় বলে, দুর্দশারা একা আসে না। অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কলেরা। প্রতিদিন লাখে লাখে কাঙালী মরতে লাগল। নিতেই কি করে এখন? প্রত্যহ মরা নিয়ে দূরে দূরে ফেলে আসা হল তার কাজ। ধোবী এটা লক্ষ্য করল। কলেরার মড়া এভাবে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। সে নিতেইয়ের হাত ধরে বলল— না, তোমায় আমি যেতে দেব না। এ-গাঁয়ে থাকা-ও এখন উচিত নয়। চলো, আমরা বিষ্ণুপুরে চলে যাই। ওখানে কিছুদিন থেকে ফিরে আসব।

—আরে! কী পাগলামো হচ্ছে? ভয় পাচ্ছ কেন? ভগবান কি নেই নাকি? তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান। মড়াগুলো যদি না সরানো হয়; তাহলে অন্যদেরও বাঁচানো যাবে না। সবই তো বোঝ তুমি। নিতেই ধোবীর মাথায় হাত রাখে, আর মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে তার চুলগুলো ঠিক ক'রে দেয়।

নিতেই কোমরে গামছা বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। ধোবী গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠেকায়।

নিতেইয়ের সাহস দেখে তার বাবা-ও মড়া সরাতে কোমর বাঁধলেন। কলেরা দিনের পর দিন বেড়েই চলল। তাঁদের পক্ষে সবার ক্ষিদের জ্বালা মেটানো সম্ভব হ'ল না। কুখাদ্য খাওয়ার ফলে ঘরে ঘরে কলেরা দেখা দিল। গাঁয়ের দেবতা মানুষকে বাঁচাতে পারলেন না। এমনি একদিন এল যখন জিতেই নায়ক ও তাঁর ছেলে নিতেই নায়ক একই সঙ্গে কলেরায় পড়লেন। ধোবী আর তার শাশুড়ী কেঁদে কেঁদে সারারাত কাটালো। সকালে চিন্তেই স্বাইয়ের কাছে খবর পৌছলো: জিতেই নায়ক ও তাঁর ছেলে নিতেই নায়ক ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন, চিরকালের জন্যে। বাড়িতেও কাঙালীরা ঢুকে যা-কিছু ছিল লুটেপুটে নিয়েছে।

ধোবী বিধবা হ'ল। বিয়ের একবছর-ও পুরো হয় নি। কি কারণে তার এই দুর্ভাগ্য? এর জন্যে দায়ী কে? কার জন্যে তার এই সোনার সংসার চুরমার হয়ে গেল? এই কথা ভাবে আর ছটফট করে ধোবী।

কাঙাল-ভিখিরির দুঃখ সইতে পারে নি সে। সহানুভূতিকে সে লঙ্গর খোলার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পরিণতি কি হ'ল? তার সংসারেরই সর্বনাশ হয়ে গেল।

ছ-মাস বিছানায় পড়ে রইল ধোবী। কেঁদে কেঁদে তার দিন চলে যায়। মা অনেক বোঝাল ওকে। কিন্তু সে মানলে তো! মা বললেন—ওরে ধোবী, এত দুঃখ করছিস কেন? যা হবার তো হয়ে গেছে। মনে কর্-না, এ তোর দুঃস্বপ্ন ছিল। তুই যে আমার আদরের মেয়ে রে! তোর তো কিছু বদলায় নি। আমি তোর আবার বিয়ে দেব। চল্, ওঠ।

শুনে ধোবী কান্নায় আরো ভেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। ঠাকুমা-ও এসে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কখনো কখনো হাসিঠাট্টা করেছেন— আরে একটা গেছে তো কি হল? আরেকটা আসবে। তারপর ধোবীর মাথা কোলে নিয়ে সাহস দিয়েছেন— ভুলে যা রে! ভেবে নে এটা তোর একটা পুতুল খেলা ছিল। ভেঙে পড়ার কোনো দরকার নেই। আবার তোকে আমি সোনার পুতুল গড়িয়ে দেব।

এ-সব ধোবীর ভালো লাগে নি। হাত ছাড়িয়ে সে ঠাকুরমার কাছ থেকে সরে যেত।

ধোবীর কাকা নিধি স্বাঁই, ধোবীর কাছেই সব সময় থেকেছেন। [illegible] ধন যে ঐ ধোবী। কাকার কোলেই ছোটোবেলা থেকে [illegible]। তার মনের কথা কাকাকেই সে বলত, আর কাউকে [illegible] কথা বা, [illegible]কেও সে বলতে পারত না। কিন্তু কাকাকে বলতে কখনো লজ্জা পায় নি। নিধি স্বাঁই-ও ধোবীকে সৎ পরামর্শ দিতেন। অনেক ছেলেমেয়ের বাবা হয়েও তিনি ধোবীকে তাঁর একমাত্র মেয়ের মতো মনে করতেন।

আজ এ কী হ'ল ধোবীর? কাকা হায় হায় করে ওঠেন। ধোবীর মুখ দেখলেই তাঁর কান্না আসে। তাঁর কাছে গিয়ে বসলে ধোবীও কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাকা তার মাথাটা কোলে নিয়ে পিঠে হাত বোলান।—এ কী করছিস ধোবী? ওরে তোর কাকা যে বেঁচে এখনো! আমার প্রাণ থাকতে আমি তোকে কাঁদতে দেব না। চুপ কর্, সব-কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ধোবী শান্ত হয়। যেতে যেতে কাকীমা একটু থেমে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাচ্চারাও এসে ধোবীকে আদর ক'রে তার পিঠে চড়ে।

বড়োই মোকদ্দমাবাজ লোক গাঁয়ের হরি মহান্তি। চিন্তেই স্বাঁই তাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন— জিতেই নায়ক আর নিতেই নায়ক অনেক সম্পত্তি জমি রেখে গেছে। তার কি হবে? জ্ঞাতিগুষ্টিরা কি লুটে খাবে?

হরি মহান্তি গোঁপে তা দিলেন। চিন্তেই স্বাঁইয়ের কানের কাছে এসে বললেন— স্বাঁইমশাই, জ্ঞাতিগুষ্টির লোকে যদি সম্পত্তি দখল করে, তাহলে আমি কলম ছেড়ে ঘাস কাটব। কি, বুঝলেন কিছু? জানেন কি এই কাগজে কার আঙুলের ছাপ আছে? এ হ'ল জিতেই নায়কের আর এ হ'ল নিতেই নায়কের। কাগজটা আপনার হেপাজতেই রাখুন। বড়ো কাজে দেবে। জানেন আমি কি করেছি? আপনি যখন মেয়েকে সামলাচ্ছিলেন, তখন আমি দুটো মড়ার আঙুলের ছাপ নিয়ে নিয়েছি। কি, বুঝলেন?

হরি মহান্তি আরো বললেন— যতক্ষণ না ধোবীর আবার বিয়ে হচ্ছে ততক্ষণ সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক থাকবে। যদি সে আবার বিয়ে করে, তাহলে সম্পত্তির অধিকার চলে যাবে। এই কাগজেই ধোবী দত্তক পুত্র নেবার অধিকার পেয়ে যাচ্ছে। আর এই অনুমতি দেবেন স্বয়ং জিতেই নায়ক আর নিতেই নায়ক। তারিখ পিছিয়ে কাগজের বয়ান লেখা হবে। জানেন, ধোবী দত্তকপুত্র কাকে নেবে? আপনার ছোটোভাই নিধি স্বাঁইয়ের মেজো ছেলে বিদেই-কে।

—নিজের ভাইকে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভাইকে। আইন যাই বলুক-না-কেন, এ রকম হয়। দেশে এমন রীতি আছে। স্বাঁইমশাই, আমি কলম দিয়ে কাজ করি, হাল দিয়ে নয়। দুই বিষয় সম্পত্তি এক হয়ে যাবে। আজ থেকে ওই সম্পত্তির ওপর নজর রাখুন, নিজের দখলে রাখুন। দেখাশোনা করার জন্যে একটা লোক রাখুন। নিজে একবার গিয়ে দেখে আসুন।

—ঠিক আছে, মহান্তিমশাই! আপনি তো নিজের লোক। আপনি

একবার যান। আপনার নামে ধোবী অনুমতি দিয়ে চিঠি লিখে দেবে।

—আরে, আমার সময় কোথায় ? তবে হ্যাঁ, যদি যেতে বাধ্য করেন তো যেতেই হয়।

হরি মহান্তির নামে অনুমতি পত্র দিল ধোবী। রেজেস্ট্রী ক'রে নেওয়া হ'ল অধিকার পত্র। রাম প্রহরাজ, বিশী জেনা, নীলু সাপু সাক্ষী রইল। চিন্তেই স্ব াই এবারে নিশ্চিন্ত। গোঁপে হাত বুলিয়ে হরি মহান্তি বললেন— স্ব াইমশাই, বুদ্ধি থাকলে জল থেকেও ক্ষীর বের করা যায়!

চার মাস কেটে গেছে। ধোবী একটু শান্ত হয়েছে। বাড়ির কাজকর্ম করছে। এখন সে বিধবা। মাসে মাসে ব্রত-উপবাস করাই তার ধর্ম। গোপীনাথ ঠাকুর, নীল কণ্ঠেশ্বর মহাদেব, রামচণ্ডী দেবীর সেবা ক'রে তার দিন কাটে। একলা থাকাটাই তার বেশি পছন্দ। নিজের ঘরে বসে পুরাণ পড়ে। পড়তে পড়তে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। আবার নিজেই শান্ত হয়ে যায়।

ঠাকুমা ঘরে ঢুকে ঠাট্টা করেন। মা এসে চোখের জল মুছে দেন। বলেন— আরে পাগলী! এ তুই কি করছিস? আয়, তোকে গয়না পরিয়ে দিই। আরে আজ তোর যে-অবস্থা, এমনি অনেক মেয়েরই হয়। কিন্তু তা নিয়ে কেউ সারা জীবন কাঁদে না। দুঃখ ভুলে নতুন ক'রে সংসার করে।

ধোবী কোনো উত্তর দেয় না। গয়না প'রে কাকীমার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কাকীমা বলেন— কত ভালো ছেলে ছিল আমাদের নিতেই। যেমন রূপ তেমনি গুণ।— ধোবী আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বাবা সব সময় কাজেকর্মে ব্যস্ত। ধোবীকে দেখার তাঁর অবসর নেই। কিন্তু কাকা বাড়ি ফিরেই আগে ধোবীকে ডাকেন— ধোবী মা! তেলটা আন্! আমি চান করতে যাব! মনে হয় যেন বাড়িতে আর কেউ নেই। সব-কিছু ধোবীকেই করতে হবে। তাকেই ভাত বাড়তে হবে, পাশে বসে খেতে হবে। আর তারপরে ভাগবত পুরাণ পড়ে শোনাতে হবে।

কাকীমা বলে— আরে ধোবী কি মাছ খায়? বিধবার আমিষ খাওয়া বারণ যে।

নিধি স্বাঁই বলেন— আমাকেও মাছ খেতে ডাক্তার বারণ করেছে। মাথা ধরে আমার।

এ-সব কথা কাকীমার ভালো লাগে না। মুখ ঘুরিয়ে সে চলে যায়।

একদিন মা বাবাকে মনের কথা বলে ফেলেন— দেখো তো ধোবীর কি অবস্থা হয়েছে। ওর জন্যে একটা ভালো পাত্র খোঁজ করো। গরীব হলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু দেখতে যেন ভালো হয়। এত সব বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কি করব ? ধোবী তো এর অর্ধেক ভাগীদার।

চিন্তেই হুঁ-হাঁ করেন। মুখে বলেন, এই বংশে আজ পর্যন্ত যা হয় নি, তা আমি করি কি করে ? বিধবা হওয়া কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। আর, মেয়েরা বিধবা হ'লে, যেভাবে দিন কাটায় তেমনি ধোবীও দিন কাটাবে। চিতেই নায়কের সমস্ত সম্পত্তির মালিক ও। ওর অসুবিধেটাই বা কোথায় ? ও একটা ছেলেকেও দত্তক নিতে পারে। আমাদের বিদেই হবে ওর ছেলে। ওকে নিয়ে সুখে স্বস্তিতে ধোবী জীবন কাটিয়ে দেবে। কোন্ জিনিসের অভাব আছে ওর ?

—না-না, এ-কথা বোলো না। চুলোয় যাক্ তোমার সম্পত্তি। আমার ধোবীকে আর জ্বালিয়ো না। তুমি ওর জন্যে একটা পাত্র খোঁজো। মুখ্যু, মজুর যা কিছু হোক— ভালো ছেলে হওয়া চাই। লোকে নিন্দে করলেও কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ধোবীর জীবনটা বাঁচবে।

চিন্তেই স্বাঁই স্ত্রীর কথা শুনে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। ভাবেন, হাজার হোক মেয়েমানুষের জাত তো ! বাস্তব জীবনের ব্যাপারটা যে কি, বুঝবে কি ক'রে ? কত মেয়ে বিধবা হয়ে মারা যায়। ধোবীর যদি বিয়ে হয়, তাহলে নায়ক-বাড়ির সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। এত সম্পত্তি যে, সাতপুরুষ চলে যাবে। এ কেউ ছেড়ে দিতে পারে ?

ধোবীর মা হতাশ হয়ে নিধি স্বাঁইয়ের কাছে ছোটেন।— শুনেছ, তোমার দাদা কি বলছেন ?— তিনি আবার সমস্ত কথা তাঁর দেওরকে জানান।

নিধি স্বাঁই বলেন— বৌদি ! ধোবীর চিন্তা তুমি কেন করছ ? এ-সব দাদাকে কেন বলো ? ধোবী আমার মেয়ে। আমি ওর দায়িত্ব নেব।

ক'টা দিন যাক! ওর পাগলামো আপনিই কেটে যাবে। যখন পুরোপুরি ধাতস্থ হবে, দাদার মতামত কিছুতেই মানব না। আরো কয়েকটা দিন তুমি অপেক্ষা করো।

—দাদার কথা মানবে না? আমি কি জানি না? দাদা যদি বলেন—জলন্ত আগুন গিলে খাও, তুমি তাই গিলে খাবে। তুমি তো ওঁর সামনে দাঁড়াতেও ভয় পাও। আর বলছ, ওঁর কথা মানব না! আমার সব জানা আছে, বুঝলে?

—বৌদি! আমাকে বিশ্বাস করো। সত্যি বলছি! ধোবীর ব্যাপারে দাদাকে ভয় পাব না, মোটেই ভয় করব না!

দু-মাস পর। ধোবীর দুঃখ ধীরে ধীরে কমে এল। আগে সবসময় বিছানায় পড়ে থাকত। কিন্তু এখন এদিক-সেদিক ক'রে কিছু কাজ করে। ঠাকুরের মালা-গাঁথা, পুরাণ-পাঠ, আরো সব কাজ করে। দুপুরে ঠাকুমার সঙ্গে 'কাঞ্জিগাত' খেলাতেও জুটে পড়ে। হাসিঠাট্টার কথাতেও কখনো-সখনো যোগ দেয়।

কারোর দুশ্চিন্তা চিরকাল থাকে না— সংসারের এই হল নিয়ম। সময়ই দুঃখকে লাঘব করে দেয়। কখনো কখনো এমনও মনে হয়, যেন সমস্ত ভবিষ্যৎটা অন্ধকারময়। কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল থাকে না। তুফানের পরে সমুদ্রের অবাধ ঢেউ শান্ত হয়ে যায়।

সকাল-সকাল ধোবী গোপীনাথ ঠাকুরের সেবায় বেরিয়ে পড়ে। পুরোহিতের হাত দিয়ে ফুল-চন্দন ঠাকুরের কপালে ছুঁইয়ে দেয়। ঘণ্টা-খানেক ধরে গুন্ গুন্ করে যায়। বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। বাড়ি ফিরে ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনার কাজ। পাঁচ বছরের বিদেই তার সবচেয়ে আদরের। সব সময় সে ধোবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ধোবীও তাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করে।

বিদেইকেই ধোবী পোষ্য নিক! শ্বশুরমশাই আর পতিদেবতার অনুমতি তো নেওয়াই আছে। বিদেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে— এ কথা ভাবলেই ধোবী শিউরে ওঠে। তাকে কোল থেকে নাবিয়ে দেয়। একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন সে অন্য কেউ। ধোবীর

মনের কথা বুঝতে পারে না বিদেই। তার পিঠে চেপে বলে— টুনটুনির গল্প বল না, দিদি!

ধোবী তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। বিদেই কেঁদে ফেলে।

কাকীমা ছুটে এসে বিদেইকে কোলে নেয়। বিদেই তবু চেঁচায়— দিদির কাছে যাব!

কাকীমা তাকে বকে-ধমকে চুপ করাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিদেই থামলে তো! কাকীমা রেগে তাকে মাটিতে ফেলে তিতি বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

কতক্ষণই বা ধোবী বিদেইয়ের কান্না সহ্য করতে পারে? ঘর থেকে ছুটে আসে। বিদেইকে কোলে নিয়ে আদর করে। চুপ করে যায় বিদেই। ধোবী তাকে টুনটুনির গল্প শোনায়।

সন্ধেবেলা ধোবী মহাদেবের মন্দিরে যেত। গাঁয়ের ও-প্রান্তে নীল-কণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের চারদিকে বেল, দেবদারু, নারকোল জাতীয় নানান ধরনের গাছ। একটা পুরনো পুকুরও আছে. কিন্তু এখন শুকিয়ে গেছে। তবুও তাতে অনেক জল আর ছোটো ছোটো কুমুদলতা। ওতে অনেক সাপও আছে।

মন্দিরের রাস্তায় বনেই পরিডার বাড়ি। ক্ষেত থেকে দেখা যায় তাঁর বাড়ি। দেয়ালগুলো ভেঙে গেলেও জীর্ণ চেহারায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

বনেই পরিডার বাড়িটা চোখে পড়লেই ধোবী শিউরে ওঠে। মনে পড়ে যায়, বনেই পরিডার ছেলে সনিয়া এখানে থাকত। ঈশ্বর জানেন সনিয়া কোথায় চলে গেছে। কে জানে, কোন্ শ্মশানে তার দেহটা শেয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়েছে?

কত সুন্দর, কত না প্রতিশ্রুতিবান ছিল সনিয়া! কিন্তু আজ সে নেই। ধোবী ভাবতে ভাবতে এগোয়।

কাঙালী দেখলেই ধোবী রেগে যায়। এদের জন্যেই তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাদের দুঃখ সে সইতে পারে নি। তাই লঙ্গর খুলেছিল। কিন্তু ভগবান বোধহয় তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কেন সে

ভগবানের ওই কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল ? নিজেই ভগবানের কাছে শাস্তি পেল সে।

সন্ধেবেলা। ধোবী মহাদেবের মন্দির থেকে ফিরছিল। বনেই পরিডার পড়শী বাম ওঝার মেয়ে টিমি দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলল— ধোবী দিদি! শুনেছ ? বনেই পরিডার ছেলে সনিয়া বাড়ি ফিরেছে! ছি, ছি, কী চেহারাই হয়েছে। চেনাই মুশকিল, দিদি। যেন ঘাটের মড়া পালিয়ে এসেছে।

ধোবী চমকে ওঠে। ভরসা হল না তার। টিমির হাত ধরে নেড়ে জিজ্ঞেস করল— কে ফিরেছে ?

—সনিয়া দাদা! সনেই পরিডা— বনেই পরিডার ছেলে গো! গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরের কাছে বসে আছে। ওর কাছে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করছে তাকে। ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, লুকিয়ে ওদের কথা একটু শুনলাম। বাবা বলছিলেন— ওরে সনিয়া, তোর ঘরে তো চালা নেই। থাকবি কোথায় ?

ধোবী আর এগোতে পারে না। ঘাস-গাছড়ায় ভরা সনিয়ার বাড়িটার দিকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল—টিমি, কি উত্তর দিল সনিয়া দাদা ? বল্ না ?

—জানি না। অনেকে খুব চেঁচামিচি করছে। উত্তরটা তার শুনতে পাই নি। একটা ছোটো ছেলে সনিয়ার কাছে চলে গিয়েছিল। গাঁয়ের পরিয়া কেওট চেঁচিয়ে উঠে বলল— আরে, এই! ওকে ছুঁসনি যেন! ভগবান জানে কার-না-কার সঙ্গে লঙ্গরখানায় খেয়েছে! ওর আর জাতধম্ম নেই। সনিয়া তো আজ অছুত গো, অছুত!

—অছুত!

—হ্যাঁ, ধোবীদিদি! এ-কথাই তো কয়েকজন বলছিল। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি নি। ওই বিশী জেনার ছেলে চন্দরা আছে না ? খুব পাজী! আমার দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল। আস্তে আস্তে আমার দিকে এগোচ্ছিল। আমি ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

ধোবী বোধ হয় টিমির কথাটা বুঝতে পারল না। আত্মহারা হয়ে

গেছে সে। সনিয়াকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। শান্তভাবে এগিয়ে চলল।

টিমি বলল— আর-কেউ ওর সঙ্গে নেই। একা ফিরেছে।

'আর কেউ নেই'— এর মানে বুঝতে পারল ধোবী। সমবেদনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, কোনো খবর পাওয়া গেছে কি ?

টিমি বলল, কিছু পাওয়া যায় নি, দিদি! লোকে বলছে মারা গেছে। কেউ কেউ বলছে, খেরেস্তান, না, মুসলমান··· তবে হ্যাঁ, মা বলছিল— নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মাথায় জল দিলে উনি আমাদের ডাক শুনতে পাবেন। উনি বড়ো দেবতা কিনা, সবার কথা শোনেন।

ধোবীর বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু সে ভাবল গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরের দিকে যাবে, সেখানে সনিয়া বসে আছে। ওদিক থেকে খুব হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। টিমি বলল— অনেক লোক জড়ো হয়েছে, দিদি!

দুজনে ওইদিকে হাঁটতে শুরু করল।

অন্ধকার রাত। আকাশে এখনো চাঁদ ওঠে নি। ধোবী বাড়ি ফিরছে একলা। সনিয়ার দুঃখময় কাহিনী তার মনে যন্ত্রণা দিচ্ছে। একের পর এক দুঃসময় এসেছে সনিয়ার জীবনে। মৃত্যুর সঙ্গে সে লড়াই করেছে। কিন্তু গাঁয়ের অদ্ভুত আকর্ষণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। অনেকদিন পরে সে গাঁয়ে ফিরেছে। গাঁয়ের মাটি তো তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু গাঁয়ের লোকে করে নি। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তের পর সে সমাজে যোগ দিতে পারবে। এই কাজ যতক্ষণ না হচ্ছে, গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে জলও পাবে না। কারোর বারান্দায়— কারোর বাড়ির ছায়াতে আশ্রয়ও পাবে না।

বেঁচে থাকা কি পাপ ? বাঁচার জন্যে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। সেটাও কি অপরাধ ? মানুষের অন্তরাত্মার কাছে সে অপরাধী নয়। মানুষ এই পৃথিবীতে যেদিন এল, সেদিন থেকেই তার বাঁচার অধিকার জন্মেছে। সেদিন থেকেই তার খাওয়া-পরার অধিকার।

ধোবী অস্থির হয়ে উঠেছে। যাই হোক, সনিয়া কাঙাল তো।

কাঙালদের জন্যে সে তার সব-কিছু হারিয়েছে। পথের ধারে পড়ে বহু কাঙাল মারা যায়। সনিয়াও তাদের একজন। তাদের ওপর সে আর কোনোরকম দরদ দেখাবে না।

তবু সনিয়া তার গাঁয়ের ছেলে। ধোবীর মনে তার জন্যে কিছুটা স্থান ছিল। তার স্মৃতি তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে।

ধোবী বিদেইকে কোলে শুইয়েছে -- গল্প শুনিয়েছে। শোনাতে শোনাতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকীমা এসে তাদেরকে জাগিয়ে দিয়ে বলল— কাকা বসে আছেন। সঙ্গে ধোবী না বসলে তাঁর পেটে অন্ন পড়বে কি করে ?— মুখ ঘুরিয়ে বলল— ঢঙ, সব ঢঙ !··· বিদঘুটে ঢঙ··· হুঁ: !···

ধোবীর মুখে কিছু রুচলো না। একটাই কথা তার মনে হ'ল – সনিয়া কাঙাল··· সনিয়া কাঙাল। ব্যাকুল হয়ে তার দিকে যেন তাকিয়ে আছে সনিয়া। যেন কাঁপা-কাঁপা হাতে ধোবীর হাত ধরে সে বলছে— আমাকে একমুঠো ভাত দাও – আমি কিছু খাই নি। তার শ্বশুর আর স্বামীর কথা ধোবীর মনে পড়ে। কাঙালীর সেবায় তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। সনিয়া তাদেরই একজন।

তবে কি সনিয়া ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়ে পড়ে থাকবে ? গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় মুক্ত আকাশের নীচে সনিয়া কি পড়ে পড়ে কাঁপবে ? এ-অবস্থায় জিতেই নায়কের পুত্রবধূ নিতেই নায়কের স্ত্রী কি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে ? এই প্রশ্নগুলো ধোবীকে বিঁধতে লাগল।

ধোবী ভাবল— আমার শ্বশুর আর স্বামী কোন্ ব্যাপারে এত সম্পত্তি রেখে গেছেন ? শ' শ' মন ধান শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে আনা হয়েছে কিসের জন্যে ? স্বামী-শ্বশুরের অসমাপ্ত কাজ কি ধোবী সম্পূর্ণ করতে পারবে ? কাকে বলবে ? বাবা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন বাবার ভয়ে কাকা-ও মুখ খুলবেন না। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের এখানে কোনো অধিকার-ই নেই। তাহলে কী করবে ধোবী ? কাকে বলবে তার মনের কথা ?

ধোবী পুরোটা খেতে পারল না। আধপেটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। কাকা জিজ্ঞেস করলেন – আর একটু খা, মা ! রোজই কম খাচ্ছিস। কত

দুর্বল হয়ে গেছিস জানিস ? কি হয়েছে ?

ধোবী কোনো উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু কাকীমা একটা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে দিল। বলল— আমি বারণ করছিলাম সন্ধেবেলা ঠাণ্ডা ভাত খাস্ নি। কিন্তু আমার কথা শুনলে, তবে তো ?

কাকা নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু ধোবী বুঝতে পারল না কাকীমা মিথ্যে বলল কেন ?

মাঝ রাত। ঠাণ্ডা একটু বেশি। ধোবী বিছানা ছেড়ে বাইরে এল। ঠাকুমা নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে অতল। ধোবী চারদিকে তাকায়। নির্জন নিস্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাকে রাতের নিস্তব্ধতা কেটে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। স্বচ্ছ আবহাওয়া। ধোবীর চোখে ঘুম নেই। সনিয়ার স্মৃতি তাকে অবিরাম যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ও বোধ হয় গাছের নীচে শুয়ে রয়েছে— খালি পেটে, খালি গায়ে। ঘুম তার নিশ্চয় আসছে না। কি করছে ও ?

ছোটোবেলার অনেক কথা মনে পড়ে। সনিয়াদাদা সত্যি তাকে খুব ভালোবাসত। ধোবী যা বলত, তক্ষুনি তাই করত। তার যে আশা ছিল, একদিন ধোবীকে হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসবে। তাকে নিজের বৌ করবে। কিন্তু বনেই পরিডা তাতে বাধ সাধলেন। ধোবীর বাবা-ও বনেই পরিডার অহংকার সহ্য করতে পারেন নি। তিনি-ও প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু তার জন্যে সনিয়াদাদা দায়ী নয়।

সেদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর। বাবা যে মত দিলেন না, পণ্ডিত প্রহরাজ ফিরে গেলেন। বলো না, এখন কি করব ?

ধোবী ঠাট্টা ক'রে বলেছিল— যাও, কঁই (কুমুদ ফুল) তুলে নাও।

হ্যাঁ, সেদিনই শেষ কথা হয়েছে। তার পরে আর দেখা হয় নি।

আজকে কঁই নেই। মেয়ে-বাপ দুজনে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। আজও ফেরে নি। সেদিনের ধোবীও আর নেই। যেদিন সে বিষ্ণুপুর ছেড়ে দুর্গাপুরে গিয়েছিল, সেদিনই মৃত্যু হয়েছে সেই ধোবীর। এখন যে-ধোবী বেঁচে আছে, সে অন্য কেউ।

এখনো সনিয়া বেঁচে আছে। এত বড়ো পৃথিবীতে সে একলা। তার ভাগ্যটাই খারাপ। তার কাছে ভগবান-ও পাথরও হয়ে গেছেন। এ-গাঁয়েরই ছেলে সে। গাঁয়ের দেবতার সামনে কি ছটফট করে সে মারা যাবে?

শিউরে উঠেছে ধোবী। কাতারে কাতারে মৃত্যু সে নিজের চোখে দেখেছে। কি ভয়ংকর ছিল সেই মৃত্যু! মানুষের সুন্দর স্বপ্ন মৃত্যুই খান্-খান্ করে ভেঙে দেয়। অজস্র বাসনা নিয়ে মানুষ সংসারে বেঁচে থাকে। ভবিষ্যতে সুখের আশায় সে উৎসাহ নিয়ে কাজ করে। কিন্তু সবই অপূর্ণ থেকে যায়। মানুষ মারা যায় কেন? নিজের অক্ষমতার জন্যে, না, দৈব-ইচ্ছায়? কে জানে?

ধোবীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

গভীর রাত। খানিকটা দূরে শেয়ালের চীৎকার শুরু হয়েছে। ধোবী আরো অস্থির হয়ে উঠল। তার স্বামীর কাছে সে একদিন শুনেছিল— একজন আধমরা কাঙালকে একটা শেয়াল ধরেছিল। জীবন মরণ লড়াই শুরু হয়েছিল দুজনের। কাঙালের আর্তনাদ যে কত মর্মান্তিক— তার স্বামী সেদিন শুনেছিলেন। লোকে লাঠি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কাঙাল-টাকে বাঁচাতে পারে নি। সারা গায়ে তার ঘা হয়ে গিয়েছিল। মারাত্মক-ভাবে জখম হয়েছিল সে।

সনিয়ার কি সেই অবস্থা হবে? ধোবীর সহ্য হল না। না, আমি ওকে বাঁচাব, যে ক'রেই হোক ওকে বাঁচাব। সে মনস্থির করল। হয়তো এতে দুর্নাম হবে। বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। যা হবার তা হতে দাও। ভগবান আছেন। ওপর থেকে তিনি সবই দেখছেন।

ধোবীর চোখ পড়ে আকাশের দিকে। চাঁদের মুখ ঢেকে মেঘেরা নানারকম নক্সা তৈরি করছে। ধোবীর মনেও নানান ভাবনা। কিন্তু উজ্জ্বল চাঁদের মতো একটাই ভাবনা তার মনের আকাশে গেঁথে আছে: সনিয়ার-ও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। হ্যাঁ, সনিয়া বেঁচে থাকবে। নিশ্চয় বেঁচে থাকবে। সমাজের চোখে সে হোক্-না পতিত, কাঙাল কি অচ্ছুত— আত্মার দিব্য-চোখে সে হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব— মানুষ।

উঠে পড়ল ধোবী। তার নারীত্ব আরো দীপ্তি পেল। সে একজন

নারী। তার জন্ম হয়েছে সৃষ্টির জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়। সে জানে সে মাতা। জননী হওয়ার জন্য সে একজন পুরুষের সাহায্য নেয়। মাতৃরূপের জন্য প্রয়োজন শক্তির। কোমলতাই তার মহান শক্তি।

ধোবী আর দেরি করল না।

কাকা আর কাকীমা ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সামনের ঘর থেকে মায়ের বিড়বিড় করার আওয়াজ আসছে। ধোবী আলো জ্বালল। পুঁটলি থেকে কাপড় বের করল। একটা ভালো রেশমী পাট বেরল। কাপড়টা তার স্বামীর। তিনি আজ নেই। এই কাপড়ের পেছনে একটা কাহিনী লুকিয়ে আছে। কাঙালদের বাঁচাতে তিনি জীবন দিয়েছেন। তাঁরই শেষ স্মৃতি এই কাপড়! আজ যদি এক কাঙালের কাজে লাগে তো ভালোই হবে।

ধোবী রান্নাঘরে গেল। সে ভাবল, কাউকে সে জাগাবে না। নিজেই যা-কিছু করার, করবে। কেউ জানতে পারবে না। সে নিজেই ঐ কাঙালকে বাঁচাবে।

গভীর রাত আর হাড়-কাঁপা ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ধোবী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাঁয়ের সমস্ত লোক ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে. ভূত-প্রেতের ভয়ে দরজা খোলাও উচিত হবে না যখন ভাবছে, এমনি এক ভয়ংকর পরিবেশে ধোবী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের মেঠো রাস্তা ধরল। তার কাঁধে কাপড়ের পাট আর হাতে জলের ঘটি।

ধনী সঁাই বাড়ির আদরের মেয়ে ধোবী, একলা কখনো বেরয় না। সঙ্গে তার চাকর-বাকর থাকে। বন্ধুরা পাশে পাশে থাকে। কিন্তু আজ সে-ও একা। শীতের গভীর রাতে একজন কাঙালকে সেবা করার জন্য সে এগিয়ে চলেছে। সে জানে তার স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ তাকে পূর্ণ করতে হবে। প্রাণ যদি তাতে চলে যায়, যাক্।

মন্দিরের চাতালের কাছে ধুলোর ওপর পড়ে আছে সনিয়া। সেখানে গাছের আড়ালে চাঁদ লুকোচুরি খেলছে। শরীরটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হিম পড়ছে। পায়ের নীচের মাটি যেন বরফ। শরীর ঢাকা চলে না, এমন একটা ছেঁড়া-ফাটা কাপড় সনিয়ার গায়ে। পেটের মধ্যে গোঁ-গোঁ

শব্দ হচ্ছে। হয়তো দু-দিন থেকে কিছু খায় নি, এ অবস্থায় ঘুম কি আসে? হ্যাঁ, এখন শুধু মরণ-ঘুম আসতে পারে।

সনিয়া উঠে পড়ল। মধ্য রাত। নিস্তব্ধ। চারদিক দেখল। সবাই যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। যেন ইশারায় বলছে: ফিরে যা। আত্মীয়-পরিবার জ্ঞাতি— সব বন্ধন মিথ্যে। জন্মভূমির মায়া একটা নেশা। সম্পূর্ণ পৃথিবী যে তোর জন্মভূমি। সম্পূর্ণ ধরিত্রী তোর মা। সেটাই তোর দেশ যেখানে অন্যেরা তোর উপস্থিতিটুকু অনুভব করবে। তারাই আত্মীয় যারা তোকে ছেড়ে থাকতে পারে না। জাত-ধর্ম? সব ভাঁওতা ভাঁওতা।

সামনে গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির। কয়েক যুগের প্রাচীন মন্দির। সনিয়ার পূর্বপুরুষেরা গোপীনাথের পুজো করেছে। বারবার তাঁর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু কখনো পাথরের মূর্তি থেকে ভগবান দেখা দেন নি। লাখে লাখে মানুষ রাস্তার ধারে ছটফটিয়ে মারা গেছে। গোপীনাথ ঠাকুর, বা কোনো "ঠাকুর"-ই তাদের বাঁচাতে পারেন নি। তাহলে, কোন্ রোগের ওষুধ এই ধর্ম? কোন্ রোগের ওষুধ এই পুজো, প্রার্থনা! কত মন্দির— কত গোপীনাথ ভেঙেচুরে মাটিতে মিশে গেছে। কেউ তো বেঁচে উঠে নিজেকে রক্ষা করেন নি।

সব মিথ্যে, সব ভাঁওতা। মানুষের হাতে-গড়া দেবতা, মানুষকে কি করে বাঁচাবে? মানুষের বাঁচা-মরা তারই হাতে। যখন হেরে যায়, মরে। পৃথিবীতে দুটি মাত্র সত্য— জীবন ও মৃত্যু। খেতে সে-ই পারে, যার গায়ে জোড় আছে। শক্তিশালী মানুষ অন্যের থেকে কেড়ে খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। গায়ে জোর না থাকলে তাকে মরতে হবে।

সনিয়ার কোনো শক্তি নেই। ওকে মরতে হবে।

চারদিক থেকে মৃত্যু তাকে ঘিরে ফেলেছে। মৃত্যুর বাড়ি থেকে তার আমন্ত্রণ আসছে। বাঁচবার কোনোই উৎসাহ নেই। কোনো ইচ্ছে নেই। তার সব আশা ভেঙে গেছে। মা ভাই বোন— কেউই ফেরে নি। হয়তো তারা মারা গেছে। গাঁয়ের লোকে তাকে আর চায় না। ওদেরকে সে আপন পরিবারের লোক মনে করত। মানুষ নিজের জন্যে বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে পরের জন্যে— যারা তাকে ভালোবাসে, সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়।

সনিয়ার কেউ নেই। গাঁয়ের লোক তাকে চাইছে না। তার দিকে কেউ একটুও দরদের সঙ্গে তাকায় নি। তার সঙ্গে সবাই এমন ব্যবহার করল, যেন সে উপস্থিত নেই। যে গাঁয়ে তার জন্ম, আজ সেখানেই সে অপরিচিত। এই অবস্থায় সে কার জন্যে বেঁচে থাকবে? সামনে একটা বড়ো পুকুর। তার গভীর জলে গাঁয়ের বহু লোক তাদের দুঃখ-কষ্ট চিরদিনের জন্যে গোপন করেছে। তাই কি করবে সনিয়া? শরীরের কষ্ট সে আর সহ্য করতে পারছে না।

মন্দিরের সামনে একটা ভাঙা দরদালান। একটা কুকুর খস খস শব্দ করছে। ফর ফর শব্দে গাছ থেকে একটা বাদুড় উড়ে গেল। চাঁদের ওপর চলন্ত একটা মেঘ রূপ বদল করছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন সনিয়ার হাড় নুয়ে পড়ল। আকাশে তারাদের কানামাছি। এই পরিবেশ মৃত্যুর নয়, বরং জীবনের।

অনন্তকালব্যাপী এই পরিবেশ বর্তমান। সকলের মৃত্যু হয়েছে, সব-কিছুর অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর এই পরিবেশ— জীবনের এই শোভা বিরাজমান। গাছের পাতার মতো সনিয়াও মারা যাবে। কিন্তু গাছ মারা যাবে না। পৃথিবীর এত দ্রুত মৃত্যু হবে না, পরিবর্তন হবে না। জগৎ-চক্র ঘুরে চলবেই। সনিয়ার মতো লক্ষ-লক্ষ মানুষ বাঁচল কি মরল, পৃথিবী তার খবর নেবে না। সে চলবে তার আপন পথে।

জীবন-প্রদীপ নিভে আসছে সনিয়ার। প্রদীপের ক্ষীণ আলোটা ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার শক্তি নেই তার। সামনে পুকুর— জলে পূর্ণ। কিন্তু জল অবধি যাবে কি করে? উঠবার ক্ষমতা নেই।

সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে সনিয়ার শক্তিহীন মাথা। মাথা তুলল। দেখল পুকুরের পাড় ধরে কেউ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। ওটা কার ছায়া? কে? ধোবী!

মন্দিরের সামনের দরদালানে কুকুরগুলোর জায়গা। কিন্তু সমাজচ্যুত পতিত— অচ্ছুতের জন্যে নয়। গরুড়স্তম্ভের পেছনের চাতালটা ধোবী নিজের আঁচল দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করল। দুটো কুকুর শুয়েছিল। ভৌ ভৌ

করে পালাল। চাঁদের স্বচ্ছ আলো। ধোবী সনিয়ার হাত ধরে ওখানে বসিয়ে দিল। চলার ক্ষমতা নেই তার। ধোবী তার গা'টা মুছে পরিষ্কার করে দিল। সঙ্গে যেটা এনেছিল, সেই নতুন কাপড়টা পরিয়ে দিল। রেশমী পাট কাপড়ে তার গা ঢেকে দিল। আঙুল খেলিয়ে চুলগুলি ঠিক করে দিল।

সনিয়া ঠিক হয়ে বসল। ধোবী কৌটোটা খুলল। ধোবী নিজের হাতে সনিয়াকে খাওয়াল, মা যেমন বাচ্চাকে খাইয়ে দেয়।

এখনো কোনো কথা হয় নি। সনিয়ার কথা বলার ক্ষমতা নেই। ধোবীও কিছু বলছে না। সনিয়া যেন আত্মবিস্মৃত। ধোবীর দয়া ও সহানুভূতিতে কৃতজ্ঞ তার অন্তরাত্মা। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতে তার মুখে কোনো কথা এলো না। শুকনো চোখে জলের ফোঁটাও গড়াল না। সে শক্তিহীন, নিরাশ্রয়, সমাজে লাঞ্ছিত। তার আত্মা অনুভব করছে এক নতুন সজীবতা, এক নতুন উল্লাস। সে আবার শান্তিময় সংসারে ফিরে আসতে চায়, জীবনের প্রতীক্ষা করতে চায়। এক নতুন দৈব শক্তি সে অনুভব করছে তার শক্তিহীন দেহে। সেই শক্তি এক নারী।··· ধোবী! ধোবী!!

সনিয়ার নগ্ন দেহে হাত বোলাতে বোলাতে ধোবীর চোখ ভিজে আসে। মনে পড়ে যায়, ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা— ছেলেবেলার খেলা, যৌবনের বাসনা। আকালের করাল-গ্রাস থেকে সনিয়া পালিয়ে এসেছে। কিন্তু সমাজ তাকে ক্ষমা করে নি। সে আজ পতিত। সমাজ থেকে বিতাড়িত। কোথাও তার আশ্রয় জোটে নি। জুটবেও না। যে গাঁয়ে তার জন্ম, সেখানে আজ সে বিদেশী। যারা আপন ছিল, পর হয়ে গেছে। একমুঠো ভাত-ও জোটে নি তার। ক্ষিদের জ্বালায় তাকে গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

ধোবী শিউরে ওঠে।— না, না আমি ওকে মরতে দেব না। সনিয়ার বাবা বনেই পরিডা সামান্য ধানের বিনিময়ে তাঁর যাবতীয় জমি ধোবীর বাবাকে দিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন। শেষ সময়ে তিনি এসেছিলেন তাঁর তিন একর জমি বিক্রি করতে, ভিক্ষে করতে নয়। সনিয়া আজ পথের ভিখিরি নয়। কমপক্ষে তিন একর জমির মালিক। সেই জমিতেই বনেই পরিডা সোনা ফলাতেন।

পুরনো একটা দিনের কথা মনে করল ধোবী। রাত্তির বেলা। চিন্তেই স্বাঁইয়ের উঠোনে একটা ছোটোখাটো সভা বসেছে। চিন্তেই স্বাঁই, রাম প্রহরাজ, হরি মহান্তি, বাম ওঝা, বিশি জেনা আরো অনেক লোক উপস্থিত আছেন। চিন্তেই স্বাঁই বললেন— মহাদেব চকে বনেই পরিডার তিন একর জমি এখনো কাউকে বিক্রি করা হয় নি। পরিডা-বংশের সবাই তো মরেছে। কেউ বাড়ি ফেরে নি। জমিটা বিনা চাষে পড়ে থাকবে কেন? জমির পাশেই বিশি জেনা আর বাম ওঝার জমি। তুজনে মিলে ওখানে চাষ করুক। ফসলের অর্ধেক তুজনে নিক। বাকী অর্ধেক প্রহরাজের হাত দিয়ে ঠাকুরের সেবায় লাগবে। গ্রামে যখন যাত্রা হবে, তখন তার থেকে কিছু টাকা খরচ হবে।

সভার এই সিদ্ধান্তের সময় ধোবী উপস্থিত। সে সব শুনেছে। মানে, সনিয়ার ধান, ফসল সমস্ত প্রহরাজের বাড়িতে জমা আছে। তবুও সনিয়া কেন আজ অভুক্ত থাকবে— যখন তার ফসল রয়েছে, জায়গা রয়েছে? সে কেন ক্ষিদের জ্বালায় মারা যাবে?

ধোবী এই কথাগুলো সনিয়াকে বলল না। ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্তে আসার মতো অবস্থায় সে এখন নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু করার সাহস-ও তার নেই। সে দেখল, আগে সনিয়া বেঁচে উঠুক, সুস্থ হোক। তারপরে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ধীরে ধীরে খুব কোমল স্বরে ধোবী বলল— সনিয়াদাদা! একটু ঘুমোও, বিশ্রাম করো। সুস্থ হয়ে ওঠো। অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরেছ। গাঁয়ের কেউ-না-কেউ নিশ্চয় সহানুভূতি দেখাবে। সংসারে সুখ-তুঃখের ধারা বয়ে চলেছে। নিরাশ হ'লে মোটেই কাজ হবে না। তুমি বিশ্রাম করো।

বরফের মতো ঠাণ্ডা পাথরের চাতালে একটা ছেঁড়া কাপড় পেতে দিল ধোবী— সনিয়াকে শুইয়ে দিল। বলল— সনিয়াদাদা! সকালে ঘুম ভাঙলে মন্দির থেকে বেরিয়ে যেয়ো। তা না হ'লে লোকে অকারণে চেঁচামেচি করবে। হাজারটা প্রশ্ন করবে। তার থেকে চুপ করে থাকা ভালো।

কাঙালের মুখে কথা ফুটলো— ধোবী ! — তার হাত হাতে ধরে ধোবী উত্তর দিল— কি, সনিয়দাদা ?

—আমি মরতে চাই না, ধোবী !

মুচকি হাসল ধোবী। বলল— সনিয়াদাদা! কেউ মরতে চায় না। তবুও মানুষ ঠিকই মরে।

ধোবীর করতলে হাত কেঁপে ওঠে সনিয়ার। এক ঘণ্টা আগে সে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, এখন মৃত্যুর নামে সে চমকে উঠল কেন ? ধোবীর নরম হাতের স্পর্শ পেয়েছে তার শরীর তার জীবনে এসেছে নতুন আনন্দ— বাঁচার নতুন আশা মৃতপ্রায় কঙ্কালের হাড়ে নতুন জীবন শুরু হ'ল।

সনিয়া বলল— না-না, আমি মৃত্যুর অনেক রূপ দেখেছি। ভেবেছিলাম সময় হলে মৃত্যু আসবেই। কিন্তু ধোবী ! তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। আমার মনে বাঁচার নতুন আশা, শুধু তোমারি জন্যে জেগেছে।

ধোবীর সারা অঙ্গ কেঁপে ওঠে— ভয়ে লজ্জায়। কঙ্কাল-ও ভালোবাসতে পারে। তার অস্থিতে প্রেম ও উচ্ছলতার বিদ্যুৎ-ও রয়েছে। পতিত-অচ্ছুতের বাঁচার সুখ ও আনন্দেরও আশা থাকে !

ধোবী সনিয়ার হাত ছেড়ে দিল। বিদ্যুতের মতো তার মনে খেলে গেল সেই এক পুরনো চিন্তা। স্বর্গত শ্বশুর ও স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। এক মুমূর্ষু কঙ্কালকে বাঁচাতে মাঝ রাতে সে একলা ছুটে এসেছে— তার মুখ থেকে প্রেমের কথা শুনতে নয়।

কিন্তু··· সে আবার ভাবে— গাঁয়ের মেঠো রাস্তায় তো অনেক কঙ্কাল অনাহারে মারা গেছে। তাদের জন্যে ধোবী কাঁদে নি তো। দরদ দেখায় নি তো। স্বামীর মৃত্যুর পরে কেঁদে কেঁদে তার সময় কেটেছে। সেই সময়ে স্বর্গবাসী শ্বশুর ও স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার ইচ্ছে হয় নি কেন ? কিন্তু আজ, সনিয়া যখন কঙ্কালের চেহারায় গাঁয়ে ফিরে এল, তার মন বদলে গেল। কিন্তু কেন ? কেন ? কেন ?

ধোবীর চোখে জল এল। মনে মনে সে কাঁদছে। ভাবছে, সে খুব ভুল করেছে। অন্যায় করেছে। তার স্বামী স্বর্গে আছেন। তিনি নিশ্চয়

ধোবীর মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। তাঁর কাছ থেকে কী লুকিয়ে রাখবে? তাঁকে তো ঠকাতে পারবে না? সে জানে, মাঝরাতে একজন কাঙালকে সে দরদ দেখাতে আসে নি। এসেছে শুধু সনিয়ার জন্যে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুধু সনিয়ার জন্যে।

ধোবী উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে। নিজের চিন্তাই তার কাছে খারাপ লাগে। সংসারের চোখে তার হয়তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু নিজের চোখে? সেখান থেকে তো সে পালাতে পারবে না!

গভীর রাত; নিস্তব্ধ। ধোবী ফিরে চলেছে।

বাড়ির সামনে—

ধোবী দেখল, কার একটা ছায়া দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে আছে।

—ধোবী!!

গলাটা ধোবীর কাকা নিধি স্বাঁইয়ের। ধোবী উত্তর দিল— হ্যাঁ, কাকা!

—এত গভীর রাতে একলা বাইরে বেরোয় না, মা! তুই জানিস না, এই সময়ে দেব-দেবীরা আসা-যাওয়া করেন। চল্, বাড়ি চল্!

নিধি স্বাঁই ধোবীর হাত থেকে ঘটিটা আর কৌটোটা নিলেন। ধোবী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। মন্দিরের দরদালানে প্রতিদিন রাতে সনিয়া খেতে পায়। কিন্তু ধোবীর হাতের কোমল স্পর্শ পায় না। ধোবীর জন্যেই সে মৃত্যু-চিন্তা ছেড়ে আবার নতুন উৎসাহে বাঁচতে চেয়েছে। মাঝরাতে যে নিধি স্বাঁই নিজে এসে তাকে যত্ন করে খাওয়ান, এ কথা কেউ জানে না— তিনিও কাউকে বলেন নি।

গাঁয়ের লোকে লক্ষ্য করল, দিনের পর দিন সনিয়ার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে। পাঁজরার যে হাড়গুলো সহজে গোনা যেত, এখন মাংসের নীচে তা ঢাকা পড়েছে। সনিয়া কোথায় থাকে, কী খায়, কী কাজ করে— জানার কেউ চেষ্টা করে না। গাঁয়ের লোকজনের চোখে সনিয়া একটা

কাঙাল— নীচ জাতের সঙ্গে বসে খেয়ে যে নিজের জাত-ধর্ম খুইয়েছে। ওকে দেখলে লোকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তার ছায়া বাঁচিয়ে চলে।

সনিয়া নিজেও দূরে দূরে থাকে। সে ভেবে দেখেছে, আকালের মন্দ পরিণামে সে সমাজছাড়া হয়েছে। তার জন্যে কে দায়ী ? কাদের সে দোষী সাব্যস্ত করবে ?

ধীরে ধীরে সনিয়ার শক্তি ফিরে আসে। সে এখন মজুরী করে পেট চালাতে পারবে। নিধি স্বাঁইয়ের দয়ার এখন দরকার কি ? কোন্ কারণে সে বিষ্ণুপুর গাঁয়ে থাকবে ? যে গাঁয়ে তার বাবা বনেই পরিড়া মজুর দিয়ে চাষ-আবাদ করাতেন সেখানে সে নিজেই পরের জমিতে খাটবে ? অচ্ছুতের মতো বারান্দার নীচে বসে পরের দেওয়া ভাত খাবে ? না, তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। নদীর ওপারে দুর্গাপুর ও আরো অনেক-গুলো গ্রাম। সেখানে তাকে কেউ চেনে না। সেখানে মজুরী ক'রে পেট চালাবে।

তার মনের কথা নিধি স্বাঁইকে সে বলল— নিধি কাকা! ওই সব গাঁয়ে আমি একেবারে অচেনা। সামান্য পরিশ্রম করলেই ওখানে আমি পেট চালাতে পারব। কিন্তু নিজের গাঁয়ে আপনজনেদের সামনে— দাঁত বের করে কুকুরের মতো পড়ে থাকা, অচ্ছুতের মতো জীবন কাটানো উচিত মনে করি না। বিদেশেতে লজ্জাও থাকবে না।

নিধি স্বাঁই বুঝিয়ে বললেন - এ তোর ভুল ধারণা, সনিয়া। আচ্ছা, তোর নাহয় কেউ নেই। কিন্তু সাতপুরুষের ভিটের জমি তো পড়ে আছে। তুই চলে গেলে, গাঁ থেকে পরিড়া-বংশের নাম যে একেবারে মুছে যাবে। পৃথিবীতে চিরকাল সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না। সুখ আর দুঃখ অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকে। গাঁয়েই তুই পরিশ্রম ক'রে দু-পয়সা রোজগার কর্। পরে প্রায়শ্চিত্ত করে নিস। তারপর সব ঠিকমতোই চলবে।

—কিন্তু নিধি কাকা, আমি কোথায় থাকব ? বাড়ি তো নেই।

নিধি স্বাঁই কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু থেমে গেলেন। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, পরি দলাই আর রাম প্রহরাজ ওই রাস্তা দিয়েই আসছেন। তিনি বললেন— আরে, একটু সবুর কর্। সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিধি·স্বাঁই চলে গেলেন নিজের রাস্তায়।

সনিয়া বসে রইল পণ্ডিত প্রহরাজের অপেক্ষায়। ওঁরা কাছে আসতে নমস্কার করল। প্রহরাজ একটু হেসে মাথা নোয়ালেন। গলা ঝেড়ে বললেন— কি রে, বড়ো ফুলছিস যে ? কি ব্যাপার ? জানিস, পরি দলাই কি বলছে ?

পরি দলাই বলল— নিজে গিয়ে দেখে এসো না কেন ? আমার মা গিয়েছিল দুর্গাপুর গাঁয়ে চিঁড়ে বেচতে। ওখানে তোর বোন পুনীকে দেখেছে। মধু ভোই বাউরী, যে নিতেই নায়কের জমিতে ঠিকেয় কাজ করে— তার বাড়িতে আছে। ভালোই আছে। খবর নিচ্ছিল।

প্রহরাজ বললেন— সনিয়া, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করলেও জাতে ফিরতে পারবে না। ঘরের মেয়ে, পরিবারের ইজ্জত— একটা বাউরী ছেলের সঙ্গে রয়েছে ! এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে ? এক কাজ কর্, তুই এবার বাউরী হয়ে যা। যাই কিছু হোক, এক জাতে থাকা-ই ভালো।

প্রহরাজ আর দলাইয়ের কথাগুলো যেন তীরের ফলার মতো সনিয়াকে বিঁধল। তাঁরা চলে গেলেন : সনিয়া উঠে নদীর দিকে এগোল। বাঁধের পিপুল গাছের নীচে বসে অন্য গাঁয়ের দিকে তাকাল। সকালবেলা। চতুর্দিকে তরুণ সূর্যের কোমল আলো।

সনিয়ার মনে অনেক চিন্তা খেলে যায়। পরি দলাই মিথ্যে কথা বলে না। মিথ্যে কথা বলবেই বা কেন ? পুনী শেষটায় অচ্ছুত বাউরীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আর সবাই কোথায় গেল ? পুনী বেঁচে আছে— এ-কথা শুনে সনিয়া খুশি হ'ল না। পুনী বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই। সে বংশের মুখে কলঙ্ক লাগিয়েছে। পেটের তাগিদে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ কুকুরের খাবার কেড়ে খেয়েছে। রাস্তার ধারে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু অচ্ছুত বাউরীর ঘরে কেউ আশ্রয় নেয় নি।

ভালো করেছে, কি, মন্দ করেছে এ-কথা ভাবার অবস্থায় সে নেই। পুনী যা-ই করুক. একবার তাকে দেখার খুব ইচ্ছে হ'ল সনিয়ার। সে ভাবল, সে যাবে, নিজের চোখে তাকে দেখে আসবে। যদি সম্ভব হয়, পুনীকে বাউরীর ঘর থেকে বাঁচিয়ে নিজের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে।

পিপুল গাছের নীচ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। ক্ষেত পর্যন্ত। তারপরে নদীর পাড়, বালি, জলের স্রোত। গাঁয়ের লোকে ওখানে স্নান করে।

পৌষ মাস। সকালে বেশ ঠাণ্ডা; কুলথ আর মাষকলায়ের সবুজ ক্ষেত। মাইলের পর মাইল কে যেন সবুজ গালচে বিছিয়ে দিয়েছে। রোদ পোয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু কেউ এখনো বাঁধের ওপর আসে নি। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হচ্ছে। লোকের বড় দুরবস্থা। ম্যালেরিয়াতে কিছু লোকজনও মরছে। গাঁয়ের বৈদ্য যা ওষুধ দেয়, তাতে কিছু হয় না। কিন্তু লোকের মনে শান্তি এই যে, চিকিৎসা চলছে। শেষটায় ভগবানে ধর্না দেয়। "এখন ভগবান-ই ভরসা" বলে লোকে নিশ্চিন্ত।

বউল অমাবস্যা। আমগাছে নতুন মুকুল ধরেছে। কেউ কেউ তো বলে, স্বর্গে আম হয় না। দেব-দেবীরা আমের বোলের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এই ধরাধামে আসেন। এই উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে 'বউল' পুজো হয়। গাঁইঠা, মণ্ডা ইত্যাদি নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। সূর্য ওঠার আগে গাঁয়ের বউয়েরা নদীতে স্নান করতে যায়।

কয়েকজন বৌ নদী থেকে ফিরছে। সনিয়ার দিকে বাঁকা নজর হেনে তারা যে-যার পথ ধরল। সনিয়া সবাইকে চেনে। সবাই তাকে জানে। সে তো এই গাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু কেউ তার খবর নেয় না। ও যেন ওখানে নেই। সনিয়াও কাউকে ডাকে না। নিজের ভাবনায় সে মশগুল হয়ে থাকে।

নদীতে স্নান সেরে উঠে এল ধোবী।

তার সঙ্গে হাঁটছে বান ওঝার মেয়ে টিমি। হাসতে হাসতে দুই সখী বাঁধের ওপর এল। সবুজে-ভরা ক্ষেতের ওপর দুজনের শোভা খুবই সুন্দর। দুজনের হাসির ঢেউ ক্ষেতের নীরবতা ভেঙে দিয়ে চলেছে।

সনিয়ার সামনে একটা স্বপ্ন, যা সে সবসময় দেখে এসেছে। সে হ'ল ধোবী। যার জন্যে সে বেঁচে আছে, মনে বাঁচার মায়া জন্মেছে। ধোবীও এগোতে পারে না। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। টিমি তার হাত ধরে বলে— এসো না ধোবী দিদি! অচ্ছুত সনিয়া বাউরীকে কি দেখছ? তুমি শোন নি···?

টিমির মুখে হাত চাপা দিয়ে ধোবী বলল— চুপ কর্ না টিমি। আমি সব শুনেছি। বাউরীর বাড়িতে পুনী থাকলে সনিয়াদাদার কি দোষ? ও যদি পুনীর সঙ্গে আর না থাকে, যদি প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহলে আবার জাতে উঠবে।

সনিয়া মাথা তুলে ধোবীর দিকে তাকায়। নিধি স্বাঁইয়ের কাছ থেকে সে কিছু-কিছু জানতে পেরেছে, ধোবীর ওপর দিয়ে দুঃখদুর্দশার কি-যে ঝড় বয়ে গেছে! আজ ধোবীকে মনে হচ্ছে কুমারী। তার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। যে ধোবী বিদ্যুতের মতো চঞ্চল, যার চোখ সবসময় সজাগ, হাত বাড়ালেই যে খিলখিল ক'রে হেসে পালিয়ে যেত – আজ-সে ভরা-যৌবনের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। সকালের কুসুম-কুসুম রোদ তার ফর্সা মুখটা আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। সেদিনের মতো ও আজ জিভ বার করে মুখ ভেঙায় না। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো ও আজ আর চঞ্চল নয়।

ভেজা কাপড়ে ধোবী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ সনিয়ার মনে ছায়া ফেলেছে। তার চোখের জল এই কঙ্কালটার মনে বাঁচার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলেছে। মুমূর্ষু হয়েও তার হাড়ে এসেছে নতুন জোর। ধোবীর কোমল স্পর্শ, নম্র কথা সনিয়ার বেঁচে-থাকার পাথেয়। সে দাঁড়িয়ে আছে সনিয়ার সামনে।

কত উজ্জ্বল ধোবীর চোখ দুটো। ওই চোখে অশেষ গভীরতা, অপার করুণা। তার ভরা গাল আর লাল কুমুদ-পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। যৌবনের গর্বে উন্নত বুকের কাপড় তারই তালে তালে কাঁপছে।

ক্ষণিকের জন্যে সনিয়া আত্মবিস্মৃত হ'ল।

—সনিয়াদাদা, শরীর কেমন আছে?

—পরের দেওয়া ভাত খেয়ে বেঁচে আছি!

—পরের-দেওয়া ভাত? পরের হতে যাবে কেন? ও তো তোমার নিজের ভাত।

আরো কিছু হয়তো ধোবীর বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টিমির দিকে

চোখ পড়তেই সে থেমে গেল। তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল—সনিয়াদাদা! এখন তো স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। পরের মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকবে কেন? গায়ে-খেটে কি পেট চলে না? বাপ-ঠাকুর্দার আমলের জমি তো পড়ে আছে, যেখানে তোমাদের বাড়ি ছিল। কিছু বাঁশ-কাঠ দিয়ে একটা কুঁড়ে বানিয়ে নিচ্ছ না কেন? পরের বারান্দার নীচে কেন পড়ে আছ? নিজের বাড়িতে থাকটা কি ভালো হবে না?

—ঐ জমিটা যখন দেখি, দুঃখ হয়, ধোবী! ওদিকে পা বাড়ালেই মনে হয়, কে যেন আমাকে মারতে আসছে। ইচ্ছে করে, সব ছেড়ে-ছুড়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। যাদের নিয়ে ঘর-সংসার করেছি, আজ যে তারা কোথায়…।

টিমি এবার মুখ খুলল। বলল— তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার বোন একজন বাউরীকে বিয়ে ক'রে দুর্গাপুরে আছে। আস্তে আস্তে অন্য সবাইকার খবর-ও পেয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, টিমি!— সনিয়া উত্তর দিল। হয়তো অন্য খবরগুলোও পেয়ে যাব। যেমন তুই আমাকে ঠাট্টা করলি, অন্যরাও ঠাট্টা করবে— অপমান করবে। কাউকে আমি দোষ দিই না। কারোর ওপর আমার রাগ নেই। যাকে ভগবান শাস্তি দিয়েছেন, সে অন্যকে কি দোষ দেবে? চেনাপরিচিতের থেকে দূরে থাকাটাই তার পক্ষে ভালো।

ধোবী বলল— চেনা পরিচিতেরা ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু শেষে তারাই ভালোবাসবে। কোনো-না-কোনোদিন তাদের মন ঘুরে যাবে। সনিয়া দাদা, তুমি এই পাগলামি ছাড়ো। পরিডা বংশ নষ্ট হয়ে যাক, বোধ হয় ভগবান চান না। হয়তো তাই তুমি ফিরে এসেছ। গাঁয়ের মাটিকে এবার আঁকড়ে পড়ে থাকো। ভাগ্য খুলে যাবে। শুনবে তো আমার কথা!

সনিয়া হাসে। ধোবীর ফর্সা মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে— গাঁয়ের মাটিতে পড়ে থাকব? অচ্ছুত হয়ে? যাদেরকে আমি অচ্ছুত বলি, তারা আজ আমাকে অচ্ছুত বলবে। এ আমি কি করে সহ্য করব, ধোবী? এখান থেকে দূরে চলে গিয়ে, যদি অন্য কোনো গাঁয়ে

গিয়ে বলি— আমি 'পান' বা 'হাঁড়ি' কি অন্য কোনো জাতের অচ্ছুত— তাহলে হয়তো এত দুঃখ হবে না। যদি বাঁচতেই হয়, ও'ভাবেই বাঁচব।

ঘৃণায় ধোবীর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। টিমিকে সে বলে— টিমি! চল্, বাড়ি চল্! যার-যা মনে চায়, তাই করুক। আমাদের কি সম্পর্ক এতে? চল্…।

দুজনে চলে গেল। কেউ মুখ ফিরিয়েও দেখল না। কিন্তু সনিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ধোবীর দিকে, যতক্ষণ না সে হারিয়ে গেল বাঁধের আড়ালে।

দুর্গাপুর! নিতেই নায়কের এই বিশাল বাড়ি আজ শূন্য পড়ে আছে। জিতেই নায়ক, নিতেই নায়ক মারা যাবার পর চিন্তেই সাঁই এ-বাড়িতে তালা দিয়ে বিধবা মেয়ে ধোবীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। বাড়ির ধানের ওপর তদারক করতে বিষ্ণুপুর থেকে লোক এল। লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গাপুর থেকে বিষ্ণুপুরে গোরুর গাড়ি করে ধান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাঙালেরা হতাশ হয়ে পালিয়ে গেছে। যাদের ফেরার ক্ষমতা ছিল না, তারা রাস্তার ধারে পড়ে মারা গেছে।

যতদিন জিতেই নায়ক বেঁচে ছিলেন, কাউকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে দেন নি। লজ্জায় অনেকে চাইতে আসতে পারে নি। জিতেই নায়ক জানতেন। তিনি গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খবরাখবর নিতেন। তাদের চাইবার আগেই নিজে গিয়ে ধান-চাল এ-সব দিয়ে আসতেন। বলতেন— আগেই যদি এই কাজ করতেন, তাহলে এত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেত না। বড়ো দেরিতে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি মনে করতেন, পূর্বপুরুষের কল্যাণেই তিনি এত বড়ো সম্পত্তির মালিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্যদের কষ্ট দেবেন।

জিতেই নায়ক তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বৌ বাড়িতে এনেছেন। যেদিন থেকে ধোবী বৌ হয়ে বাড়িতে এসেছে, তাঁর উদারতা বেড়ে গেছে। এত কিছু দিয়েও তাঁর ভাণ্ডার শূন্য হয় নি। নায়ক-পরিবারের সর্বনাশ ঘটে গেল। দুর্গাপুর থেকে ধান চলে গেল

বিষ্ণুপুরে— লোকে তখন আপত্তি করেছিল। কিন্তু কেউ তাদের কথা শোনে নি। ফলে, দুর্গাপুরের কিছু ভালোমানুষও কাঙাল হয়ে গেল। আর-সব কাঙালদের সঙ্গে তারাও ভিক্ষের সারিতে দাঁড়াল। তহশীলদার হরি মহান্তি তো যমরাজের সমান। গলায় তুলসীর মালা। কপালে চন্দন-টিকা। মাথায় টিকিও রয়েছে। কিন্তু ধর্মাত্মা সাজার এ সব হ'ল ভড়ং। লোকে হাত জোড় ক'রে তাঁর কাছে কিছু চাইলে খুব মিষ্টি ক'রে বলেন— দেখো, ভাই, আমি হলাম গিয়ে একজন সামান্য চাকর। বিধবার নুন খাই। আমি কি করে ধান-চাল দেব ? তোমরা যাও, চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করো।

লোকে চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছে গিয়ে শুনেছে, নায়ক-পরিবারের যিনি লক্ষ্মী, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠছেন না। কার কাছে তারা আর্জি পেশ করবে ? নিরাশ হয়ে তারা ফিরে এসেছে।

হরি মহান্তি-ও 'সহানুভূতি' দেখিয়েছেন। কারো কারো জমি-বাড়ি ইত্যাদি বাঁধা রেখেছেন। কিংবা খুবই সস্তা দরে কিনে, লুকিয়ে-চুরিয়ে ধান-চাল দিয়েছেন। সাদা কাগজে সই বা আঙুলের ছাপ নিয়েছেন অনেকের। এইভাবে বিধবার সম্পত্তি ক্ষুধার্তদের দান করে পুণ্য অর্জন করেছেন।

ধোবী বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে খবর রাখে না। এ-ব্যাপারে সে কখনো কিছু ভাবেও না। হরি মহান্তি কাগজপত্র নিয়ে কখনো-সখনো আসেন। চিন্তেই স্বাঁই ডেকে পাঠান ধোবীকে। হরি মহান্তি কাগজের যেখানে সই করতে বলেন, ও সই করে দেয়। ও জানে সইটুকু করলেই জমিদারি চলে। চলুক-না-চলুক, তাতে ওর কি ? সম্পত্তি যদি থাকেও, কে ভোগ করবে ? সম্পত্তি তো বেওয়ারিশ হয়ে গেছে। তার নিজের প্রয়োজন ভর-পেট খাওয়া। ব্যস, তার থেকে বেশি নিয়ে সে কি করবে ? সম্পত্তি চুলোয় যাক ! যাঁরা সম্পত্তি করেছেন তাঁরা আজ কোথায় ? আজ যাঁরা গরীবের রক্ত শুষে ছলনা-বঞ্চনায় বিষয়-সম্পত্তি করেন, ভবিষ্যতে তাঁদের অবস্থা কি হবে ? কত অনিশ্চিত এই জগৎ !

এ-কথা ভেবেই ধোবীর হাসি পায়।

হরি মহান্তির ওপর চিন্তেই স্বাঁইয়ের অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ধারণা, হরি

মহান্তি খুবই বিশ্বাসী লোক। কাগজপত্র ঠিকঠাক রাখেন। তাঁর তৈরি দলিলপত্র উনি দ্বিতীয়বার যাচিয়ে দেখেন না। তিনি নিশ্চিন্তে আছেন। চিন্তেই স্বাঁই দুর্গাপুরে এলে এক-আধ দিন থেকে ফিরে যান। দেখেন, কাজকর্ম সব ঠিক নিয়মেই চলছে। চাকরবাকর, ঠিকে মজুর সবাই ঠিকমতো কাজ করছে! বাগানগুলোর ভালোই দেখাশোনা হচ্ছে। খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

কাজ বেড়ে-যাওয়াতে হরি মহান্তি তাঁর ভাগ্নে নদিয়াকে নিয়ে এসেছেন। পনেরো বছরের সুন্দর ছোকরা। জাল করার কাজে মামার থেকেও বেশি সেয়ানা। এখন সে ছাত্রের মতো যেন 'তালিম' নিচ্ছে। হরি মহান্তি তার ওপর সন্তুষ্ট। তাঁর বিশ্বাস, নদিয়া ভালোই উত্তরাধিকারী হবে।

যারা দুর্গাপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। অবশ্যই তারা আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছে। তবু গাঁয়ের মায়া তারা ছিঁড়তে পারে নি। হরি মহান্তিও এদিকে তাঁর মায়া-জাল ফেঁদে রেখেছেন। যারা কাঙাল হয়ে বাড়ি ফিরছে তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে বেঁচে-থাকার মতো সামান্য খাবার দিচ্ছেন। কিন্তু তার বদলে তাদের জমি মাটির দরে কিনছেন। প্রাণে বাঁচল কাঙাল। কিন্তু যখন উঠে দাঁড়াল, দেখল তার কিছুই নেই। না আছে চাষের জমি, না আছে থাকার বাড়ি। এত বড়ো জগতে নিজেকে যেন অসহায় মনে হ'ল।

কি আর করে? হরি মহান্তিকে যে জমি দিয়েছে তা আর ফেরত পেতে পারে না। আইন এত শক্ত যে, বেইমানাতে-হারানো-জমি আর ফিরে আসে না। লাঠির সাহায্যে কিছু করতে গেলে নিজের মাথাই ভাঙবে। কি আর করা?

অনেকে নিজের জমিতে হরি মহান্তির হয়ে মজুরী করে পেট চালাল। যাদের আত্মসম্মান ছিল, তারা গাঁয়ের ঠাকুরকে শেষ প্রণাম জানিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেল। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে চুকে গেল।

যারা রইল, তাদের শান্তি কোথায়? সনিয়ার মতো তারাও পতিত-অচ্ছুত হয়ে গেছে। জমিদারকে খাজনা দিতে হয় নি। কিন্তু খাজনাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মন বদলে যায় নি। ওঁরা যে এই দেহের প্রভু সেজে

স্বর্গ-নরকের সিঁড়ি দখলে রেখেছেন। ওঁদের কাছে ধর্মের চাবিকাঠি। ওঁরাই যুগের পর যুগ আত্মার মুক্তিতে নিয়ম তৈরি করেছেন।

অচ্ছুতেরা ব্রাহ্মণদের ঠাকুরকে পুজো করার অধিকার-ও পায় নি। তাদের সেই টাকা কোথায়, যা দিয়ে ব্রাহ্মণদের খাইয়ে-দাইয়ে, দক্ষিণা দিয়ে দেহকে শুদ্ধ করবে ? ভবিষ্যতে এই অধিকার ফিরে পাবার আশায় তারা রক্ত-জল করে খাটছে, পেট কেটে টাকা জমাচ্ছে।

ফিরে এসে কাঙালরা আবার জমির কাজে লেগে গেছে। হাল চাষ করে, মাটি চেলে ফসল ফলাচ্ছে। আগে নিজের জমিতে করত। এখন পরের জমিতে পরের সুখের জন্যে করছে। পয়সাওয়ালা লোকের কাছে মজুরেরা আপনটানেই চলে গেছে। ছোটো ঝর্ণা বড়ো নদীতে পড়ে যেমন একসঙ্গে আবার সমুদ্রের দিকেই ছোটে !

মজুর হোক, অচ্ছুত হোক— দেহের সৃজনী-ক্ষমতা হারায় নি। বরং বেড়েই গেছে। লোভ-ও বেড়েছে। ছন্নছাড়া সমাজে লাঞ্ছিত নারী-পুরুষ যেখানেই এক হোক, মিলনের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। ফলে, হাতে-গড়া পাথরের দেবতার ভয় কমে গেছে। শিক্ষা, নীতি, নিয়ম— সব পিছনে ফিরে গেছে। নিজের ইচ্ছেমতো মানুষ বাঁচতে শুরু করেছে। আধমরা সমাজ চীৎকার করেছে— ওরে, এ যে পতিত···অস্পৃশ্য···

পুনীর জীবনেও এই ঘটনাই ঘটেছে।

অনেক দুঃখ সয়েছে পুনী। আপনজনদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েও নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আকালে ভিক্ষে করে খিদে মিটিয়েছে। গাঁয়ের টানকে সে-ও উড়িয়ে দিতে পারে নি। বড়লোকের আশ্রিত হয়ে যে-কোনো উপায়ে সে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কখনো যৌবনের উচ্ছলতা দমিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে কোনো মানুষের ওপর সে ঢলে পড়েছে। কিন্তু আবার এগিয়ে গেছে। কোনো সঙ্গী তাকে বাঁধতে পারে নি। ক্ষণিকের আনন্দে গাঁয়ের বন্ধনকে সে ভোলে নি। পুনী ক্রমাগত এগিয়ে গেছে।

দুর্গাপুরে···

অনেক দূর থেকে সে এসেছে, নায়ক-পরিবারের লঙ্গরখানায় পেট

ভরাতে। দুর্গাপুরে পৌঁছে দেখে নায়ক নেই, লঙ্গরখানাও নেই। কাঙালেরা ফিরে গেছে। কিন্তু পুনী আর এগোতে পারে না। বিষ্ণুপুর যেতে প্রাণ চাইছে। তিন ক্রোশ দূরে বিষ্ণুপুর। সে ভেবেছে, বাড়ির অন্য সবাই হয়তো ফিরে এসেছে।

কিন্তু দুর্গাপুরে তার কলেরা হয়ে গেল। রাস্তার ধারে পড়ে রইল মৃত্যুর পথ চেয়ে।

সেদিন অল্প-অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধেবেলা জোরে নাবল। খালি গায়ে পুনী পড়ে আছে রাস্তার ধারে। তুমুলভাবে বৃষ্টি পড়েছে তার গায়ে। বমি হচ্ছে। খুব ক্ষীণ স্বরে সে বলছে— বড় তেষ্টা, জল···জল···

ঘটনাচক্রে ঐ রাস্তা দিয়ে মধু ভোই যাচ্ছিল। হরি মহান্তির একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল। মধু ভোই তাকে খুঁজে বের করেছে। তালপাতার ছাতা মাথায় সে যাচ্ছিল।

মধু পঁচিশ বছরে গাট্টাগোট্টা জোয়ান। চলতি কথায় লোকে বলে— মধু গোঁয়ার। চুরি করে দু-বার জেলে গেছে। অন্ধকার রাতে গাছে উঠে নারকোল চুরি করে খেয়েছে। নারকোলের শক্ত ছোবড়া দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে হাতে ভেঙে খেয়েছে।

গাঁয়ে কলেরা-বসন্ত হলে লোকে 'মা'কে শান্ত করতে চাইত। ভাগাড়ে গিয়ে হাঁড়িতে করে রেখে আসত খাবার আর মিষ্টি সরবৎ। মধু কিন্তু লুকিয়ে গিয়ে সেগুলো খেয়ে আসত। তারপর মুখ মুছে হরিবোল দিতে দিতে ফিরে আসত।

একদিন সে আমগাছের নীচে ঘুমোচ্ছিল। একটা বড়-সড় বাঁদর এসে তাকে চড় মারল। গজগজ করে মধুয়া উঠে বসল। কিন্তু ব্যাপারটা তার মনে রইল। একদিন সে বাঁধের ওপরে ঝোপের কাছে আস্তে আস্তে গেল। বাঁদরটাকে ধরল। বাঁদরটাকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে বার দশেক চুবিয়ে বলল— বল্ ব্যাটা বাঁদর! আর ও রকম করবি? বল্···বল্···বল্···।

মধুয়ার গায়ের জোর নিয়ে অনেক গল্প আছে। সে নাগিনী সাপের টুঁটি চেপে ধরেছে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বসেছে। বানের সময়ে

সহজে সাঁতার কেটে নদী পার হয়েছে। লোকে বলে, ও নাকি শ্মশানে গিয়ে ভূত ধরে। একবার পেত্নী ধরতে গিয়ে জ্যান্ত মেয়েমানুষ ধরে এনেছিল। সে ছিল গান্ধিয়া পালে বুড়ী পিসি— বোবা। রাত্তিরে পুকুরের দিকে গিয়েছিল সে।

মধুয়া পুনীর ডাক শুনে চমকে উঠল। গোরুটাকে ছেড়ে গাছের নীচে এল। সন্ধে হয়েছে কিন্তু অন্ধকার নাবে নি। মুহূর্তের জন্যে সে পুনীর মুখের দিকে তাকাল। অবশ হয়ে কাঁদছে।

মধুয়া কখনো ভেবেচিন্তে কাজ করে না। যা ইচ্ছে হয় তাই করে। ভালো-মন্দ বিচার করে না।

সাত বছর আগের কথা। মঙ্গল ঘোষ জাতে খণ্ডায়ত। বিকেই পৃষ্টির বাগানে বড়ো বড়ো কলা দেখে তার লোভ হ'ল। সে মধুয়াকে ডেকে বলল— যদি কলা খাওয়াস, তাহলে তোকে পেট ভরে খিচুড়ি খাওয়াব। মধু রাজী হ'ল আর কলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। তার ফলে তাকে পনেরো দিন জেলের হাওয়া খেতে হ'ল। কিন্তু ভর-পেট খিচুরি খাওয়া হ'ল না। মংলু মিথ্যে বলে কেটে পড়েছে।

জেল থেকে ফিরে মধুয়া একদিন মঙ্গল ঘোষকে ডাকল। অন্যদের সামনেই তার মাথায় লাঠির বাড়ি মারল। প্রতিফল ? আবার দু-মাস জেলের হাওয়া খাওয়া। মংলু যে শ'-সোয়া-শো টাকা খরচ ক'রে পাঁচজনকে জুটিয়েছিল।

পুনী আবার শব্দ করে— জল।

মধুয়া চারদিকে দেখল। জল আনবে কিসে ? একটু দূরে একটা মড়ার খুলি দেখতে পেল। খুলির ওপরের দিকটা একটু গভীর। সে দৌড়ে নদীতে ছুটল। খুলিতে করে জল এনে পুনীকে খাওয়াল প্রাণ ভরে পুনী জল খেলো। কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসল। চোখের চাওয়ায় মধুয়াকে জানাল তার কৃতজ্ঞতা। হয়তো কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারল না।

—বাড়ি কোথায় ? — মধুয়া জিজ্ঞেস করল।

—বিষ্ণুপুর।— পুনী উত্তর দিল।

—তোর তো কলেরা হয়েছে। এখানে এবার বসে থাক্। আপসে আপ বিষ্ণুর পুরীতে পৌঁছে যাবি।

মধুয়া চলে যাচ্ছিল। পুনী ওঠার চেষ্টা ক'রে আবার বসে পড়ল। বলল— রাতটুকু যদি কোথাও থাকতে পাই···

—রাতটুকু? — মধুয়া বলল— যার ঘরে রাতটুকু কাটাবি তাকে যে আবার সকালবেলা মড়া পরিষ্কার করতে হবে! তার বাড়ি থেকে এক-আধজনকে সঙ্গে নিয়েও যাবি তো, তাই না?

মধুয়া পুনীর দিকে একটু ভালো করে তাকাল। আরে! ভালোই তো? বাঁচবে কি? অবস্থা তো খুব একটা মন্দের দিকে নয়। জিতেই নায়ক বেঁচে থাকতে অনেক রোগী বাঁচিয়েছেন। হয়তো এর আয়ু এখনো আছে। মনে পড়ে গেল, জিতেই নায়ক ঠাকুমাকে যে-ওষুধটা দিয়েছিলেন, সেটা এখনো বাড়িতে পড়ে আছে। মদ-ও রয়েছে কেরোসিন তেলের বোতলে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দু-মাত্রা খাইয়ে দিলে হয়তো সেরে উঠবে। বাঁচলে নিজের রাস্তায় চলে যাবে। মরলে মরবে। কাল সকালে নাহয় মড়াটা টেনে নদীর বালিতে ফেলে দিয়ে আসব। হাজার হোক, শেয়ালগুলো তো খেতে পাবে··· ।

মনে পড়ল আবার 'আইরী গৌড়' বাজীকরদের ভেল্কি-খেলা। বাজীকর একটুকরো হাড় নিয়ে কালো ফুলে ছুঁইয়ে মুহূর্তের মধ্যে সাদা ফুল করে দেয়। ওই হাড়েতেই পুতুল নাচে, পাথর কথা বলে। জ্যান্ত মানুষ উবে যায়, এক টাকা থেকে এক ঝুড়ি টাকা হয়ে যায়। দেখতে দেখতে আমের আঁটি থেকে গাছ— গাছে ফল। কুমারী মেয়ের হাড়ে ফুঁ দিয়ে বাজীকর এইসব ভেল্কি দেখায়।

কুমারীর হাড় খুঁজে অনেক রাত জেগে কাটিয়েছে মধুয়া। ভাবল, এই মেয়েটা কুমারী হয়তো নয়। যদি হয়, তবে এক টুকরো হাড় নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কুমারীর হাড় কাছে থাকলে মধুয়া তো চন্দ্র-সূর্যকেও পাত্তা দেবে না। ফুঁ দিয়ে সবাইকে উড়িয়ে দেবে!

মধুয়া তার বলিষ্ঠ হাতে পুনীকে তুলে আনল বাড়িতে।

কিন্তু পুনী মরল না। সেরে উঠল। কুমারীর হাড় পাওয়ার স্বপ্ন

ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মধুয়ার। লোকেও জানল, সে রাস্তার ধার থেকে একটা মেয়েকে তুলে এনেছে। হরি মহান্তি তাকে ডেকে জানতে চাইলেন। সে বলে দিল সমস্ত-কিছু। হরি মহান্তি তাকে পরামর্শ দিলেন— ওকে চলে যেতে বল্! বাউরী-বস্তির লোকে আপত্তি করছে। তোকে বাউরী-জাত থেকে বের ক'রে দেবে।

সেই রাত্তিরেই মধুয়া পুনীকে বেশ কড়া ক'রে শুনিয়ে দিল— এই! বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! একটা তো ঘর। তুই কোথায় থাকবি আর আমি কোথায় থাকব? মরে গেলে একটা কাজ হত। তা যাকগে···।

পুনী একদৃষ্টে মধুয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, দেখ, আমি খণ্ডায়ত বাড়ির মেয়ে। অচ্ছুত বাউরীর বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছি। এখন কোথায় যাব? তোমার পায়ের নীচে আঁচল বিছিয়ে পড়ে থাকব!

মধুয়া খুব রেগে গেল। পুনীকে টেনে এক চড় মারল। বলল— পাজী! আমার বাড়িতে থেকে খাবার জন্যে কে বলেছিল? বেরিয়ে যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা!

পুনী কাঁপছে। বসে পড়ে। মাথা ঘুরছে তার।

কেরোসিনের কুপীটা জ্বলছে। উনুনের আগুন জ্বলজ্বল করছে। পুনীর তৈরি খাবার মাটির হাঁড়িতে রাখা আছে। হাঁড়ির পাশে জল-ভরা মটকা। দু এক পা আগে একটা বিছানা। পুরনো-কাপড়-দিয়ে-তৈরি একটা বালিশও আছে। পুনী তৈরি করেছে।

মধুয়া দেখল, এমন তো কখনো এ-বাড়িতে হয় নি। সারা ঘর ধুলোয় ভর্তি থাকত। ইঁদুর, বিছে, ব্যাঙ—এ-সব ঘুরে বেড়াত। মাঝরাতে বাড়ি ফিরে একটু পান্তা-ভাত খেয়ে ধুলোর ওপরই ঘুমিয়ে পড়ত। সকালে ঘুম থেকে উঠে, একটু আরো পান্তা খেয়ে কাজে বেরিয়ে যেত।

মধুয়া পাঁচ-ছ' দিন ধরে পুনীর সেবা করেছে। নিজের হাতে স্নান করিয়েছে, ওষুধ খাইয়েছে, পথ্য দিয়েছে। পুনী সেরে উঠল। তারপর সে করেছে মধুয়ার সেবা। মধুয়া খেয়ে-দেয়ে ঘুমোত। পুনী পা টিপে দিত। মধুয়া যখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, পুনী ঢলে পড়ত তার বুকের ওপর। তার প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে গভীর ঘুমে ডুবে যেত। মাঝরাতে

মধুয়া পাশ-ফেরার সময় মশা-মারার মতো সরিয়ে দিত পুনীকে। পুনী ভয়ে মধুয়ার পায়ের কাছে গিয়ে ঘুমোত।

সকালবেলা মধুয়া চলে যেত কাজে।

পুনী কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল! মধুয়া ঘাবড়ে গেল। সে ভেবে দেখল, তার চড় খেয়ে গোরু-বলদও পড়ে যায়। পুনী তো সামান্য মেয়ে। নিজের হাতের জোর মধুয়া জানে। পুনীকে সে হাত ধরে তুলে মিষ্টি করে বলে— যে জাতেরই তুই হোস্, লঙ্গরখানায় সকলের সঙ্গে খেয়েছিস্। আমার ঘরে তুই থাকলে লোকে আমাকে জাত থেকে বের করে দেবে। তাই, আমার কথা শোন্, এখান থেকে চলে যা। আমার মালিকও আমাকে এ-কথাই বলেছেন।

পুনীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। —খণ্ডায়ত জাতের মেয়ে আমি, এখনো আমার বিয়ে হয় নি। কোনো আশ্রয় নেই আমার। শ্মশানেই যেতে হত আমায়। তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি! আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না…।

মধুয়ার পায়ে পড়ে পুনী।

মধুয়া রেগে গিয়ে সরে দাঁড়ায়। পুনীকে হাত ধরে দাঁড় করায়। কুপী কেঁপে কেঁপে জ্বলছে, পুনীর ফর্সা গালে মধুয়ার চড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। তার খালি গায়ে যৌবনের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

পাথরের মনও গলে যায়।

কাঁপতে কাঁপতে মধুয়া জিজ্ঞেস করল— তাহলে যাবি না? সেদিনকার কথাটা ভেবে দেখ। যেমনভাবে এনেছিলাম, ওইভাবেই রেখে আসব —নেমকহারাম! বেইমান!

দুহাত ধরে পুনীকে টানে মধুয়া। সজোরে তার খালি গা ধরে বের করে দিতে যায়। গায়ে হাত লাগতেই মধুয়ার পা কাঁপতে থাকে, এক পায়ের ঠোক্কর লাগে কুপীটায়। বাতিটা নিবে যায়। মধুয়ার পাথর-কঠিন হৃদয়ও গলে যায়, দরজার বাইরে যেতে পারে না। বাইরে অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।

পুনীকে মধুয়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় নি।

সুখে চলছে তাদের ছোট্ট সংসার। নায়কের গোমস্তা হরি মহান্তির হুকুম মেনে মধুয়া কাজ করে। সন্ধেবেলায় ঘরে ফেরে। যা পায় পুনীর হাতে দিয়ে, মাটিতে শুয়ে পড়ে ক্লান্তিতে। পুনী সব জিনিস গুছিয়ে রাখে আর মধুয়ার সেবা করে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে শুতে দেয়। এঁটো বাসন তোলে। যা বাঁচে তাই খায় আর তারপর মধুয়ার পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। বাতি নিবিয়ে মধুয়ার বুকেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। দুটি শরীরের অপূর্ব সঙ্গমে ক্ষণিকের জন্য এই গরীবের কুটীরে স্বর্গসুখ নেবে আসে।

আত্মাই আত্মাকে চিনেছিল। প্রেম যে কি, দুজনেরই জানা ছিল না। কিন্তু দুজনেই অনুভব করল এই পৃথিবীতে একজনকে ছেড়ে অন্যজনের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। একজনকে ছেড়ে আরেকজন বেঁচে থাকতে পারে না। তাঁরা পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতায় দুজনেই অনুভব করেছে অপার আনন্দ, অনন্ত সুখ। দুজনেই রঙিন স্বপ্ন দেখেছে— তাদের ঘর-সংসারের, উন্নত ভবিষ্যতের।

সমাজ রুষ্ট চোখে মধুয়ার দিকে দেখল। গোঁয়ার মধুয়া উত্তর দিল— হ্যাঁ, আমি লঙ্গরখানায় খেয়েছি। আমার জাতধর্ম কিছু নেই। মেয়েদের ঠাট্টায় পুনীও জবাব দিল— আমি লঙ্গরখানায় খেয়েছি। আমার কোনো জাত নেই। তাতে কি হয়েছে?

পুনী তার অতীত জীবনের কথা কাউকে বলে নি। বাড়ির কাজ চুকিয়ে সে অন্য কাজ করে। নায়ক বাড়ির কাছারী-ঘর ধোয়া মোছা, গোয়াল পরিষ্কার করা, ময়লা তোলা। যা পায়, মধুয়ার হাতে দেয়। মধুয়া ওর দিকে এক মনে তাকিয়ে থেকেছে, ও হেসেছে। পুনীকে কোলে তুলে আদর করে মধুয়া বলেছে— দেখ্, তুই ভালো ঘরের মেয়ে। আমি থাকতে তুই কেন কাজ করবি?

পুনী তার কোলে ঢলে পড়ে বলেছে— আমি থাকতে তুমি কেন কাজে যাও?

—আমি কি বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?

—তাহলে আমি কেন বাড়িতে বসে থাকব?

দুজনে স্থির করল, একই সঙ্গে কাজে যাবে।

নতুন সংসারের মায়ায় দুটি হৃদয় হারিয়ে গেল। দিন কেটে যায়। তারা বুঝতেই পারে না, কত তাড়াতাড়ি সময় কেটে যাচ্ছে। একজন অন্যজনের জন্য জীবন সমর্পণ করতে রাজী। দুজনের পৃথিবী কত সুন্দর। জীবন-তরঙ্গের উচ্ছলতায় তারা দুজনে ডুবে গেছে আবার উঠেছে। অতীতের অন্ধকার কেটে গেছে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো।

একদিন—।

পরিয়ার মা দুর্গাপুরে এল চিঁড়ে বেচতে। পুনীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। পরিয়ার মা তাকে চিনতে পারল। পুনীও নিজেকে লুকোতে পারল না। বিগত দিনের সমস্ত ঘটনা তাকে বলল পুনী। দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। পরিয়ার মা-ও কাঁদল।

সনিয়ার করুণ কাহিনী শুনল পুনী। পরিয়ার মা তাকে সব বলল। পুনী ভাবল, পরিয়ার মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুর চলে যায়। কিন্তু আবার ভাবল, সনিয়া নাহয় কাঙাল হয়েছে, বাউরী অচ্ছুত তো হয় নি? বাউরীর হাতের রান্না তো খায় নি? তার দেহ এখনো পবিত্র। ঈশ্বর চাইলে, সনিয়া আবার বড়ো হবে। জাতে উঠবে। ঘর-সংসার করবে।

পুনী বাউরীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিষ্ণুপুরে গিয়ে এখন মুখ দেখাবে কি করে? পরিয়ার মা সান্ত্বনা দিয়ে বলল— কাঁদিস না, পুনী। ভাগ্যে যা আছে, তা তো ভুগতেই হবে। বাঁচার জন্য— পেটের তাগিদে মানুষকে অচ্ছুতের ঘরেও আশ্রয় নিতে হয়। এ কোনো নতুন কথা নয়।

পরিয়ার মা চলে গেল। পুনী মধুয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে, সে ভুল করেছে। ক্ষিদে মেটাতে অচ্ছুতের ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছে। থাক্ পড়ে মধুয়ার সংসার। ঘর খোলা রেখে ও পালাবে— দূরে কোথাও, যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। কলঙ্কিত জীবন গোপন করে নতুনভাবে ঘর-সংসার করবে। সেখানে এ-কথা তো কেউ বলবে না যে, ও বাউরী অচ্ছুতের বৌ!

অনুতাপ হচ্ছে পুনীর, মধু ভোইয়ের বাড়ি ফিরে যেতে মন চাইছে না। পুরনো দিনের কিছু কথাও আবার মনে পড়ছে। তার জন্যে মধুয়া কী না করেছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে মধুয়া তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পুনীর সেবা করেছে। জাত থেকে তাড়িয়ে দেবার শাসানি সত্বেও সে নির্ভয়ে পুনীকে আপন করে নিয়েছে।

তবে কি মধুয়াকে ছেড়ে পুনী চলে যাবে ?

মধুয়ার চওড়া বুকের মধ্যে মাথা রেখে শোওয়ার যে আনন্দ, সে আর কোথায় পাবে ? কোথায় পাবে মধুয়ার দু-হাতের মধ্যে হারিয়ে যাবার উত্তেজনা ? তার দু-ঠোঁটের মাঝখানে এক অদ্ভুত ধরনের মায়া আছে, যা পুনীকে পাগল ক'রে তোলে। মধুয়াকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে সে কিছুক্ষণ এই পৃথিবীটাকে ভুলে থাকে। সব-কিছু বিস্মৃত হয়ে পুনী চলে যাবে ?

অনেক মানুষ আকালের মুখে পড়েছে। রাস্তার ধারে পড়ে পড়ে বহুজন মারা গেছে। পুনী আর মধুয়াও তো মারা যেতে পারত। কে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে ? কে দুটি প্রাণকে বেঁধেছে মিলন-ডোরে ?

অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে পুনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে মধুয়ার ঘরে ফিরে এল।

সনিয়া বিষ্ণুপুরে তার নিজের জমি পরিষ্কার করে নিয়েছে। আম আর জংলী গাছের কাঠ দিয়ে ছোট-একটা বাড়ি তৈরি করেছে। কিন্তু ছাউনি কোত্থেকে আনবে ? গাঁয়ের লোকের কাছে ছাউনির খড় তো রয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে কি করতে যাবে? ওরা তো না বলে দেবেই।

সনিয়া জানে, নদীর পাড়ে 'তণ্ডী' নামের এক ধরনের ঘাস হয়, ছাউনির কাজে লাগে। কিন্তু সেই ঘাস এখন বড়ো হয় নি। মজবুত-ও হয় নি। কিন্তু বাড়ির কাছেই যে তালগাছ আছে, তার পাতা পুরুষ্টু হয়েছে। তাল-পাতা দিয়েই ছাউনি দেবে ভাবল।

কাটারী হাতে সে তালগাছের কাছে পৌঁছল। সময়টা সন্ধে। সূর্য ডোবে নি। চারদিকে হালকা আমেজ। আজ মকর সংক্রান্তি। আজ থেকে সূর্যদেবের উত্তরায়ণ শুরু। পৌষের শুক্ল পক্ষ। নবমী তিথি। আজ নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের ওখানে মকর-যাত্রার উৎসব। এখন থেকেই লোকেরা আসতে শুরু করেছে। কাছেপিঠের বহু লোক এসে জড়ো হয়

ওখানে। মন্দিরের উঠোনে মনিহারী আর মিষ্টির দোকান বসে। আস্তে আস্তে অনেক লোকজন আসবে। মহাদেবের পাণ্ডার রোজগার বাড়বে।

বছরের মধ্যে আজকের দিনটাই সবচেয়ে ছোটো। আজ থেকে দিন বড়ো হবে। রাত ছোটো হবে। হাড়-কাঁপানো শীত কমে আসবে। সূর্য ডোবার আগেই এখন শীত করছে।

বনেই পরিডার জমির লাগোয়া রাস্তা দিয়ে যারা মহাদেবের মন্দিরের দিকে যাচ্ছে, ঠক ঠক শব্দে একটু চমকে উঠেছে। চোখ তুলে দেখছে। সনিয়া এলোপাথাবি তাল-পাতা কাটছে। এই দেখে লোকে যে-যার রাস্তায় পা বাড়াচ্ছে।

ধোবী কিন্তু অন্যদের মতো নিজের রাস্তা ধরল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সনিয়ার দিকে। তালগাছের ওপর বসে আছে সনিয়া। পরনে একটা ছোটো কাপড়। গা পুরো খালি। কোনো জামা বা চাদর নেই। শক্ত ডালের নীচের পাতায় কাটারীর বাড়ি মারছে। শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক আর পাতা পড়ছে। এমনই হয় মানব-সমাজে যাকে অবলম্বন করে মানুষ ওপরে ওঠে, সে পড়ে থাকে নীচে, তারই ওপর আগে কাটারীর বা বসায় মানুষ। নীচের জন নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে। নির্বিবাদে পড়ে যায় নীচে।

সনিয়াও এই ধরনের মার খেয়েছে। রক্ত জল করে চিন্তেই স্বাঁই টাকা রোজগার করেছেন। সেই টাকার সামান্য দিয়ে তিনি বনেই পরিডার জমি-সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। এবার সনিয়া ফিরে এল। রক্ত-জল ক'রে সে-ও ধনীর রক্ত-ভাণ্ডার বাড়াতে সাহায্য করে চলল।

ধোবীর চোখ রয়েছে সনিয়ার দিকে। তালপাতার ওপর কাটারীর বাড়ি পড়ছে— ঠক ঠক।

সনিয়া কেন ঘর তৈরি করছে? সুখে থাকবে বলে? এখন রক্ত-জল-করা পরিশ্রম ক'রে ভবিষ্যতে পুঁজিপতি হবে? তারপর নীচের পাতা-গুলোয় ঘা মেরে পরের রক্ত চুষবে? বড়লোক হবে? কিন্তু কিসের জন্যে···? আবার যখন প্রচণ্ড ঝড় উঠবে, নীচে ঝরে পড়বে। পৃথিবীর চাকা আবার ঘুরে যাবে।

ধোবীর পা থমকে গেছে। সে চারিদিকে তাকায়। আশেপাশে কেউ

নেই। আস্তে আস্তে সামনে এগোল সে। তালগাছের কাছে এল। একটু পরে সে ডাকল— সনিয়াদাদা, নীচে নাবো না।

ধোবীকে নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সনিয়া অবাক হয়ে গেল। নেবে এসে ধোবীর সামনে দাঁড়াল। জোরে জোরে তার নিঃশ্বাস পড়ছে। সেই সঙ্গে পাঁজরার হাড়গুলো ওঠা-নাবা করছে। নাকের পাটা কাঁপছে। বোধহয় ক'দিন দাড়ি কাটে নি। সুন্দর মুখখানা দাড়িতে ভর্তি। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। তেলের অভাবে জট পড়েছে। সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। তাল-পাতার ধারালো কোণা লেগে গায়ের এখান-ওখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। গায়ে ধুলো মাটির অজস্র দাগ।

ধোবী জিজ্ঞেস করল— সনিয়াদাদা, আজ মকর সংক্রান্তি! নীল-কণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে মেলা বসছে। তুমি যাবে না? সারা বছর তো কাজে ব্যস্ত থাকবে। আজকের দিনের মতো কি কাজ বন্ধ রাখতে পার না?

কপালের ঘাম মুছে সনিয়া বলল— না ধোবী, অচ্ছুতের তো মন্দিরে যাওয়া বারণ। ঘরটা অর্ধেক হয়েছে। ভগবান এসে তো বাকীটা শেষ করে দেবেন না!

ধোবী বলল— ভগবান কিছুই করেন না। ভগবানের ইচ্ছেয় মানুষ করে। মানুষের কখনো ভালো হয়, কখনো মন্দ। ভগবানেরও তাই ইচ্ছে। যাই হোক, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। দেখো, তোমার নিজের ধানও আছে, খড়ও আছে। তবুও তুমি কেন এত উদ্বিগ্ন? বনেই পরিডা যেদিন বাবার কাছে তিন একর জমি বেচতে এলেন, বাবা কিনতে রাজী হলেন না। নিরাশ হয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিন একর জমি তো উধাও হয়ে যায় নি। এখনো পড়ে থাকার কথা। তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ না, আমার জমি কোথায়? কে নিয়েছে?

সনিয়া এক দৃষ্টে ধোবীর দিকে তাকিয়ে রইল। অত্যাচারী চিন্তেই স্বাঁইয়ের মেয়ে হয়েও, ধোবী এতটা কেন সহানুভূতি দেখাচ্ছে সনিয়াকে? পরের জন্যে তার এত ভালোবাসা! দেবীর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ফর্সা গায়ে লাল শাড়ীটা সত্যিই ভালো লাগছে। দু-হাতে শুধু দুটো

সোনার চুড়ি। এক হাতে প্রসাদের ছোটো বাসন। ধোবী হয়ে উঠেছে দেবতার পূজারিণী— সুন্দর, শান্ত, পবিত্র।

গাঁয়ের এত নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে থাকা মুশকিল। তবুও সনিয়া গ্রাম ছাড়ে নি কেন? শুধু ধোবীর কারণে সে বাঁধা পড়েছে।

সনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ধোবী।

সনিয়া তার কথার উত্তর দিতে পারে নি। একদৃষ্টে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ধোবী বলল — আরে, দেখছ কি? যাও, প্রহরাজের কাছ থেকে নিজের ধান চেয়ে নাও। যদি না দেন, তাহলে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করো। তারপর যা হয়, দেখা যাবে।

ধোবী সনিয়ার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, সনিয়া-দাদা! আজকাল কোথায় খাও তুমি— কি খাও?

সনিয়া হাসতে হাসতে বলল— যে মানুষ আকালের মুখ থেকে ফিরে এসেছে, তার খাওয়ার কোনো কষ্ট নেই। ক্ষেতে-বাগানে কি ঘাস নেই? জঙ্গলে কি কচুর মতো মূল নেই?

—আমি একটা জিনিস দিতে চাই। নেবে?

—কি? — আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে সনিয়া।

—ছোটোবেলার কথা ভাবো। তুমি গাছে উঠে আমাকে আম, পেয়ারা— আরো সব ফল খাওয়াতে? কতবার ভয়ংকর সব ঝোপে ঢুকে ফলসা, কুল এনে আমায় খাইয়েছ। একদিন তোমার পায়ে একটা সাপ জড়িয়ে গেল। তুমি সেটাকে নিমেষের মধ্যে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মনে আছে?

মহাদেব পুকুরে কুমুদ ফুল তুলতে গিয়ে তোমার পায়ে একটা জোঁক আটকে গিয়েছিল। মনে আছে?

—সব মনে আছে, ধোবী।

ধোবীর চোখে জল এসে গেল। বলল— ছোটোবেলার বন্ধুরা ভগবান জানেন, কোথায় আছে। ক্ষিদের জ্বালায় রাস্তার ধারে কিংবা গাছের তলায় পড়ে মরে গিয়ে থাকবে। তুমিই একা ফিরেছ, কিন্তু অস্পৃশ্য হয়ে।

আমার খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। তবুও আমি পরের ঘরে চলে গেলাম। আমারও জাত গেল। আমিও অচ্ছুত হলাম। সবাই বলে আমার অনেক সম্পত্তি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি তোমার থেকেও অনেক গরীব। আমি অসহায়। আশ্রয়হীন, একলা।

সনিয়া অবাক হয়ে যায়। এ কি বলছে ধোবী? কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধোবী কাঁদছে।

একটু পরে চোখের জল মুছে ধোবী বলল— তোমার কাছে আমি ঋণী, সনিয়াদাদা! এখন ঋণ মেটাবার সময় হয়েছে। তোমাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

ধোবী প্রসাদের পাত্রটা নাবিয়ে রাখল। কোমর থেকে একটা ছোট্ট পুঁটলি বের করল। সেটা হাতে দিয়ে সনিয়ার মুঠোটা চেপে বন্ধ ক'রে দিল। তারপর তার বন্ধ-মুঠি নিজের মুঠোয় ধরে বলল— সনিয়াদাদা, আমার জন্যেই তোমার আজ এই দুরবস্থা! বাবা যদি বিয়ের কথা না তুলতেন, তোমাকে কি মোটে গাঁ ছাড়তে হ'ত? জলের দরে তোমাদের জমি কিনে বাবা তোমাদের কাঙাল করেছেন। বাড়ির সবাইকে হারিয়ে তুমি একা বাড়ি ফিরেছ। সনিয়াদাদা, যা দিলাম, তা আমার— বাবার নয়। শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছি। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তুমি জাতে ফেরো, ঘর সংসার ক'রে সুখে থাকো, বংশের আবার উন্নতি হোক— এই আমার কামনা।

সনিয়ার হাত ছেড়ে দিল ধোবী। ফর্সা গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়াচ্ছে। খানিক থেমে সে আবার বলে— বাবার আক্রোশ থেকে মাধো রাউত আর কঁই-ও বাঁচে নি। ক্ষিদের তাগিদে ওরা-ও আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে গেল। ওদেরকেও গ্রাম ছাড়তে হ'ল। সকলের অভিশাপ আমার ওপর পড়েছে, সনিয়াদাদা। কিন্তু সে যাই হোক, আজ আমি চাই সবাই ফিরে আসুক। সুখে ঘর-সংসার করুক।

সনিয়া কিছু উত্তর দেবার আগেই ধোবী চলে যায় ওখান থেকে। প্রসাদের পাত্রটা ওখানেই পড়ে থাকে।

ধোবী হারিয়ে গেল ঝোপের ওপারে। সনিয়া হতবাক হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

যৌবনের অনেক স্বপ্ন মনে পড়ে গেল। মনের অন্তরালে হাজার কল্পনার ফোয়ারা খুলে গেল। কত রহস্যময়ী এই নারী! সত্যিই তার হাসি-কান্না সব সনিয়ার কল্পনারও বাইরে।

সনিয়া অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নির্বোধ শিশুর মতো এদিক-ওদিক তাকাল। খুঁজে ফিরল মহাশূন্যের সংকেত— অশরীরীর বাণী— এই রহস্য বুঝতে পারার জন্য। ও যে আসে ঝড়ের মতন, হাসে বিদ্যুতের মতন। সনিয়া চমকে উঠল। দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তবু ধোবীর রূপের চমকে নিমেষের জন্যে তার কেটে গেছে অন্তরের অন্ধকার।

সেই রাতে যখন সে নিরাশ্রয়, ধোবীই তাকে বাঁচিয়েছে মৃত্যুর মুখ থেকে। ধোবীর জন্যই সে বাঁচার উৎসাহ পেয়েছে মনে। তার গাঁ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্তে, ধোবীর প্রতিমা-ই সামনে এসে তাকে আটকেছিল। ধোবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে যেন সকালের কোমল আভা বেরিয়ে আসছিল। মুখে এক অপূর্ব সরলতা আর জ্যোৎস্নার হিমানী। সনিয়াকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিল।

সনিয়া পুঁটলিটা খুলে দেখল। পাঁচটা টাকা আর পঁচিশটা সোনার মোহর। ইচ্ছে হ'ল, দৌড়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। চিন্তেই স্বাঁই যা করেছেন, তার জন্যে তো ধোবী দায়ী নয়।

আবার ভাবল, তার দুর্ভাগ্যের জন্য চিন্তেই স্বাঁই-ই বা দায়ী হবেন কেন? যেদিন প্রহরাজ ঠাকুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, সেদিন বাবা তাঁকে অপমান করেছেন। তাঁর ছিল পরিডা-বংশের গৌরব নিয়ে দম্ভ। চিন্তেই স্বাঁই যখন সুযোগ পেলেন, সম্পত্তির ক্ষমতায় তাঁর প্রতিশোধ নিলেন। বনেই পরিডা জাত ও মর্যাদার অত্যন্ত গর্ব করেছেন। অন্যদের ছোটো চোখে দেখেছেন। চিন্তেই স্বাঁই-ও কিছু কম নন। তিনি নিজের সম্পত্তি-ক্ষমতা জানতেন। বনেই পরিডাকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি। ফলে অহংকারে অহংকারে দ্বন্দ্ব হল। দ্বন্দ্ব চলল। যাঁর যখন ক্ষমতা বাড়ল তিনি জিতলেন।

তাহলে চিন্তেই ঝাঁই বা ধোবীর দোষ কোথায়? দোষ হ'ল অহং-কারের। কারোর টাকার অহংকার, কারোর জাত, ধর্ম বা বুদ্ধির কিংবা জ্ঞানের অহংকার। কেউ ক্ষমতার বড়াই করে আর কেউ রূপের। প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু বিশিষ্টতা আছে। সেটুকু বাদ দিয়ে বাঁচা শক্ত। সংসারে বৈরাগী সন্ন্যাসীর গর্ব, দম্ভ, অহংকার নেই। এই ত্রুটি তার নেই। কিন্তু এই 'নাহিত্ব'টুকু তার বৈশিষ্ট্য।

কেন চিন্তেই ঝাঁইয়ের ওপর সে দোষ চাপিয়ে দেবে? পৃথিবীতে যদি কোনো ধর্ম না থাকত, জাত না থাকত—টাকার ওপর কারোর কোনো অধিকার না থাকত, তাহলে প্রত্যেকের বিশিষ্টতা সকলের কল্যাণে লাগত। কোনো জিনিসের ওপর কারোর যদি 'আমার' বলার অধিকার না থাকত —তাহলে বোধ হয় পৃথিবী থেকে সুখ ও দুঃখ চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যেত। তাহলে, অস্পৃশ্য বা গরীব হওয়ার কারণে সনিয়ার মাথা নীচু হত না। বিধবা হওয়ার দরুন ধোবীকে চোখের জল ফেলতে হত না। বড়োলোকের অত্যাচারে মানুষ মারা যেত না।

মানুষের সমাজ শান্ত জলরাশির মতো স্থির হয়ে গেলে সুখ-দুঃখের উত্থান-পতন হারিয়ে যাবে, জীবনের উৎসাহ-ও শেষ হয়ে যাবে। সবাই সকলের জন্যে বেঁচে থাকবে, কারোর একার জন্যে নয়। প্রতিটি জিনিস হবে সকলের, কিছুই কারোর একার নয়। সনেই আর এগোতে পারল না। স্বপ্নে দেখল, ধোবীর কথাগুলো দৈববাণীর মতো কানের কাছে গুঞ্জন ক'রে উঠছে। সে আবার জাতে ফিরে আসবে—ঘর-সংসার করবে—আবার পরিডা-বংশের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে।

সনিয়ার চোখের সামনে উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সোনালী বাসনার বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছে। যেন তার হৃদয় চীৎকার করে বলছে— প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সে জাতে ফিরবে, ঘর-সংসার ক'রে পরিডা-বংশের মর্যাদা বাড়াবে।

সনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে যোগ দিল। তার তৈরি কুঁড়ের সামনে একটা পাতার ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল। সেদিন ছিল মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ—পঞ্চমী তিথি। সরস্বতী পুজোর উৎসব।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এলেন। পণ্ডিত প্রহরাজের পরামর্শ মেনে প্রায়শ্চিত্ত

হ'ল। গাঁয়ের প্রত্যেক মন্দিরে ভোগ দেওয়া হ'ল। নানান ধরনের বাজনা বাজল। ব্রাহ্মণদের ভালো ক'রে খাওয়ানো হ'ল। চিন্তেই স্বাঁইয়ের হুকুমে নিধি স্বাঁই যাবতীয় কাজকর্মের তদারকী করলেন।

পাতার ছাউনির নীচে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হ'ল। নিধি স্বাঁই তাদের মধ্যে ছিলেন। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন বারবার হচ্ছিল— কাঙাল সনিয়া টাকা-পয়সা পেল কোত্থেকে ? যে যা বলছে, তাই করছে। উদার হাতে খরচ করছে। ব্রাহ্মণদের ভালো দক্ষিণাও দিয়েছে। ব্যাপারটা কি ? কেউ কেউ সনিয়াকে এ-কথা জিজ্ঞেসও করেছে। কিন্তু সনিয়ার একটাই উত্তর — নিজের পয়সা খরচ করেছি। কারোর টাকা চুরি করি নি।

কেউ কেউ বলল —সনিয়া তার জমি খুঁড়ে হঠাৎ কিছু গুপ্তধন পেয়ে গেছে। জমিতে সাত পুরুষের বাড়ি যে ছিল। সম্পত্তি পেয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

নিধি স্বাঁই বললেন যে, সনিয়া বেশি কিছু পায় নি। কিছু পুরনো সোনার মোহর পেয়েছে। সেগুলো বিক্রি করে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম— ভাই, মোহরগুলো কোত্থেকে এল। সে জবাব দিল—এগুলো আমার, আমি কারোর সম্পত্তি চুরি করি নি।

সনিয়া জাতে ও সমাজে অংশীদার হ'ল। সে আজ অত্যন্ত খুশি। এখন তাকে আর কেউ অচ্ছুত বলতে পারবে না। কেউ ঘৃণা করবে না — বলবেও না যে, আমাদের বাড়িতে সনিয়ার ঢোকা বারণ।

সে পেটের ক্ষিদে সহ্য করতে পারে নি। তাই অনেক অখাদ্য খেয়েছে। নিজের দেহ অপবিত্র করেছে। কিন্তু আজ তার গায়ে পঞ্চামৃতের জল পড়তেই অপবিত্রতার দাগগুলো মুছে গেল। আজ সে ঠাকুরের মন্দিরে যেতে পারে। জাতে-উঁচু লোকের বারান্দায় বসতে পারে। তার হাতে সবাই জল খেতে পারে। অচ্ছুতদের থেকে সে ভিন্ন হয়ে থাকবে।

সনিয়া সকলের বাড়ি গেল। যেন বহুদিন পরে কোনো প্রতিবেশী বিদেশ থেকে ফিরেছে। সবাই তাকে আদর জানাল। সনিয়া অত্যন্ত খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

পরী দলাই ওই পুঁথিটির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কত? পনেরো টাকা? জলে-কাদায় দিনরাত কাজ করে পরী দলাই সামান্য মাছ ধরে আর তাই বেচে পেট চালায়। পরের জমিতে চাষবাসও করে। ধান কুটে চিঁড়ে তৈরি করে। কিন্তু সব মিলিয়ে যে পয়সা পায়, তা যথেষ্ট নয়। এখন পনেরো টাকা পাবে কোত্থেকে? বড়োভাই যে ভালো রোজগার করত সে বসন্তে মারা গেছে। সংসারের সমস্ত বোঝা তার ওপর পড়েছে। এখন কি করবে? পনেরো টাকা তার কাছে বেশ মোটা রকম কিছু। প্রায়শ্চিত্ত না করে বেঁচে থাকাও শক্ত। জ্ঞাতিরা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। তার বাড়ির লোকের ছোঁওয়া জল অন্য বাড়ির লোকে খায় না। কেউ তাকে চিঁড়ে তৈরি করতে ধান দেয় না।

এবার বিনি কাণ্ডীর সঙ্গে কথা হ'ল। প্রহরাজ ঠাকুর বললেন, দড়ি-বাঁধা অবস্থায় যদি গোরু মারা যায়, তাহলে ভয়ংকর পাপ হয়। তোমাকে তো দাঁতে খড় নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে হবে। কারোর সঙ্গে কথা বলতে পাবে না। তাছাড়া নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হবে। খরচ কত হবে, এখন বলা সম্ভব নয়। আমি ভেবেচিন্তে একটা কাগজে লিখে রাখব। তুমি পরে নিয়ে নিয়ো।

সেবা বেহেরা বলল— আমার কি হবে, একটু বলে দিন।

প্রহরাজ বললেন— আরে, তোকে আর বলব কি? কি করে বোঝাই? অসুখ হোক, চাই দুর্বল হোক— কিন্তু বেড়াল বলে কথা। তোর বৌ লাঠি ছুঁড়েছে। তার ঘায়ে যদি বেড়াল মারা যায় তাহলে পাপ কার হবে? তোর বৌয়ের কি না? এক কাজ কর, বেড়ালটাকে নুন দিয়ে ওজন কর! বেড়ালের ওজনের সমান নুন ব্রাহ্মণকে দান কর। তোর ক্ষমতায় যা কুলোবে, ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দাইয়ে কিছু দিয়ে দিস। ব্যস, এই দিয়েই কাজটা চুকিয়ে নে।

প্রহরাজ এবার উঠে পড়লেন। বললেন— চিন্তেই স্বাঁইয়ের মেয়ে খোবী কাল একাদশী ব্রত করবে। সে ডেকেছে। প্রত্যেক একাদশীতে হোম হয়। পাঁচজন বামুন খায়। ভাগবত পাঠ হয়। অল্প বয়সে বিধবা হয়েও 'খণ্ডায়ত' বাড়ির এই মেয়ের যেমন নিষ্ঠা, এমন আমি কখনো

দেখি নি। আচ্ছা, তোমরা এখন আসতে পারো।

সকলে উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে সনিয়া আবার মুখ খুলল। বলল — ঠাকুরমশাই! এবার আমার কিছু কল্যাণ করুন! আমি খাব কি? কি করে বেঁচে থাকব? কিছু না হোক, আপনার থেকে সামান্য জমি দিন। ফসল হলে সুদ-সমেত ফিরিয়ে দেব।

প্রহরাজ ক্ষেপে গেলেন। বললেন — তোমার দিন চালানোর দায় কি আমার? চিন্তেই স্বাঁই হলেন গাঁয়ের কর্তাব্যক্তি। তাঁর কাছে আর্জি করো। তাঁর কিসের অভাব? ধান চাও, তাই দেবেন— জমি চাও, তাও দেবেন। ওঁকে খুশি করতে পারলে তোর দুঃখ ঘুচে যাবে। ওনার সামনে আমরা ছাগল-ভেড়া ছাড়া আর কিছু কি? আমাকে দিয়ে সুবিধে হবে না, বাপু!

প্রহরাজ ভেতরে চলে গেলেন। পরী, বিনি আর সেবা বেহেরাও চলে গেল। সনিয়া হতাশ হয়ে প্রহরাজের বাড়ির সামনে একটা নারকোল গাছের তলায় বসে পড়ল। সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পৌষের কৃষ্ণপক্ষ। দশমী তিথি। ঠাণ্ডা কমে এসেছে। তবু দুপুরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ে কাঁপুনি ধরে। ছায়াতে শীত করে, আবার রোদের তাত সহ্য হয় না। সনিয়া নারকোল গাছের নীচে বসে ভাবছে— এখন কি করি?

একটি মেয়ের হাসির শব্দে সনিয়া সচকিত হয়ে ওঠে। কে? প্রহরাজের ধান-গোলাটা নারকোল গাছটার থেকে একটু দূরে। গোলাটার পেছনে একটি সুন্দরী মেয়ে লুকোচ্ছে আর একটা ছোকরা তার পেছন পেছন আঁচল ধরে ছুটেছে। দুজনেই হাসছে। কিন্তু আঠারো বছরের ওই ছেলেটি এখনো সনিয়াকে দেখতে পায় নি।

মেয়েটি কে?

সনিয়া দেখল। প্রহরাজের নাতনী। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। নাম পার্বতী। আদর করে সবাই 'পারো' বলে ডাকে। ছেলেটা শিব ঘোষ। প্রহরাজের জমিতে ঠিকে কাজ করে। খণ্ডায়ত-জাতের অনাথ ছেলে।

পারো সনিয়াকে দেখে লজ্জা পায়। শিব ঘোষকে বিরক্তি দেখিয়ে বলল— আমার আঁচল ছাড়ো না!

সনিয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এল।

কখনো-কখনো ধোবীর ইচ্ছে হয়, সনিয়ার ওখানে গিয়ে তার নতুন বাড়ি দেখে আসে। তার সঙ্গে একটু কথা বলে। কিন্তু তার লজ্জা করে— ভয়ও হয়। মহাদেবের মন্দিরে যেতে সনিয়ার বাড়ি তার চোখে পড়ে। আড়-চোখে সেদিকে তাকাতে তাকাতে সে ফিরে আসে। বাড়ির সামনে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়। তবু সে তাড়াতাড়ি চলে আসে। মন চায়, সনিয়ার সঙ্গে দেখা হোক। কিন্তু ভয়ে সে এদিক-ওদিক তাকায়। সমস্ত পৃথিবী যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে সনিয়ার বাড়ি পেছনে থেকে যায়। ধোবী শেষবার তার বাড়ির ছাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ধোবীও এ কথা বুঝতে পারে না— গাঁ আর গাঁয়ের লোকজনকে ছেড়ে সনিয়া যখন চলে যেতে চাইল, তখন ধোবীর কথায় থেকে গেল কেন? ধোবীর জন্যে সে কেন তার সংকল্প ত্যাগ করল? ধোবীর অনুরোধে কেন সে সোনার মোহর নিল? সে বাড়ি তৈরি করেছে, প্রায়শ্চিত্ত করে স্বজাতে ফিরেছে ধোবীরই প্রেরণায়। এখন মজুরী করে পেট চালাচ্ছে। সে কেন এত কষ্ট সহ্য করেছে? পরিডা-বংশের নাম রাখতে সে কি বিয়েও করবে?

এই চিন্তা ধোবীকে কষ্ট দেয়। তার স্বর্গত স্বামী ও শ্বশুরের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁদের স্নেহ-মমতার কথা মনে পড়ে। খুব কষ্ট হয়। এ-কথা ভেবে তার নিজের ওপরই রাগ হয়। ঘেন্না হয়। ভাবে, কেন সে তার স্বামী-শ্বশুরের সঞ্চিত ধন রাস্তার ভিখিরি সনেই পরিডাকে দিল?

ধোবী তার ঘরে শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজোয়। পিঠে উঠে ছোটো ভাইবোনেরা লাফালাফি করে। শাড়ী ধরে টানে। ধোবী নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। কাকীমা এসে কখনো কখনো কটাক্ষ করে। বাচ্চাদের টেনে নিয়ে যায়। ধোবী সেইভাবেই পড়ে থাকে।

ঠাকুমা এসে কখনো কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

কখনো বাবা এসে বলেন— ধোবী! তহশীলদার হরি মহান্তি কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছেন। আমি দেখে নিয়েছি। তুই যা, গিয়ে সই করে দে।

ধোবীর মন বলে, চুলোয় যাক সব কাগজপত্র। তবু সে ওঠে। চোখ মুছে বাইরের ঘরে যায়। মহান্তি যেখানে বলেন, সেখানে সই করে। মহান্তি সবই বুঝিয়ে দেন। কিন্তু ধোবীর মাথায় কিছু ঢোকে না। ধোবী কাজ শেষ করে ঘরে চলে আসে।

মা বলেন, কিছু খেয়ে নে, ধোবী!

চোখে জল নিয়ে ধোবী বলে— আজ যে সোমবার। আমার উপোস। —একা ফিরে আসে ঘরে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পড়ে। ঠাকুমা পাশে বসে শোনেন।

কখনো সোমবার, তো কখনো একাদশী— কখনো ব্রত বা কখনো পার্বণ। ধোবীর বেশ কিছু সময় এমনি উপবাসে কেটে যায়। প্রহরাজ এসে পুরাণ শুনিয়ে যান। একটা শুভদিন দেখে হোম হয়। ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়। লোকে বলে, ধোবী ধন্য। অল্প বয়সেই এত নিষ্ঠা। ধোবী যে বাইরের কাপড় ফিরে এসে বদলায়— এ-কথাও তারা বলে। অচ্ছুতের ছায়া মাড়ালে সে স্নান না করে থাকে না।

চিন্তেই সাঁই খুশি হন। তাঁর মেয়ে সমাজের নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে চলে, লোকে তার প্রশংসা করে— সত্যিই এটা তাঁর গর্বের কথা। প্রহরাজ শাস্ত্র পাঠ করে শোনান। বলেন, শুধু ধোবীর ধর্মভাব ও সদাচারের ফলেই তার সাত পুরুষ নিশ্চিত স্বর্গবাস করবে।

আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিধি সাঁই ধোবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ধোবী মাথা নীচু করে বসে থাকে। মা চোখের জল ফেলেন। তপস্বিনী তুল্য মেয়েকে বুকে টেনে কাঁদেন, সঙ্গে ধোবীও কাঁদে। নিজের রক্তে মাংসে যাকে জন্ম দিয়েছেন, তার মনের ব্যথা তিনি বুঝতে পারেন না।

দুপুরবেলা। বৈঠকখানার ঘরে বসে হরি মহান্তির কাগজপত্র যাচিয়ে দেখছেন চিন্তেই সাঁই। নিধি সাঁই মহাজনী কারবারের খাতাপত্র দেখছেন।

হঠাৎ ধোবী এল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। পিঠে ছড়ানো এলো চুল। চোখে বৈরাগ্য। হরি মহান্তি উঠে দাঁড়ালেন।

চিন্তেই স্বাঁই নিজের মেয়ের দিকে তাকালেন। মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন— কি ব্যাপার, মা?

নিধি স্বাঁই খাতাপত্র থেকে চোখ তুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ধোবীর দিকে।

ধোবীর ঠোঁট কেঁপে উঠল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে গেল। চিন্তেই স্বাঁই যেন তার মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন— বসো।

ধোবী বসল। হরি মহান্তি একটু দূরে বসে তাঁর কোবালাপত্রের গল্প শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন— যবে থেকে আমি নায়ক মশাই-য়ের সম্পত্তি দেখাশোনা করছি 325 একর জমি নীলামে কিনেছি। 1100 'ভরণ' ধান কর্জ দেওয়া হয়েছে। 900 'ভরণ' ধান সুদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। 128 'ভরণ' ধান বিক্রি হয়েছে আর টাকাও জমা পড়ে গেছে।

মহান্তি একটু দম নিলেন। তারপর ধোবীর দিকে তাকালেন। ধোবী এক মনে খাতাপত্র দেখছে। মহান্তি আরো খাতা বের করে তাকে বোঝা-বার চেষ্টা করলেন। বললেন, যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, তাদের 180 একর জমি কেনা হয়েছে। যারা ফিরে এসেছে, তাদের শুদ্ধিকর্ম এসব করার জন্যে টাকার দরকার। তাদের জমি বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ধান আর কিছু টাকা দিয়ে 219 একর জমি তাদের থেকে কেনা হয়েছে। এখন, আগে যারা মালিক ছিল, পাট্টা হিসেবে তাদেরকে ওই জমি দেওয়া হল।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— এদের মতো লোকের থেকে জমি নেওয়া তো আবার শক্ত হবে।

—না, মশাই!— মহান্তি বুঝিয়ে দিলেন, প্রত্যেক বছর প্রজাদের পালটানো হলে, পরে তারা জমির ওপর কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না।

চিন্তেই স্বাঁই খুশি হয়ে বললেন— সাবাস, মহান্তি মশাই ! বড়ো সমঝে-বুঝে কাজ করেছেন। কিন্তু সব বোঝানোর পরেও নিধিয়ার মাথায় কিছু ঢোকে না। বলদের মতো খাটে, খাতাপত্রও ভালোভাবে দেখে, তবু সাবধানে কাজে লাগাতে পারে না। ধোবীর সম্পত্তি যদি সে দেখাশোনা করত, তাহলে এখানকারটা তদারক আমি করতাম।

বড়ো ভাইয়ের কটূক্তি নিধি মন্দ অর্থে নেন না। ছোটোবেলা থেকেই তিনি দাদার গালিগালাজ আর স্নেহ-মমতায় বড়ো হয়েছেন। দাদার হুকুম ছাড়া তিনি আর কিছু বোঝেন না।

তবু আজ নিধি স্বাঁই ধোবীর কথা ভাবছেন। হঠাৎ আজকে ধোবী খাতাপত্র দেখতে এল কেন ? দুদিন ধরে সে উন্মনা। কারোর সঙ্গে কথা বলে নি। যেখানেই বসেছে, চুপ ক'রে থেকেছে। খাওয়া-দাওয়ার নাম পর্যন্ত করে নি। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে তার।

এখনো নিধি স্বাঁই ধোবীর চোখে জল দেখতে পেলেন। বুকে যেন তার ঘা মারছে কেউ। কিন্তু দাদার সামনে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছেন না। তাকে সান্ত্বনা দিতেও পারছেন না। ধোবীর মনের কথা তাঁর জানতে পারাও শক্ত।

হরি মহান্তি খাতাপত্র গুছিয়ে আবার বললেন— আপনি মধুয়ার কথা শোনেন নি। বনেই পরিডার মেয়ে পুনীকে নিয়ে ঘর করছে। সেদিন থেকেই অচ্ছুত বাউরীরা ক্ষেপে গেছে। মধুয়া জাতগুষ্টির লোকেদের খাওয়াচ্ছেও না, পুনীকেও ত্যাগ করছে না। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি, শাসিয়েছি। কিন্তু মানে, তবে তো ! কালকে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস দেখুন, বলে কি— যতক্ষণ হাত আছে, ভাত নিশ্চয় জুটবে। আপনার শাসানিকে কেন ভয় করব ?

চিন্তেই স্বাঁই হাসতে লাগলেন। বললেন— ঠিক আছে, অচ্ছুতের বাড়িতে মেয়েটা থাকুক। লোকে দেখুক যে, বনেই পরিডার মেয়ে অচ্ছুত বাউরীর বাড়িতে আছে। আপনার মনে আছে তো, সেইদিন বনেই পরিডা কি বলেছিল ? বাউরী বস্তির লোকদের বুঝিয়ে বলুন, ওরা যেন মধুয়া আর পুনীকে বস্তিতে থাকতে দেয়। যারা সেদিন হেসেছিল, আজ

তারা চোখ খুলে দেখুক।

চিন্তেই স্বাঁই চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হেসে আবার বললেন —বনেই পরিডার ছেলেকেও দেখুন। সনিয়া কিছু গুপ্তধন পেল। প্রায়শ্চিত্ত করল, বাড়ি তৈরি করল, পরের কাছে মজুরী করছে। তবু এত দম্ভ যে, আমার বাড়ি এল না। যদিও জমির ব্যাপারে প্রহরাজের বাড়িতে গিয়েছিল।

চিন্তেই স্বাঁই প্রহরাজের কাছে শোনো কথাগুলো সব জানালেন। হেসে হেসে বললেন— গিয়েছিল জমিদারের কাছে নালিশ করতে। কিন্তু জমিদার কি করবে? আইন মেনে কাজ হয়েছে। নীলামে সনিয়ার জমি নিয়ে দেবত্র করে দিয়েছি। জমিদার তো খাজনা নেবার মালিক।

ধোবীর ঠোঁট কেঁপে উঠল। সে তার মনের কথা বলতে এসেও বলতে পারল না। চোখে তার আগুন জ্বলছে যেন। নাকের পাটা যেন ফুলে উঠেছে। কথা বলার সাহস হল না। বাবা-কাকার সামনে বসে আলোচনা ভালো লাগল না। কাউকে কিছু না বলে সে উঠে চলে এল।

দুর্গাপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে নিমপুর। সনিয়া অনেকবার গেছে, কিন্তু জমিদার শিব ছোটরায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। ছোটরাজ জাতে ক্ষত্রিয়। সকালে বহুক্ষণ বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। স্নান ও জলখাবার সারতে সারতে বেলা দুপুর হয়ে যায়। তারপর পাশা খেলেন। খেলা শেষ হতে বিকেল। রাত্তিরে সিদ্ধি গোলা হয়। জমিদার সাহেব সিদ্ধি খেয়ে মৌতাত করেন। মাঝরাতে খাবার খেয়ে ঘুমোন।

প্রজাদের অভিযোগ শোনার সময় কোথায় জমিদার সাহেবের? গোবিন্দ প্রধান দুর্গাপুরের তহশীলদার। সনিয়া তাঁর কাছেই নিবেদন করল।

গোবিন্দ সব শুনলেন। বললেন— সবই ভাগ্যের ফের, সনিয়া! কপালে যা আছে, বদলানো যায় না। চিন্তেই স্বাঁই আইন মেনে কাজ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো চালবাজী করা যাবে না। —গোবিন্দ প্রধান তারপর উপদেশ দিয়ে বললেন, সনিয়া যেন গিয়ে তাঁর পায়ে

ধরে। বললেন— তুই ওঁর কাছে চলে যা। ওঁর কোন্ জিনিসের অভাব ? তাঁর দয়া হলে অবস্থা আবার ফিরে যাবে।

গোবিন্দ প্রধান সনিয়ার স্বজাতি। তাঁর জন্যে সনিয়া বেগুন-কলা ইত্যাদি অনেক নিয়ে গিয়েছিল। সে আশা করে নি, তিনি এমন উপদেশ দেবেন। সে ভেবে দেখল চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছেই যাবে। পায়ে ধরে পাঁচ একর জমি চাইবে। অনেকে তাঁর জমিতে চাষ করে সংসার চালায়। চিন্তেই স্বাঁইয়ের দয়া হ'লে তার কোনো অসুবিধে থাকবে না। অভিমান ক'রে লোকসানই হয়, লাভ হয় না। রাজা হরিশ্চন্দ্র তো আবার শ্মশান পাহারাও দিয়েছেন।

সন্ধেবেলা সনিয়া বাড়ি ফেরে। আবার তহশীলদার গোবিন্দ প্রধানের কথা ভাবে। মনের ইচ্ছে, চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়ি যায়। কিন্তু পা এগোতে চায় না। কেনই বা যাবে ? এ না-হয় ভাবা গেল. সামান্য জমি নিয়ে সে চাষবাস করবে, কিন্তু তাতে হ'লটা কি ? ক্ষেত-মজুর মজুরই থেকে যাবে। মালিক তো হবে না! এমন এক মজুরের সঙ্গে চিন্তেই স্বাঁই কি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন ? ধোবীও এগিয়ে আসবে না একজন মজুরের হাত ধরতে।

তাহলে ? কেন সে বাড়ি তৈরি করল ? কেন স্বজাতে শরিক হ'ল ? সে কেন চাষবাস করবে ? ঘাম ঝরিয়ে কেন টাকা রোজগার করবে ?

ধোবী যেদিন তার হাতে সোনার মোহর তুলে দিল, সেদিন থেকে আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছে। মহাদেবের ওপর তার কোনো ভক্তি নেই। তা সত্ত্বেও বার বার মহাদেব-মন্দিরে গিয়েছে। ভগবানের কৃপায় যদি দেখা হয়ে যায়। বাঁধের ওপরও সে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু তার সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। আর কাউকে সে ধোবীর কথা বলে নি।

কী আছে ধোবীর মনে ? তার মনের কথা বোঝা অসম্ভব। হ্যাঁ, ধোবী তাকে ভালোবাসে— সে ভাবে।—কিন্তু তাতে লাভ কি ? কিন্তু চিন্তেই স্বাঁইয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধোবী কি কিছু করতে পারবে ?

সনিয়া কিছুই স্থির করতে পারে না।

সন্ধে হয়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশে শ্রীপঞ্চমীর ঝলমলে চাঁদ। সনিয়া সেই দিকে তাকিয়ে আছে। তার খুব দুঃখ হ'ল। বাড়ির পেছনের দরজা খুলে কে যেন গেল। সনিয়া উঠে দাঁড়াল। আগন্তুক জিজ্ঞেস করল—কে, সনিয়া?

গলা শুনে সনিয়া চিনতে পারল। প্রণাম জানিয়ে সে বলল— কি ব্যাপারে, প্রহরাজ মশাই?

প্রহরাজ হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। বললেন— ওরে সনেই! যজমানের বাড়ি বামুন-পুরুত তো যখন খুশি আসতে পারে। যজমানের কল্যাণ-কামনাই তো পুরোহিতের কাজ।

সনিয়া একখানি নারকোল পাতার চাটাই বিছিয়ে দিল। প্রহরাজ বসলেন। সনিয়া থামের এক ধারে দাঁড়িয়ে রইল। এখনো সে বুঝতে পারে নি যে, প্রহরাজ কেন এসেছেন।

—ওরে সনিয়া! তুই তো চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়িতে গেলি না। আমি কিন্তু তোর হয়ে প্রস্তাব দিয়েছি। স্বাঁইমশাই খুবই দয়ালু। তোর ওপর খুবই মায়া দেখালেন। উনি বললেন, বনেই পরিডা সুখে শান্তিতে বেশ সংসার করল। তাঁর ভাগ্য মন্দ। তাই সংসারের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, সবাইকে তো এই গাঁয়ে থাকতে হবে। সনিয়ার তো বলদও নেই! কেনার টাকাও নেই। জমি পেলেও সে একলা লোক। চাষ করবে কি করে? পরের কথা হল, প্রত্যেক দিন অন্যের কাছে মজুরী করতে যাচ্ছে কেন? কিছুদিন যদি আমার বাড়িতে ঠিকে মজুর হিসেবে কাজ করে তাহলে তার সব সমস্যা মিটে যাবে। খাওয়া-পরা তো পাবেই। কিছু পয়সাও পাবে। তারপর ভবিষ্যতে বলদ কিনতে পারবে।

প্রহরাজ সব কথা বললেন। তারপর চুপ ক'রে বসে রইলেন।

সনিয়া ভাবল, চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়িতে মজুর হয়ে সে থাকবে কেন? অন্যের কাছে মজুরী করে তো তার পেট খালি থাকবে না! অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চিন্তেই স্বাঁই দরিদ্রের অনেক জমি আত্মসাৎ করেছেন। তবু এমন একজন মানুষের মজুর হয়ে সে কাজ করবে? পৃথিবীর সামনে এ-কথাই বলবে, সে চিন্তেই স্বাঁইয়ের মজুর?

প্রহরাজ যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। উনি বললেন— বাবা সনিয়া! বিপদের দিনে ভাবনাচিন্তায় এতটা সময় দিতে নেই। আমার কথা শোন, স্বাঁইমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর। নিজের মনের কথা বল। ওঁর সঙ্গে কথা হবার পর, যা ইচ্ছে হয়, কর। ডুবন্ত মানুষের কাছে তৃণ-ও আশ্রয়। তোর অবস্থা-ও ঐ-রকম বাবা। ভগবান চাইলে, তোর দুঃখও দূর হবে।

প্রহরাজ চলে গেলেন। দরজা বন্ধ ক'রে সনিয়া ঘরে ফিরে এসেছে। এখনো সে ভাবছে— প্রহরাজের তার এখানে আসার কারণ কী ছিল?

পরের দিন দুপুর—

সনিয়া চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছারী ঘরে এল। স্বাঁইমশাই খাতাপত্র দেখছেন। চশমা পরে হরি মহাস্তি কিছু বোঝাচ্ছেন। একটু দূরে বসে নিধি স্বাঁই-ও হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত।

সনিয়াকে দেখে চিন্তেই স্বাঁই মাথা তুলে তাকালেন। নিধি স্বাঁইও তাকে দেখলেন। কপালে চশমা তুলে হরি মহান্তিও আড়চোখে তাকালেন তার দিকে।

সনেই মাথা নীচু করে প্রণাম করল। চিন্তেই স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন— কি ব্যাপার সনিয়া? কি ব্যাপারে? আচ্ছা, আচ্ছা, বোসো!

চিন্তেই স্বাঁই আবার খাতাপত্রে ব্যস্ত হলেন। সনিয়া একপাশে বসল। তার আশা, স্বাঁইমশাই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। তার আসার উদ্দেশ্য-ও জানতে চাইবেন। কিন্তু তিনি খাতাপত্র থেকে মাথা পর্যন্ত তুললেন না। মহান্তি জমা-খরচের হিসেব বোঝাচ্ছেন।

এক ঘণ্টা কেটে গেল।

খাতাপত্র এক ধারে করে স্বাঁইমশাই তাঁর ছোটভাইকে বললেন— নিধি! ধোবীকে ডেকে আন। আয়-ব্যয়ের হিসেব বোঝাতে মহান্তি অনেক দিন রইলেন। ধোবীকে এবার সই করতে হবে। তাড়াতাড়ি ওকে ডাক।

নিধি স্বাঁই ভেতরে চলে গেলেন।

সনিয়া শিহরিত হল। ধোবী আসছে। অনেক দিন পরে ধোবীকে দেখার সুযোগ হবে। কিন্তু তার উপস্থিতিতে সে কি চিন্তেই স্বাঁইকে মনের কথা বলতে পারবে? তার আসার আগে কথা বলে নেওয়া উচিত।

সনিয়া বলল— আমি আপনার কাছে এসেছি··· ।

স্বাঁইমশাই বললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী বলতে চাও, বলো। প্রহরাজের কাছে তো আমি সব-কিছু শুনেছি। তাঁকে দিয়ে তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। সব বলেছেন তো?

সনিয়া বলল— হ্যাঁ, বলেছেন। সেই ব্যাপারেই আমি কিছু বলতে চাই।

চিন্তেই বললেন— ভালোই তো! আমার বাড়িতে একজন ঠিকে মজুর দরকার। তুই থাকতে চাইলে, কিছুদিন থেকে যা। আরো পাঁচজন আছে। তুই-ও থাক্। হাতে কিছু পয়সা হলে বলদ কিনে নিস। তখন আমি দু-চার একর জমি দিয়ে দেব। এখন তো তুই বলদ কিনতে পারছিস না! অন্যদের সঙ্গে তুইও মজুরী নিবি। আমার চোখে সবাই সমান। যে খাটবে, সে খাবে। এতে তোর মত আছে তো?

হয়তো সনিয়া মত দিত। এত লোকের পরামর্শ হয়তো মেনে নিত। কিন্তু ওই সময়ে ধীরে ধীরে ধোবী এল। তার পেছনে নিধি স্বাঁই। ধোবী!

কি হয়ে গেছে ধোবী? তার প্রিয় ধোবী, যাকে দেখার জন্যে সে কত উতলা হয়েছে। কিন্তু তাকে সামনে পেয়ে সনিয়া খুব দুঃখ পেল। শুকিয়ে-যাওয়া একটা ফুলের মতো ধোবী রুগ্ণ-দুর্বল হয়ে গেছে। চোখে চাঞ্চল্য নেই, দীপ্তি নেই। এলোমেলো চুল। সনিয়া মনে মনে হাহাকার করতে লাগল।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছ থেকে একটু দূরে বসেছে ধোবী। সেখান থেকে শুধু একবার সনিয়ার দিকে তাকিয়েছে। সেই দৃষ্টিতে যেন যুগ-যুগান্তের বেদনা ভরা। নিমেষের জন্যে সনিয়ার চোখও ধোবীর চোখে এক হয়েছিল। সনিয়া চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ধোবীও নীচের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সনিয়াকে বিদায় দেবার আগে চিন্তেই স্বাঁই বললেন— দু-বার খাওয়া

আর সামান্য বেতনে যদি আমার বাড়িতে মজুরী করতে চাও, তাহলে কাল থেকে এসো। এতে যদি তোমার মত না থাকে, তাহলে অন্য রাস্তা দেখো। আমার বাড়িতে ভাত থাকতে হাতের অভাব হবে না।

সনিয়া ধৈর্যচ্যুত হ'ল। রাগে ঘৃণায় তার নাকের পাটা ফুলে উঠল। সে উত্তর দিল হাত থাকলে ভাতের-ও অভাব হবে না। এ-কথা সত্যি যে, আপনার টাকা আছে, কিন্তু আমি ভিক্ষে চাইতে আসি নি।

চিন্তেই স্বাঁই খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মহান্তি-ও হাসতে লাগলেন। অবাক হয়ে নিধি সনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধোবীও শিউরে উঠল। মুখ ফিরিয়ে সে সনিয়ার আরক্ত চোখের দিকে তাকাল। সত্যিই সনিয়া অত্যন্ত রেগে গেছে।

চিন্তেই স্বাঁইও ঠাট্টা করে বললেন— সাবাস। পরিডার বাচ্চা। তোর হাতে যদি এতই জোর ছিল, তাহলে তোর বাবা ছেলেপুলে নিয়ে লঙ্গর-খানায় খেল কেন অচ্ছুতদের সঙ্গে? গাঁ ছেড়ে পালাল কেন? যারা পালিয়েছে, সকলের শক্ত হাত-পা ছিল। তবুও একমুঠো ভাত তাদের জোটে নি। তাদেরকে একেবারে শুয়ে পড়তে হয়েছে শ্মশানে।

চিন্তেই আবার বললেন— হাত-পায়ের জোর নিয়ে পরিডা-বংশের সবাই তো বেরল। কিন্তু কেউ ফিরল? একলা ফিরলি তুই, আধমরা হয়ে। কিন্তু মাঝরাতে আমারই ভাত লুকিয়ে খাইয়ে নিধি তোকে বাঁচিয়েছে। আমি সব জানি। নিধি ভয়ে আমার কাছে লুকিয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি, কার পেটে কি আছে? ওটা ছিল ভাতের ভেল্কি, হাতের নয়! স্বর্গের দেবতারাও নেবে এসে ভাতের চারদিকে পিঁপড়ের মতো লেগে থাকেন। নিধি খাইয়ে বাঁচিয়েছে। তোর দুর্বল হাত-পায়ে জোর ফিরিয়েছে, শুনে আমি খুশি হয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, ভালো ব্যাপার, পরিডা-বংশ যেন লোপ না পায়। কমপক্ষে একজন তো বেঁচে থাকুক। তবু তুই আজ আমার সামনে হাতের বড়াই করছিস্। সাবাস, পরিডার বাচ্চা!

নিধি স্বাঁই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি যে চিন্তেই স্বাঁইয়ের দিকে তাকাতে পারছেন না। কি ক'রে জেনে গেলেন উনি? ধোবীও উদ্‌বিগ্ন হ'ল। বাবা সব জানেন!

রাগে আগুন হয়ে সনিয়া জ্বলছে। সে ভাবল, একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দেয় চিন্তেই স্বাঁইয়ের মাথায়। চোখের সামনে হাতের ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ফলে কি হবে? পুলিস, আইন আর জেল— সবই তো 'ভাতে'র জোরে চলে। সনিয়ার হাতের শক্তি এ-অঞ্চলে একবারই হৈচৈ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তারপর সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। সনিয়া সমাজের অতলে নেবে যাবে, যেমন কাদাতে পা নীচে নেবে যায়।

সনিয়ার মাথা নীচু হয়ে গেল। সে ভাবল, হয়তো চিন্তেই স্বাঁই ঠিক কথা বলছেন। তা না হলে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কি ক'রে মাটিতে মিশে গেল?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সনিয়া আবার বলল— সামান্য ধানের বিনি-ময়ে আপনি আমাদের দশ একর জমি নিয়ে নিয়েছেন। বাবা, ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা ঘাম ফেলে খেটে দশ একর জমিতে সোনা ফলাতেন। প্রাণ বাঁচাতে বাবা সেই জমি আপনাকে দেন। তবু কারোর প্রাণ বাঁচল না। আমি ফিরে এসেছি একা। আপনি জমি ফিরিয়ে দিন, স্বাঁইমশাই।

চিন্তেই স্বাঁই আবার হাসলেন— ওরে সনিয়া! জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য কেনা হয় না। আমার যা জমি দেখছে, সবই খেটে তৈরি। প্রথমে যারা জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে জমি তৈরি করেছিল— বাঘ, ভাল্লুক ও আরো সব জানোয়ারদের হামলায় তাদের অনেকের প্রাণ গেছে। রক্ত জল ক'রে তারা পরিশ্রম করেছে। কিন্তু আজ তারা বা তাদের নাতিপুতিরা জমির মালিক নেই। তারা সবাই মরে গেছে। তাদের নাতিপুতিরাও ক্ষিদের জ্বালায় মারা গেছে। যারা টাকা-পয়সা দিয়ে জমি কিনেছিল, আজ সেই লোকেরাই জমির মালিক।

একটু থেমে চিন্তেই স্বাঁই বললেন— ওরে সনিয়া! জমি যদি ফেরত চাস, তাহলে পয়সা ফেল্! আর যদি পয়সা না থাকে, তবে বাপ-ঠাকুর্দার মতো সঞ্চয় কর। এই পুরুষে না হলেও পরের পুরুষে হয়তো জমি হবে।

সনিয়া বলল— আপনি তো পয়সা দিয়ে জমি কেনেন নি। যতটা ধান দিয়েছিলেন, ততটা ধান আর তার সুদ দিয়ে দেব। আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চাই না। আমার জমি আমাকে ফেরত দিন।

সনিয়ার কথাটা চিন্তেই স্বাঁই ঠাট্টা মনে করলেন। বললেন— সনিয়া পাগল নয়, বোকা। ভাই, ধান আমি ধার দিই নি। ধানের বিনিময়ে জমি কিনেছি। তোমার বাবা দস্তাবেজ করে দিয়েছে। জমিদারকে খাজনা দিচ্ছি আমি। জমির দখলদার আমি। তোমার ওতে কোনো অধিকার নেই। জমির ধারে-কাছে তুমি যেতে পার না।

চোখে জল এসে গেল সনিয়ার— সাত পুরুষের অশ্রুজল। সে অস্থির-ভাবে হাত দুটি জোড় ক'রে মাথায় ঠেকাল। বলল— আপনি ঠিকই বলেছেন। জমির মালিক আপনি, আমি নই। কিন্তু ভগবানের নামে একটু বিচার করুন, জমির মালিক কে ? ঠিক আছে, জমি আপনার থাক্ ! আমাকে চাষ-আবাদ করতে দিন। আপনার ভাগের ধান আপনাকে দেব।

সনিয়ার চোখে জল আর জোড়-হাত অবস্থা দেখে ধোবীর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগল। তার ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে সনিয়ার হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু তার পরে কি হবে ? সে ভাবতেই পারে না, পরে কি হবে। সে বুঝল, সনিয়ার দারিদ্র্য ও অসহায়তা তার সামনে প্রমাণ করার জন্যেই বাবা তাকে এখানে ডেকেছেন। তার সামনে সনিয়াকে অপমান করাই বাবার ইচ্ছে।

ধোবী তার বাবার নির্দয় মুখটা লক্ষ্য করল। তাঁর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। চোখে যেন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। তাঁর কোনো মায়া-মমতা নেই। তবু নিজেকে সামলাতে পারে না ধোবী। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল— বাবা ! সনিয়াদাদা গরীব। ওর কোনো আশ্রয় নেই। ওর কথা একটু শুনুন। আপনার দয়া ওর ভীষণ প্রয়োজন— ওর জমি ফিরিয়ে দিন। তা না হলে, ওর জমিতে ওকে চাষ করতে দিন। ও যে ভিখিরি হয়ে গেছে, বাবা।

কথাগুলো বলে ধোবী চুপ করে যায়। চিন্তেই স্বাঁইয়ের মুখ রাগে লাল। একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে রইলেন ধোবীর দিকে।

ধোবী মাথা নীচু ক'রে নিল।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ, সনিয়া গরীব, তার কোনো আশ্রয় নেই— এ' আমি ভালো ক'রে জানি। তার দুঃখে আমার মনেও আঘাত

লেগেছে। তবুও আমার সম্পত্তি গরীবকে দান করে আমি ভিখিরি হতে পারি না। সব দুঃখী, গরীব আমার চোখে সমান। আমার মনে অন্যদের জন্যে যতটা মায়া-মমতা, সনিয়ার জন্যেও ততটা।

চিন্তেই স্বাঁই ধোবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন — মা আমার কারো কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ওরে সনিয়া, তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের বাড়ি কাল আসিস। এটা কি তোর বাড়ি নয়? বাড়ির কাজকর্ম কি ঘরের লোকে করে না? বাড়ির কাজ করবি। খাবি-দাবি আর বাপ-ঠাকুর্দার জমিতে ধান-মুগ এ-সব ফলাবি। আমি কি বারণ করব? তোর কোনো অসুবিধে হবে। যে মজুরী নেয়, তাকে মজুর বা চাকর বলে। যে কিছু নেয় না, সে তো বাড়ির ছেলে।

হরি মহান্তি বললেন— স্বাঁইমশাই কিছু মন্দ বলেন নি, সনিয়া!

সনিয়া হাসে। লাঠিটা নিয়ে উঠে বলে— স্বাঁইমশায় দয়ালু। মন্দ কথা বলবেন কেন? আমার মতো 'বাড়ির ছেলে' তাঁর অনেক জুটবে। তাঁর মতো দয়াবান বাবাও এই পৃথিবীতে আমি অনেক পাব।

সনিয়া আর ফিরে তাকাল না। সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। সবাই নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে গেছে। হালকা রোদ পড়েছে গাছের ওপর।

কাউকে কিছু না বলে বাড়ির ভেতরে যাচ্ছিল ধোবী। কিন্তু হঠাৎ দরজার চৌকাঠে তার মাথা ঠুকে গেল। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। হৈ-চৈ শুনে সনিয়াও ফিরে এল।

ধোবী অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরল। কিন্তু যাকে দেখার জন্য সে অস্থির হ'ল, তাকে দেখতে পেল না। সনিয়া চলে গেছে। পালঙ্কের ওপর পড়ে রইল ধোবী। তার চারদিকে বসে বাবা মা আর কাকা।

কবিরাজ এলেন। বললেন-- কোনো ভয় নেই। মনটা দুর্বল, তাই মাথা ঘুরছে। এই বড়িটা আদার রস আর মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দিন।

ধোবী পাশ ফিরে শুল।

আটদিন পর—

ধোবীর মাথার ঘা সেরে গেছে কিন্তু তার মনের ব্যথা যেমনকার তেমনি আছে। কেউ জানে না তার মনের যন্ত্রণা। সারা রাত তার বিছানার পাশে বসে থেকেছেন মা। গায়ে হাত লাগতেই চমকে উঠেছে। প্রচণ্ড জ্বর। মা চোখের জল ফেলেছেন। বলেছেন— ধোবী, তোর মনে কি হচ্ছে আমায় বল্ না? কী অবস্থা হয়ে গেছে তোর?

ধোবী বিড় বিড় ক'রে বলেছে— কিছু নয় মা! ওপার থেকে ডাক এসেছে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমায় বড় ভালোবাসতেন, মা! বেশি ভালোবাসার ফলেই ওঁদের প্রাণ বাঁচল না। একদিনের জন্যও তাঁদের সেবায় লাগি নি আমি। যখনই আমি সেই চেষ্টা করেছি, তখনই ওঁরা আমায় টেনে নিয়ে কোলে বসিয়েছেন।

ধোবী কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। অস্থির হয়ে মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন— ভুলে যা, মা! এ তোর স্বপ্ন ছিল, সত্যি নয়। তুই আমার আদরের মেয়ে।

ধোবী উঠে বসে। চারদিকে দেখে বলে— না, মা! এ স্বপ্ন নয়, সত্যি। শাশুড়ী যে আমাকে কোলে বসিয়ে আদর করতেন। পা টিপে দিতে গেলে আমাকে থামিয়ে শাশুড়ী বলতেন— তুই আমার কুললক্ষ্মী। আমার পায়ে তুই হাত দিবি?— আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাঁর কোলের মধ্যে ডুবে যেতে ইচ্ছে হত মা। আজ যেমন গা গরম হয়েছে, উনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে তেমনি হ'ত।

ধোবী শুয়ে পড়েছে পালঙ্কে। মা তার মাথা টিপে দিয়েছেন। কখন ঘুম এসেছে, ধোবী জানে না। নিধি স্বাঁই বাড়ি ফেরেন। ধোবীকে তাঁর জিম্মায় রেখে মা চলে যান। নিধি ধোবীর পালঙ্কের পাশে বসে থাকেন সারারাত।

ধোবী বিড় বিড় করে — ও গরীব। ওর কোনো আশ্রয় নেই। ওকে তাড়িয়ে দিয়ো না।

নিধি স্বাঁই বুঝেছে ধোবীর মনের কথা। তার হাত করতলে নিয়ে হাত বুলোন। ধোবী চোখ খুলে তাকায়। ডেকে ওঠে— কাকা!

নিধি স্বাঁই চুপ ক'রে থাকেন। ধোবীর হাতে হাত বুলিয়ে দেন।

আটদিন কেটে গেছে—

ধোবী সেরে উঠেছে। সে এখন কবিরাজের বিধি অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া করছে। কিন্তু দুর্বলতা কাটে নি। চিন্তেই স্বাঁই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে একটা ভালো দিন দেখছেন। নিধি স্বাঁইয়ের ছেলে বিদেইকে সেদিন সর্বসমক্ষে ধোবী দত্তক নেবে। বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর আর সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীরা ভবিষ্যতের সাক্ষী হিসেবে সেই উৎসবে যোগ দেবেন।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের মনের কথা কেউ জানে না। লোকে বলছে, বাড়ির আর সবাইকে জিজ্ঞেস না করে, ধোবীর দত্তকপুত্র নেবার ব্যাপারে তিনি এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? সবাই জানে আর তিনি নিজেও জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ টুঁ পর্যন্ত করবে না। তাহলে তাড়াহুড়ো কিসের?

একদিন দুপুরে ধোবী তার বাক্স খুলে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। হঠাৎ তার হাতটা কেঁপে উঠল। অন্ধকার ঘরে সে অস্থির হয়ে উঠল। তার ভালোবাসার কোনো অধিকার নেই। কারণ সে বিধবা, বড়োলোকের বাড়িতে থাকে, বড়োলোকের বাড়ির বৌ সে। সনিয়াকে মমতা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেও সে ছেড়ে দিয়েছে, সনিয়ার অনুসরণে ঘুরে বেড়াতে।

যে আশা সে সনিয়ার মনে জাগিয়ে তুলেছে, কী হবে তার প্রতিফল? শরীরটা দূরে রাখলেও, মন তো দূরে রাখতে পারে নি? বাড়ি তৈরি করেছে সনিয়া। স্বজাতে যোগ দিয়েছে। জমি কিনে, ঘর-সংসার করে সুখে থাকবে— এই পর্যন্তই ধোবীর আনন্দ হওয়া উচিত। ভালোবাসা দিয়ে তার সনিয়াকে সুখী করা উচিত।

ধোবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওপর থেকে বুঝি দৈব নির্দেশ পায়। ঘরের অন্ধকারে সে হাত জোড় ক'রে ভগবানকে প্রণাম করে।

স্বামীর সংসার থেকে আনা বাক্সগুলো একে একে খোঁজে ধোবী। কিন্তু যে জিনিস খুঁজছিল তা পাওয়া গেল না। বিধবা হওয়ার পর সব গয়নাগুলো খুলে ওই বাক্সগুলোয় রেখেছিল। হারিয়ে যাবার আশঙ্কায়

চিন্তেই স্বাঁই একদিন তার কাছ থেকে ওগুলোর চাবি চেয়ে নেন। বাক্সগুলো থেকে কী নিলেন বা না নিলেন, তা দেখার প্রয়োজন অনুভব করে নি ধোবী। কিছুদিন পরে তিনি চাবি ফিরিয়ে দিলেন। ধোবী রেখে দিল। এতদিন পরে বাক্সগুলো দেখার কথা মনে হল। খুঁজে খুঁজে কিছুই পেল না। তার সমস্ত গয়না বাবা নিয়ে গেছেন।

নিরাশ হয়ে যায় ধোবী। বাক্স ধরে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতটা নির্দয় হলেন কেন বাবা? ধোবীর ওপর কেন ভরসা করতে পারলেন না? মনে সন্দেহ হ'ল তার। হয়তো তিনি জেনে গেছেন, সনিয়াকে ধোবী সোনার মোহর দিয়েছে। সনিয়াকে মোহর দেবার ক'দিন পরেই তিনি চাবি চেয়ে নেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে আজ অবধি কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

বিদ্রোহী হয়ে উঠল ধোবীর মন। ইচ্ছে হ'ল, পুরনো সংস্কারগুলো দলে পিষে এগিয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুসমাজের জটিল নিয়মের আবেষ্টনীতে বিদ্রোহের সব আগুন নিভে যাবে। জয় হবে প্রাচীন রক্ষণশীলতার।

ধোবীর অবাধ মন সনিয়াকে অনুসরণ করে ছুটে চলেছে। কিন্তু সামাজিক সংস্কার তাকে পেছন দিকে টেনে আনছে। তার যত রঙিন কামনা সনিয়াকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, স্বামী শ্বশুর তারই জন্যে আত্মত্যাগ করেছে— সব ভাবনা তখন ছিঁড়ে যায়।

খুবই অনুশোচনা হয় ধোবীর। স্বামীর কথা মনে পড়লেই তার কান্না আসে। ব্রত-উপবাস করে মনের মালিন্য কাটায়। গীতা, পুরাণ পড়ে দুর্বল মনকে শক্ত করার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু মন মানলে তবে তো!

সংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে বহুদূর তার মনের ভাবনা ছুটে চলেছে। মনের অবস্থা তার সব সময় দ্বিধাগ্রস্ত। কি ভালো, কি মন্দ— তা ভাববার ক্ষমতা নেই তার।

চিন্তেই স্বাঁই সনিয়ার সর্বনাশের জন্য নিজের বাড়িতে তাকে মজুর করার চেষ্টা করেছিলেন। সনিয়াই তা বানচাল করে দিল। চিন্তেই স্বাঁইয়ের দম্ভ ভেঙে গেল। কি ক'রে সনিয়া জেনেশুনে বড়োলোকের

কাঁধে পা দিয়েছিল ?

সনিয়া এই-যে বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ধোবী তার জন্য খুব খুশি। এই কাজের মাধ্যমে সনিয়া তার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। না-না, আমি ওকে পরের মজুরী করতে দেব না। ওর নিজের ওপর আস্থা থাকা দরকার। নিজের বাহুবলে বেঁচে-থাকা উচিত। প্রয়োজন হ'লে সর্বস্ব দিয়ে তাকে আমি সাহায্য করব।

কিন্তু ধোবীর কী আছে ?

সোনার এই হার ? শ্বশুরমশাই তাকে প্রথমবার দেখতে এসে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। চারগাছা সোনার চুড়িও আছে। শাশুড়ী তাকে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। এগুলোতে বাবা বা কাকার কোনো অধিকার নেই। সবই তার— শ্বশুর-শাশুড়ীর ভালোবাসার দান।

শিবরাত্রি উৎসব। নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দিরে মেলা বসেছে।

আজ ধোবীর উপোস। টিমিকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসেছে। আসার জন্য মা, বাবা, কাকা বা কাকীমার অনুমতি নেয় নি। তাঁরাও জানেন, সঙ্গে টিমি আছে। মন্দিরটিও তাদের গাঁয়ে। মেলার লোকেরাও এই গাঁয়ের মানুষ। বাবা মা-ও তাই নিশ্চিন্ত।

ধোবী সনিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে এল। ভাবল ভেতরে ঢুকে তার সঙ্গে একটু কথা বলে। তার খবর নেয়। কিন্তু টিমি সঙ্গে ছিল। হয়তো কিছু ভাববে, তাই ধোবী সংকল্প বদলাল।

অন্ধকার। দূরে মন্দির থেকে ছোটো-ছোটো আলো কাছাকাছি খেলছে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকে আলো নিয়ে এগোচ্ছে মন্দিরের দিকে। কিন্তু সনিয়ার বাড়িতে অন্ধকার। হয়তো বাড়িতে কেউ নেই।

ধোবী এগিয়ে গেল।

টিমিও উপোস করেছে। তার ধারণা, তার নিরুদ্দেশ স্বামী আবার ফিরে আসবে। মন্দিরে যেতেই হবে।

কিছুদূর এগিয়ে টিমি বলল— ধোবী। মনে আমার কোনো শান্তি নেই। ছটফট করছি শুধু। আমার স্বামী খিদের জ্বালা সহ্য করতে

পারে নি। ভগবান জানেন, বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। আমি এসে বাপের বাড়িতে আছি। এত লোক বাড়ি ফিরল। কিন্তু ও ফিরল না। নতুন কেউ ফিরলেই বাবা পাগলের মতো তার কাছে খবর নেয়। সবাই বলে-- জানি না।

একটু থেমে টিমি বলল— বিয়ের পর কয়েক মাস আমি তার ঘর করেছি। মনে হয় আমি বুঝি স্বপ্ন দেখেছি। একটা দিনও আনন্দে কাটে নি। পরের বাড়ি ছেনীর কাজ করে সামান্য পয়সা পেত। তার অর্ধেক তো খরচ করে দিত মদে আর চরসে। যা বাকী থাকত, তাতে পেট ভরে না। আমার পিঠের ওপরই সে রাগ ফলাত। কত সহ্য করব? কাকে বলব? কারো কাছে নালিশ করলে বলত— আরে! বিশুনিয়া তো খুবই ভালো ছেলে।— সব দোষই আমার। গাঁয়ে আমার বদনাম হতে লাগল।

টিমি আবার বলল— কত সহ্য করব? হাজার হোক মানুষ তো! কেঁদে কেটে গাঁয়ে বাপ-মায়ের কাছে চলে এলাম। পরে শুনেছি, ও পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, সত্যিই কি ও আমাকে খুঁজছে? ইচ্ছে হল, ফিরে যাই। হয়তো সে বদলে গেছে। কিন্তু আবার ভয় হল। না, না, বিনা কারণে অত গালাগাল শুনব কেন? কেন অত মার খাব? মা বলল — চলে যা। বাবা বলেছে— চলে যা! আমি বললাম— আমাকে পাঠালে আত্মহত্যা করব। একদিন সে আমাদের বাড়ি এল। মায়ের কাছে খুব কান্নাকাটি করল। অনেক মিনতি করল। কিন্তু আমি লুকিয়ে পড়লাম। তার সামনে যাইনি। মনে হচ্ছিল, একটা বাঘের সামনে যাব বুঝি। বুঝিয়ে শুনিয়ে মা তাকে বাড়ি পাঠাল। মা আমাকে বলল— বিশন তো ভালো ছেলে। বন্ধুদের সঙ্গে বসে একটু নেশা করে। পুরুষের জাত এমন করেই। তোর বাবাকে তো দেখ··· ।— হ্যাঁ ধোবী, আমার বাবা লুকিয়ে স্থকিয়ে কখনো কখনো চরস খায়।

টিমি জোরে হেসে উঠল। মহাদেব মন্দিরের কাছে এসে গেছে। হৈ-চৈ হচ্ছে। সামনে পেছনে অনেক লোক আলো নিয়ে আসছে। ধোবীর দুর্বল হাত ধরল টিমি। উঁচু আলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল দুজনে।

বিপদজনক আল। ক্ষেতের মাটিও সমান নয়। পড়ে গেলে হাত-পা জখম হবার ভয় ছিল।

—ছাড়, আমার হাত— ধোবী বলল।

—না, পড়ে যাবে— টিমি উত্তর দিল।

—না, আমি সাবধানে হাঁটছি। তুই তোর গল্প শোনা। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি কেন? আমি তো তোর সখী হই!

টিমি বলল— তোকে লুকিয়েছি কেন? শোনাবার সময় পাইনি। শোন্, সে তো ফিরে চলে গেল। আমি নিশ্চিন্তে দম নিলাম। অনেক বার সে খবর পাঠিয়েছে। আমি যাই নি। তারপর এ-অঞ্চলে আকাল দেখা দিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না। তার দু-তিন একর জমি ছিল। তোর শ্বশুরকেই কিছু জমি সে বিক্রি করে দিল। যা পড়ে রইল, মদে ভাঙে তা উড়িয়ে দিল। তারপর গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। আমাকে কিছু জানায় নি, আমার খবরও নেয় নি।

—কয়েক বছর কেটে গেছে। ওর কোনো খবর নেই। বাবা বলল, টিমির বিয়ে আর-কারোর সঙ্গে দেব। মা বলল— তা কি করে হবে? বিশন তো ত্যাগ দেয় নি? বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে। ও না ফিরলে পলাশ পাতা জ্বালিয়ে শুদ্ধ হতে হবে। তারপর টিমির বিয়ে হতে পারে। মা বলে— টিমি, ব্রত-উপোস কর, বিশন ফিরে আসবে! মায়ের ভয়ে উপোস করি। বারো বছর কেউ ব্রত-উপোস করতে পারে? বল্ না, ধোবী! আমার জীবনে শান্তি কোথায়?

কাছেই মন্দির। হৈ-চৈ বেড়ে গেছে। আলোগুলো অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। টিমি চোখের জল মোছে। ধোবী তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না।

টিমি বলল— বারো বছর ব্রত-উপোস ক'রে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, যেন সে ফিরে আসে। কিন্তু এলেও তো মদ-চরস খেয়ে নেশা করবে আর আমার পিঠে তার ঝাল ঝাড়বে। এ আমি কি করে বরদাস্ত করব, ধোবী! না, আমি সত্যি বলছি, লোকে যা-খুশি বলুক, এ আমি চাই না। আমার প্রার্থনা— কেউ এসে বলুক যে, বিশনকে সে মরতে দেখেছে।

ধোবী শিউরে ওঠে। টিমির হাত ধরে সজোরে টেনে বলে— তুই মর্ টিমি! এমন কথা ভাবতেও আছে!

একটু চটে গিয়ে টিমি বলে— কেন এমন কথা ভাবব না? নিজের কথা একবার ভেবে দেখ। তোর বর মারা গেল। তুই কান্নাকাটি করলি। তারপর শান্ত হয়ে গেলি। আবার ইচ্ছে হলে নতুন ঘর-সংসার করবি। তুই তো ছটফট করবি না।

ধোবীর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কোনো উত্তরই সে দিতে পারল না। স্বামীর মারা-যাবার সময়ের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে। কেন সে উপোস করেছে? কেন এত রাত্তিরে মহাদেবের কাছে যাচ্ছে? তার পা কেন সনিয়ার বাড়ির কাছে থেমে গেল?

মন্দিরের চারিদিকে ভীড়। ধোবী আর টিমি মন্দিরটা ঘিরে ঘুরল। মন যাকে খুঁজছে তাকে পাওয়া গেল না। কাছেপিঠের অনেক গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়েছে। মাঝে মাঝে হরিবোল আর উলু-র শব্দ উঠছে। গাছের নীচে বৌয়েরা যে-যার বাচ্চার মাথায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় লোকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে আর বলছে— হে মহাদেব! চরণের সেবায়!

ঠাকুর-দর্শন করে ধোবী আর টিমি মন্দিরের পাশে একটা গাছের নীচে এল। ওখানে অনেক বৌয়েরা রয়েছে। ফাল্গুন মাস। রাতের ঠাণ্ডা। মাঝরাতে মহাপ্রদীপ উঠবে। সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মহাপ্রদীপ না দেখলে ব্রত-উপোসের কোনো ফল হয় না।

ধোবী আর টিমি গাছের নীচে বসে পড়ল। কারোর মুখে কথা পর্যন্ত নেই। ধোবী ভেবেছিল, সনিয়ার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। কিন্তু হল না। তার মনের ইচ্ছে, ফেরার সময় সনিয়ার বাড়ি যায়। সে কী করছে, দেখে। কিন্তু সে ভয় পেল। মনে মনে উতলা হচ্ছিল। সনিয়ার বাড়ি যাবে— টিমিকে এ কথা বলার সাহস হল না। ভাবল, টিমির কাছ থেকে পালিয়ে রাতের অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে সনিয়ার বাড়ি চলে যাবে। জিজ্ঞেস করবে— সনিয়াদাদা, ব্যাপারটা কি? তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কেন?

টিমিও ছুতো খুঁজছিল। মন্দির থেকে বেরতেই দেখেছে বিশি জেনার ছেলে চন্দরা। দরদালানের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। টিমিকে দেখে হাসছিল। দু-তিন বার সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করল। কিন্তু তার পাশে ধোবী আছে। তাই ঠাট্টাতামাসা করতে পারে নি। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে টিমি বলল— এই ছেলেগুলো এত পাজী যে, এদের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। ধোবী! একটু চেয়ে দেখ্।

ধোবী চন্দরার দিকে তাকাল। মিথ্যে বিরক্তির ভান করে টিমির হাত ধরে টেনে মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করল। টিমিকে বলল— যা, চন্দরাকে গিয়ে বলে আয় যেন সাবধানে থাকে। তা না হলে ভালো ক'রে তার শিক্ষা হবে। লোকে কি বলবে? দেখ, কাকা আসছেন। আমি যাচ্ছি। তুই পরে আসিস।

টিমির মনের কথা জেনে গেছে ধোবী। ওকে ফেলে সে মন্দিরের অন্যদিকে চলে গেল।

নিধি স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন— কখন ফিরবি? সঙ্গে কেউ আছে, না, আমার সঙ্গে যাবি?

ধোবী বলল— টিমি আছে আমার সঙ্গে। অনেকেই আসছে যাচ্ছে। মহাপ্রদীপ ওঠার পর আমরা যাব। আপনি যান কাকাবাবু!

গভীর রাতে অন্ধকারে ধোবী চলেছে সনিয়ার বাড়ি। একা। তবু সে ভয় পেল না— এবড়ো-খেবড়ো ক্ষেতের কাঁটাকে কিংবা ঘাসের মধ্যে চলন্ত সাপকে। সে ভয় পেল সেই মানুষকে যে সাপের ছোবলের মতো নিয়ম তৈরি করেছে আর গুজবের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ধোবী তাড়াতাড়ি পা চালাল। ভাবল, সনিয়া দাদা যদি তার উপহার গ্রহণ না করে, তাহলে কি হবে? সনিয়া যদি তার মনের কথা খুলে বলে দেয়, কি হবে তাহলে? সে কিছু স্থির করতে পারল না।

সনিয়ার বাড়ির সামনে তার পা থমকে গেল। কেউ আসছে না তো? দেখে ফেলে নি তো? ও ভয় পেয়ে গেল। গা যেন কাঁপছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এক মনে দেখল। কেউ নেই।

সনিয়ার বাড়ি থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। বোধহয় মৃদু আলো জ্বলছে। তাহলে সনিয়া বাড়িতে আছে? দুরু দুরু বুকে কাঁপা পায়ে ধীরে ধীরে সে এগোল। ফাটক খুলে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকল। কিন্তু আবার থমকে গেল।

কেউ দেখছে না তো?

ধোবী ভাবল, তার মনের কথা কেউ বুঝবে না। তবু সকাল হতেই গুজব ছড়িয়ে যাবে। তার নামে কলঙ্ক লাগবে। মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। কি করবে, ভেবে ঠিক করতে পারল না। যাবে না? ফিরে চলে যাবে?

আকাশের দিকে তাকাল ধোবী। আজ আকাশে অনেক তারা। সে ভাবল, তার মনের কথা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক ওরা তো নিশ্চয় বুঝছে।

ধোবী সনিয়ার বাড়িতে ঢুকল। একটা আলো জ্বেলে সনিয়া বসে আছে। সামনে একটা সাদা রঙের বেড়াল। তার সঙ্গে খেলা করছে। বেড়ালটাই তার জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ধোবীকে চোখে পড়ল তার। হকচকিয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারল না। মনে ফুটে উঠল মধুর ভাবনা। সে দেখল, কত রোগা হয়ে গেছে ধোবী। চোখে কান্নার আভাস। ঠোঁট কাঁপছে। শরীরে যেন রক্ত নেই। সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—ধোবী।

—হ্যাঁ, সনিয়া দাদা।

—একলা?

—হ্যাঁ, একলা। মহাদেব-দর্শনে এসেছি। তোমাকে একটু দেখতে এলাম।

সনিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

—শরীর কেমন, সনিয়া দাদা?

—জ্বর হচ্ছে।

—জ্বর?

—হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া জ্বর। থেকে থেকে ছু-দিন অন্তর একবার জ্বর আসে। কিন্তু কখন আসে, কখন ছেড়ে যায়— বুঝতে পারি না। পরের মজুরী করতে করতে জ্বর এসে যায়। গাছের নীচে হোক, বা গোয়ালে গামছা পেতে শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। তারপর আবার কাজে লেগে পড়ি।

ধোবী অবাক হয়ে শোনে।

—বোসো, ধোবী।

সনিয়ার সামনে বসল ধোবী। মন চাইছিল, কিছু বলে। তবু নিশ্চুপ থাকল। সব কথা যেন তার মুখে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ছুজনেই মৌনভাবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। ছুজনেরই চোখে জল।

মহাদেবের মন্দিরে হৈ-চৈ বেড়ে গেছে। নদীর ধার থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হঠাৎ ছুজনের স্তব্ধতা ভেঙে গেল। পরস্পরকে দেখে ছুজনেই আরেকবার শিউরে উঠল। একজনের উপস্থিতি অন্য জনকে বুঝি শঙ্কিত করে তুলেছে। চোখের জল মুছে নিল ছুজনে।

—সনিয়া দাদা!

—না, ধোবী! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমাকে তোমার খেলনা মনে করেছ। তোমার কথা শুনে, তোমার দান নিয়ে আমি স্বজাতে অংশীদার হলাম। বাড়ি তৈরি করলাম। পরের কাছে মজুরী করে পেট চালাচ্ছি। আবার তোমার কথা শুনে আমি চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়ি গেলাম। আমার বাপ-ঠাকুর্দার সর্বঅহংকার ভুলে তাঁর পায়ের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অপমান করলেন। সব সহ্য ক'রে আমি ফিরে এসেছি।

ধোবীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

সনিয়া বলল— আমি তোমার খেলনা হয়ে গেছি, ধোবী! তুমি খেলছ, আমি উতলা হচ্ছি। আমার বাবা তোমার বাবাকে একটাই কড়া কথা বলেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না অপমান করা। তোমার

বাবা হেরে গেছেন। কিন্তু জিতে গেছ তুমি। আমার দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তুমি প্রতিশোধ নিলে।

ধোবী আর সহ্য করতে পারল না। মুখ খুলল। বলল— চুপ করো, সনিয়া দাদা।

—কেন চুপ করব? এই বাড়ি তোমার। এ-বাড়িতে যা কিছু আছে, সব তোমার। আমি তোমার খেলনা হয়ে থাকতে পারব না। আমার চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা পড়ে আছে। হাজারটা গাছের তলায় আমি আশ্রয় পেতে পারি।

—সনিয়া দাদা! —ধোবী কিছু যেন বলতে চাইল। কিন্তু পারল না।

সনিয়া আবার বলল— আমার মনের কথা তোমায় বলছি। পরের কাছে আমি রক্ত জল করে খেটে এখানে একা পড়ে আছি। এ-বাড়িতে পুরনো দিনের স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমার মা, বোন, বাবা, ভাই— সকলের স্মৃতি কষ্ট যন্ত্রণা দেয়।

ধোবী বলল— সনিয়াদাদা, মানুষ যখন একলা থাকে, এই ধরনের অনেক কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়। পাগলের মতো সে বিড় বিড় করে। এ বাড়িতে একজন গিন্নী এলে তোমার পাগলামি শেষ হবে।

ধোবী হাসে। সনিয়ার হাত ধরে। তার বলার ধরন, আড় চোখের চাউনি, কাঁপা হাসির ঠোঁট আর গাল দেখে সনিয়ার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কথা বেরয় না।

ধোবী আবার বলে— এ সংসারে সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর আবার সুখ আসে। জগতের এই হল নিয়ম। ধৈর্য ধরো। তোমার মা, বাবা, ভাই, বোন আবার তোমার কোলে জন্মাবে। এ বাড়িতে আবার নেচে খেলে বেড়াবে। তাদের হৈ-হট্টগোলে আবার এ-বাড় ভরে উঠবে। যাদের স্মৃতিতে তুমি উতলা হচ্ছ, আবার তাদের সেবা করার সুযোগ পাবে। ভাবনার আছে কি?

ধোবীর হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল সনিয়ার হাত। কি তার

উদ্দেশ্য ? এই বাড়ি আবার হেসে উঠবে ? আবার বইবে এখানে আনন্দধারা ? কিন্তু এই বাড়ির ঘরনী হবে কে ? কে তার পূর্বপুরুষ কোলে করে নিয়ে আসবে ?

ধোবীর চোখে, তার বলার ঢঙে, সনিয়া যেন তার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। মন চাইল, তার উত্তর পুরুষের জননীকে বুকে জড়িয়ে ধরে— গালে চুমু খেয়ে বলে— কবে, কবে এই সৌভাগ্য হবে, ধোবী ? ধোবীর চোখের ভাবটা যেন 'না, না'। সনিয়া তার অর্থ বোঝে। দুহাতে ধোবীর কোমল হাত দুটি ধরে সে বলল— কিন্তু ধোবী, আমি যে গরীব !

—গরীব ?— ধোবী বলল— তুমি কেন গরীব হবে ? ভগবান তোমাকে বিদ্যেবুদ্ধি দিয়েছেন। তোমার গায়ে শক্তি দিয়েছেন। তোমার প্রয়োজনটুকু আমি জানি। পরের সাহায্য ছাড়া কারোর উন্নতি হয় না। তাই তোমাকে বাবার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি রাজী হন নি, তুমি ফিরে এসেছ। এতে অপমানের কি হল ? যে বড়ো হতে চায়, তাকে ছোটো হতে হয়। যে সহ্য করতে পারে, সে-ই বড়ো মানুষ হয়। ওঁর কাছে তোমাকে বার বার যেতে হবে। আরেক বার যাও। টাকা দিয়ে তোমার জমি ফেরত চাও।

—টাকা !— সনিয়া বিস্মিত হয়। জিজ্ঞেস করে— টাকা কোথায় পাব, ধোবী ? যা টাকা ছিল, সেই দিয়ে একটা ছাগল কিনেছি ; একটা বাছুরও কিনেছি। আর তো আমার কাছে টাকা নেই। —জমি খুঁড়লে তুমি আরো টাকা পাবে, বুঝছ ?— ধোবা তার কোমর থেকে একটা সোনার মালা বের করল। কুপীর আলোতে সোনার হার ঝিলিক দিয়ে উঠল। সনিয়া চমকে উঠল।

ধোবী বলল— এই হার চিন্তেই স্বাঁইয়ের নয়, আমার শ্বশুরমশাই আমাকে দিয়েছিলেন। এটা আমার আর আজ তোমাকে সেটা দিচ্ছি। এটা বিক্রি করে তোমার জমি ফেরত নাও। বাবা ফেরত দিতে রাজী না হলে নতুন জমি কেনো।

একটু থেমে ধোবী আবার বলল— সনিয়াদাদা ! আমি তোমাকে

ভিক্ষে দিচ্ছি না। এই হার তোমার। এটা নিয়ে আমি কি করব? আমার বাক্সে অনেক টাকা ছিল, গয়না ছিল। কিন্তু একদিন বাবা চাবি চেয়ে নিয়ে সব বের করে নিয়েছেন। হারটা কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। তাই তাঁর নজরে পড়ে নি। নজরে পড়লে নির্ঘাত এটাও নিয়ে যেতেন। তাঁর কাছে গেলে আর কখনো ফিরে পেতাম না। এটা তুমি নাও। বাক্সে পড়ে-থাকা টাকার কি দাম আছে? সে তো রাস্তার নুড়ির সমান।

—কিন্তু ধোবী···

—কিন্তু টিন্তু কিছু নয়। তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনব না।

ধোবী সনিয়ার মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল— আমি তোমায় আর কিছু বলতে দেব না, সনিয়া দাদা! যে হার বাক্সে পড়ে থাকত, লোকের কাজে তা লাগুক। জমি কিনে তুমি গাঁয়ের আর সকলের সমান হও— এই আমি চাই। যখন দরকার হবে, তোমার হাত থেকে আমার টাকা কেড়ে নেব। তখন তুমি বাধা দিতে পারবে না।

সনিয়া বলল— ধোবী, জমি কি করতে কিনব? কে আছে আমার? জমি ভোগ করবে কে? আমার স্বাধীন জীবনকে কেন তুমি বাঁধছ?

আবার বলে সনিয়া— ধোবী! একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মন বলছে, তোমার মুখেই তার উত্তর পাব। তোমার কাছ থেকে একটা কথাই শোনার পর আমার সব দুঃখ ঘুচবে। আমি শুধু তোমারই পথ চেয়ে থাকব।

সনিয়ার কথার মধ্যে ছিল প্রেম। চোখে ছিল বাঁচার উচ্ছ্বলতা। তার কথাতেই উদ্দেশ্য বোঝা গেল।

ধোবী বুঝল, সনিয়া কি জানতে চায়। তার মনের অকপট বাসনা ধোবী অনুভব করল। হাসিতে খুশিতে যদি তার প্রশ্নের উত্তর সে দেয়, তা হলে বাঁচতে উৎসাহ পাবে সনিয়া। তার শূন্য কুটিরে ভবিষ্যতের এক সুন্দর স্বপ্ন ফুটে উঠবে। কিন্তু সনিয়ার প্রশ্নের জন্য সে তৈরি ছিল না। তার উত্তর দিতেও সে তৈরি নয়।

কাঙাল সনিয়া কেন বেঁচে আছে, কেন বাড়ি করে জাতে যোগ দিয়েছে— ধোবী তা জানে। এত কষ্ট, অপমান কেন সহ্য করছে, তা-ও তার জানা। সনিয়ার প্রশ্নের উত্তরে সে কি 'না' বলে দেবে? সে জানে, একটা 'না' শব্দে সনিয়ার সর্বনাশ হয়ে যাবে। পরিজ-বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ও কি 'হ্যাঁ' বলবে? 'হ্যাঁ' বলার ক্ষমতা তার নেই। দুজনের মধ্যে অনেক বিরাট বিরাট দেয়াল দাঁড় করানো আছে —সামাজিক সংস্কার, বাবার মত আর টাকার বৈষম্য।

জলে ভরে গেল ধোবীর চোখ। সে বলল— সনিয়াদাদা! তোমার পায়ে পড়ি। এ সময়ে তুমি কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। এখনো জিজ্ঞেস করার সময় আসে নি। জবাব দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। তুমি মানুষ হও। বড়ো হও, তখন তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও হবে না, আমার জবাবেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

সনিয়ার পায়ে মাথা ছোঁয়াল ধোবী। তার উষ্ণ অশ্রুধারা সহ্য করতে পারল না সনিয়া।

ধোবীকে সে মাটি থেকে তুলল। তার চোখ মুছে দিল। গালের অশ্রু দিল মুছে। ইচ্ছে হল, ওই দেবী প্রতিমার শীর্ণ দুর্বল শরীরটা বুকে জড়িয়ে বলে— ধোবী! তুমি আমার! তুমি আমার!

ধোবী বুঝতে পারল সব।

মহাদেবের মন্দির থেকে হরিবোল আর উলুর শব্দ ভেসে এল। সচকিত হয়ে উঠল ধোবী। মহাপ্রদীপ মন্দিরের উপরে উঠছে। ধোবী বলল— সনিয়াদাদা! আমি যাই!

সে আর দাঁড়াল না। আপনিই তার পা চলে এল বাড়ির বাইরে। তার পেছনে পেছনে এল সনিয়া। সোনার হার মেঝেতে পড়ে রইল।

দোলের সময় এগিয়ে এসেছে। গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরের আশপাশ পরিষ্কার করা হয়েছে। চাতালের পাশে বাঁশের বড়ো বড়ো খুঁটি পোঁতা হয়েছে। সামিয়ানা খাটানোর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। চতুর্দশী তিথিতে

বিষ্ণুপুরে বড়ো মেলা বসে। মাত্র সাত দিন বাকী। আগে থেকে তৈরি না হলে সময়ে কাজ হবে না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ চলছে।

প্রহরাজমশাই নিজে সব কাজের ওপর নজর রাখছেন। মন্দিরের পেছন দিকের আখড়া ঘর মেরামত হতে আরম্ভ হয়েছে। সন্ধেবেলা কীর্তন শুরু হয়ে গেছে। আশপাশের গাঁয়ে যাদের কলাকৌশলের কদর ছিল সেসব চৌখস খোল-বাজিয়েরা আজ আর নেই। আকালের করাল গ্রাসে তারা শেষ হয়ে গেছে। আজকের বাজিয়েরা সব শিক্ষানবীস। তাদের বয়সও খুব কম। অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু লোকে বলছে, ওদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

প্রহরাজ খোল-বাজিয়েদের উৎসাহ দিচ্ছেন। গাঁয়ের বাচ্চাদেদের দিয়ে রথ পরিষ্কার করাচ্ছেন। বহু গাঁয়ে রথ যাবে, বহু লোক মেলায় যোগ দেবে। পুরনো সামিয়ানার বদলে এ বছর নতুন সামিয়ানা লাগানো হবে। ধোবীর নামে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চিন্তেই স্বাঁই রথের জন্য একটা নতুন ঘেরাটোপ কিনে দিয়েছেন। গাঁ জুড়ে ধোবীর প্রশংসা হচ্ছে। লোকে বলছে, অল্প বয়সে ধোবী পরজন্মের জন্য পুণ্য অর্জন করছে।

ঠাকুরের কাজ কি-রকম এগোচ্ছে দেখার জন্যে বরাবর চিন্তেই স্বাঁই আসতেন। বিষ্ণুপুর গাঁয়ের যে ছেলেরা ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত আর অনাহারের মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছে, আজ তারাই গাঁয়ে 'লউডি' নামের লাঠি খেলা শুরু করে দিয়েছে। অন্য গাঁয়ে যেতে হবে। সেই গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া হলে হয়তো কারো মাথা ফাটাতে হবে। এই সব দেখার জন্যে গাঁয়ের বৃদ্ধেরা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে।

চিন্তেই স্বাঁই মন্দিরের পাশের চাতালে এলেন। ছোটো ভাই নিধি স্বাঁই রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। তাঁদের দেখে গাঁয়ের ছেলেছোকরারা পুরোদমে লাঠি খেলা শুরু করে দিল। আখড়াঘর থেকে খোল-বাজানোর মধুর শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রহরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বাঁইমশাই নমস্কার করার আগেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। প্রহরাজ বললেন— এ-বছর খুব জমজমাট মেলা হবে। তার জন্যে সব

রকমের চেষ্টা চলছে।

স্বাঁইমশাই হেসে বললেন— তাই তো উচিত প্রহরাজমশাই! গাঁয়ের জৌলুষ বাড়ুক এই তো আমরা চাই। গাঁয়ের সব ছেলে-ছোকরারা এসে গেছে তো? সনিয়া কোথায়? প্রহরাজ বললেন— গাঁয়ের মেলাতে ও কি মোটে আসে! ছেলেরা ওর বাড়ি চাঁদা নিতে গিয়েছিল। চার আনা চাঁদা ধরা হয়েছিল ওর। কিন্তু ও একটাকা চাঁদা দিয়ে বলেছে— আরে! চার আনাতে কখনো ঠাকুরের কাজ হয়? নাও একটা টাকা!

স্বাঁই মশাই বললেন— ছেলের বুদ্ধি আছে তো! কিন্তু একটু বেপরোয়া। সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। যা হোক, ঠাকুরের কাজ শেষ করে আপনি একটু বাড়িতে আসবেন। দোলের দিন ধোবী দত্তক নিতে চায়। যাদের নেমন্তন্ন করা হবে, ঠিক হয়ে গেছে। হরি মহান্তি চিঠি লিখছেন। এলে আপনি সব-কিছু দেখবেন।

চিন্তেই স্বাঁই ও নিধি স্বাঁই ফিরে গেলেন। রাস্তায় নিধি স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন— এ-ব্যাপারে একবার ধোবীকে জিজ্ঞেস করে নিলে ঠিক হত না?

চিন্তেই স্বাঁই গম্ভীর হয়ে গেলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা উচিত হবে না মনে করলেন।

নিধি স্বাঁইয়ের দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড়ো ছেলে ভগবান ওরফে মঙ্গী আট বছরের। গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ে। ছেলেটা প্রতিশ্রুতিবান আর সুশীল। বিদ্যাধর ওরকে বিদেই পাঁচ বছরের। বেশ হাসিখুশি আর বেপরোয়া। কিন্তু বুদ্ধিমান। একবার কিছু শুনলে, মনে রেখে দেয়। মেয়ে রানী দু-বছরের। সব সময় হাসছে।

আজন্ম বাচ্চারা বড়োমার কোলে মানুষ। নিধির স্ত্রী ছোটো বৌ সবসময় বাড়ির কাজে ব্যস্ত। বাচ্চাদের জন্ম দিয়েই সে নিশ্চিন্ত। ধোবীর মা বাচ্চাদের ভালোবাসেন। তাদের চোখের জল তিনি সহ্য করতে পারেন না।

ধোবীর মা যেদিন জানতে পারলেন যে ধোবী দত্তকপুত্র নেবে—

মনে বড়ো আঘাত পেলেন। যে বিদেই সবসময় তাঁর কোলে থাকে, তাকে মাটিতে নাবিয়ে দিলেন। ভাবলেন, আজ গিয়ে 'ওঁনাকে' কড়া-কড়া শুনিয়ে দিতে হবে। যা হবে, দেখা যাবে।

বৈঠকখানার ঘরে চিন্তেই স্বাঁই বসেছিলেন। একটু দূরে নিধি স্বাঁই-ও বসে আছেন। হরি মহান্তি ও প্রহরাজও ঘরে রয়েছেন। ধোবীর মাকে দেখে সবাই কথাবার্তা বন্ধ করে ফিরে তাকালেন। সবাই লক্ষ্য করলেন, তাঁর চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

তিনি গিয়েই তাঁর দেওরকে বললেন— এ কি হচ্ছে, নিধি? যা শুনছি সব কি সত্য? বিদেইকে কি ধোবী দত্তক নেবে?

মাথা নীচু করে বসে রইলেন নিধি স্বাঁই। এ-ধরনের কড়া কথা বৌদির কাছ থেকে তিনি কখনো শোনেন নি। স্ত্রীর বেহায়াপনা দেখে চিন্তেই স্বাঁই-ও রেগে গেলেন। তিনি বললেন— আরে, শোনো তো! ধোবীর শ্বশুরের বিশাল সম্পত্তি রয়েছে। তার দেখাশোনা করবে কে? তা ছাড়া নায়ক-বাড়ির পূবপুরুষদের শ্রাদ্ধ করবে কে? ধোবীর ছেলে তো এ-সব করতে পারে। তুমি তো পুরাণ পড়েছ। তুমিই বলো…।

ধোবীর মা পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, নায়ক-বাড়ির পূর্বপুরুষেরা নরকে যান, কি তাঁদের সম্পত্তি জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাক— তাতে আমার কি? পয়সার লোভে আমার আদরের মেয়েকে তুমি অত কম বয়সে বিয়ে দিয়েছ। যার পাণিগ্রহণ করল, তাকে ভালো করে দেখার আগেই সে বিধবা হল। এই কষ্ট কে সহ্য করে?

বলতে বলতে ধোবীর মায়ের চোখে জল এসে গেল। কেঁদে কেঁদেই তিনি বললেন— যাদের কথা শুনে তোমার মেয়ে-বৌয়ের চোখের জল ফেলাচ্ছ, তারা যাক, নায়ক-বাড়ির পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করুক। ধোবী কেন পোষ্যপুত্র নেবে?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— একটু লজ্জা থাকলে, বাইরে এসে তুমি এভাবে রাগ দেখাতে না। যাও, ভেতরে যাও।

ধোবীর মা আরো রেগে গেলেন। বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ, লজ্জা কাকে

বলে জানো? লজ্জায় আমি কিছু বলি নি। কিন্তু তুমি কি করেছ? আমার সর্বনাশ করেছ, না? আমি বলে দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে ধোবীকে পোষ্য নিতে দেব না। মুখ্যু বা মজুর; যাই হোক-না-কেন, আমি ধোবীর বিয়ে তার সঙ্গে দেব। একটা মাত্র মেয়ে। সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ তার। তুমি তোমার ভাগের সম্পত্তি ওর নামে লিখে দাও। বিয়ের পরে ও নায়ক-বাড়ির সম্পত্তি পাবে না! ঠিক আছে। জাহান্নামে যাক সেই সম্পত্তি। নিজেরটুকু নিয়েই আমার মেয়ে সুখে ঘর-সংসার করবে।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু এতটা রাগ চড়া সত্ত্বেও হেসে বললেন— ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি এখন ঘরে যাও। অনেক উপদেশ দিয়ে ফেলেছ।

ধোবীর মা বললেন— তুমি কারোর কথা শোন না। নিধিয়া তোমাকে তুক করে রেখেছে। তার ছেলেপুলেরাই যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করবে। কিন্তু আমার কথাও শুনে রাখো, সামনের দোলের মধ্যে আমি ধোবীর বিয়ে দেব। মজুর জুটলে, তারই সঙ্গে বিয়ে দেব। সে গায়ে খেটে তার পেট চালাবে। বনেই পরিবার ছেলে সনিয়া তো বাড়ি ফিরে এসেছে। ওরই সঙ্গে আমি ধোবীর বিয়ে দেওয়াব, হ্যাঁ…!

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সনিয়া এসে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সে। স্বামীকে দগ্ধাবার জন্যে তিনি সনিয়ার নাম করেছেন। এখন তাকে সামনে দেখে তিনি লজ্জা পেয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

সনিয়া ভেতরে এসে সবাইকে নমস্কার করল। ধোবীর মায়ের মুখে তার নাম শুনল। আরো কিছু বলছিলেন তিনি। কিন্তু সনিয়া কিছু শোনে নি। সবাইকে গম্ভীর দেখে সে ভাবল, নিশ্চয় তার সম্পর্কে কোনো কথা হয়েছে।

চিন্তেই স্বাঁই হঠাৎ তার মনোভাব বদলে বললেন— এসো বাবা, সনিয়া! বসো, বোসো! আজ তোমারই কথা হচ্ছিল। গাঁয়ের আখড়ায় সব ছেলেদের দেখলাম। কিন্তু তোমায় দেখলাম না। আরে সনিয়া, শুধু চাঁদা পাঠালেই কি কাজ হয়। নিজে এসে যোগ দিতে

হয়। তা না হলে ঠাকুরের কাজ সম্পূর্ণ হবে কি করে? আচ্ছা, বোসো!

সনিয়া তার লাঠিটা রেখে বসে পড়ল। সে বলল— ঠাকুরের কাজ দেখার জন্যে আমি আসি নি। সে-সব কাজ আপনি দেখুন। আমরা গরীব লোক, হতভাগা! আমাদের ওপর ঠাকুরের কোনো দয়া নেই। আমারও ঠাকুরের কাজ দেখার সময় নেই। আমার যে আপনার সঙ্গে সামান্য কাজ ছিল।

—আমার সঙ্গে কি কাজ? —ঠাট্টা করে চিন্তেই স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার জমি আমায় ফিরিয়ে দিন। আপনার যা পাওনা হয়েছে, হিসেব করুন।

ঘাবড়ে গিয়ে সবাই সনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। ব্যাপারটা কি? সামর্থ্য তো কম হয় নি। পরের মজুরী করে পয়সা রোজগার করে। এত পয়সা জমাল কি করে? দশ একর জমির দাম দিতে তৈরি?

চিন্তেই স্বাঁই চোখ নাবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— তুই জমির দাম দিতে পারবি?

—হ্যাঁ, বাজারে এর যা দাম হয়, সেই দামে আমায় ফিরিয়ে দিন। আমি টাকার বন্দোবস্ত করেছি।

—বাজারের দাম আমার জানা নেই। দশ একর জমি ফেরত নিতে হলে এক হাজার টাকা ফেলো আর জমি নিয়ে নাও।

—এখন বাজারে এক 'গুণ্ঠ' (সিকি একর) জমি এক টাকা। সেই হিসেবে আমি ২৫০ টাকার বন্দোবস্ত করেছি।

—আচ্ছা! —স্বাঁই হেসে ফেললেন। —তা হলে তুই বাজারেই চলে যা। সেখান থেকেই কিনে নে। আমি তোর বাবার কাছ থেকে জমি কিনেছিলাম রাখতে, বেচতে নয়। যদি বেচি, তা হলে নিজের খুশিমতো বেচব। কি? মহান্তিমশাই?

হরি মহান্তি বললেন— কেনা-বেচা তো নিজের নিজের খুশির ব্যাপার। কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে না।

সনিয়া উঠল। এক হাতে নিল তার লাঠি। সবাইকে নমস্কার

করে চলে গেল।

সনিয়া চলে যাবার পর নিধি স্বাঁই হরি মহান্তিকে বললেন— বৌদির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না। তিনি তো এখনো অসন্তুষ্ট। বেঁধে-ছেঁদে রেখে দিন। পরে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— ওরে নিধিয়া! বাড়ির বৌয়েরা কি হাটে এসে কাজ-কর্ম চালাবে? তোর বৌদির ইচ্ছেমতো কাজ করলে ঘর ভাঙতে দু-দিনও লাগবে না, বুঝেছিস? পোষ্যপুত্র নেবার কাজ বন্ধ হবে না। মহান্তিমশাই, আপনি চিঠি লিখুন।

দাদার প্রতিবাদ করলেন না নিধি। তাঁর সাহসে কুলোল না। তিনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই বললেন— কোথায় যাচ্ছিস? এখানে বোস! হরিবাবুকে সাহায্য কর। প্রহরাজমশাই, চলুন তো মন্দিরের কাজ দেখা যাক।

দুজনে উঠে চলে গেলেন।

স্বাঁই-বাড়িতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। ধোবী বা বাইরের লোকের তা লক্ষ্য করতে দেরি হল না। কাকীমা সব সময় বিরক্তি প্রকাশ করে। সামান্য সামান্য কথায় রাগ দেখায়। মা তো সব সময় কষ্টে আছেন। কাকা-ও আনমনা থাকেন। ধোবী বুঝতে পারল, বাড়িতে এমন কিছু-একটা ঘটছে, যা ভবিষ্যতে ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। তবু সে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কথাটা যখন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল আর গাঁয়ের লোকে জেনে গেল, তখন একদিন টিমি এসে সব জানাল তাকে।

টিমি বলল— ধোবী! জানিস তোর বাবা কাকা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। তোর মা বলছেন, দোলের আগেই সনিয়ার সঙ্গ তোর বিয়ে দিয়ে দেবেন। তোর বাবা বলছেন দোলের আগেই তোর পোষ্যপুত্র নেবার কাজ শেষ করবেন। কাকীমা বলছেন ছেলে দেবেন না। কাকা বলছেন— হ্যাঁ দেব। সনিয়া টাকা নিয়ে এসেছিল। তার জমি ফেরত চেয়েছিল। কিন্তু বাবা তোর দেয় নি, অথচ কাকা হ্যাঁ বলছিলেন।

বেচারা সনিয়া হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

টিমির কথা শুনে ধোবীর খুব দুঃখ হল। টিমির কথার প্রতিটি শব্দ যেন তাকে ছুরির মতো বিঁধল। তবু নিশ্চুপ হয়ে সে সব শুনল। সে জানে, একটা কথা বললে দশ কথা হয়ে উঠবে। টিমি যা শুনেছে খোলাখুলি বলে দিয়েছে। তার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে— কাউকে জিজ্ঞেস করে জানার সাহস ধোবীর হল না। ঘরে শুয়ে শুয়ে সে তার কর্তব্য সম্পর্কে ভাবল। কী তার কর্তব্য ?

ধোবী ভাবল, প্রত্যেককে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, তার জীবনকে সুখের করতে স্বাঁই-পরিবারকে কেন নষ্ট করা হচ্ছে ? তবু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। যতদিন সে এ-বাড়ির মেয়ে ছিল, তখন কথাটা অন্য রকম ছিল। এখন সে বাড়ির মেয়ে নয়। এখন সে পরের ঘরের বৌ। তার এখন এ-বাড়িতে কী অধিকার আছে ? এখন তার এমন মনে হয়, যেন সে নিজের বাড়িতেও নিজে অতিথি।

তার স্বামী-শ্বশুরের বাড়ির কথা সবসময় মনে পড়ে। ওই গাঁয়ের মাটি যেন তাকে ডাকছে। যাঁরা সব মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছেন, তাঁদের আত্মা তাকে বলছে— ওরে, তোর কাছে ধন-দৌলত, বাড়ি, জমি— কী নেই···? তুই নায়ক-বাড়ির বৌ। কেন পরের কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলছিস ? স্বামী-শ্বশুর যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন, তা কেন শেষ করবি না ? নায়ক-বংশের সর্বনাশ হয়ে গেছে। যে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাঁরা যে সম্পত্তি করেছিলেন, তার কি হবে ?

ধোবী যদি পোষ্য নেয় তা হলে তার মধ্যে নায়ক-বাড়ির রক্ত থাকবে না। শুধু নামই থাকবে। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে কি নায়ক-পরিবারে এখনো পর্যন্ত ছেদহীন রক্তধারা বয়ে চলেছে ? অতীতে হয়তো বহুবার এই ধারা মুছে গেছে। শুধু নামই থেকে যায়, আর কিছু নয়। নামে কি এসে যায় ? খোলস, তা শুধু খোলস ! সে কেন পোষ্যপুত্র নেবে ? কেন স্বামী ও শ্বশুরের অসম্পূর্ণ

কাজ শেষ করবে না?

গত বছরের কথা মনে পড়ে গেল। গত বছর ঠিক এই সময়ে যখন দোলের প্রস্তুতি চলছিল, তার স্বামী ও শ্বশুরমশাই দোলের উৎসব ছেড়ে লোকের সেবায় মেতে ছিলেন। দোলের আনন্দ তাঁরা পেলেন না। লোককে খাবার বিলোতে আর মড়ার লাশ তুলতে তারা লেগেছিলেন।

ধোবীর গা কেঁপে উঠল।

কেন সে অপেক্ষা করছে?— সে ভাবল। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামীর শ্রাদ্ধের সময় কাছে এসে গেছে। মুক্তিলাভের জন্যে তাঁদের আত্মা তার দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো। সে যদি একটা বাচ্চাকে না গ্রহণ করে, রাস্তায় পড়ে থাকা হাজার হাজার বাচ্চার সেবা করে, তাহলে ওঁদের আত্মা বেশি আনন্দ পাবে। একজনকে তার সম্পত্তি না দিয়ে সকলের কাজে লাগানো উচিত। তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী একজনের চেয়ে হাজার হাজার শিশুর আহ্বান শুনবেন বেশি।

ধোবী শিউরে উঠল! জানলা দিয়ে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো আসছে। মন্দির থেকে কীর্তনগান শোনা যাচ্ছে। তার চোখের সামনে নতুন আলো। কানে গুন্ গুন্ করছে নতুন আহ্বানের অপূর্ব ধ্বনি। সে অনুভব করল, সে মুক্ত, নিশ্চিন্ত। এখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না। বাবা-কাকার সংসারে যেন তার দেহ বন্দী হয়ে ছিল। সকলের স্নেহের বন্ধনে তার আত্মা যেন বাঁধা পড়েছে।

ধোবী মুক্তি চাইল। সে চাইল, সব ঘরের কপাট যেন তার জন্যে খোলা থাকে। সবাইকে সে বাঁধতে চাইল তার প্রেমের বন্ধনে। মা-বাবার সংসার তার জন্মস্থান নিশ্চয়, কিন্তু কর্মস্থল নয়। সে চলে যাবে তার কর্মক্ষেত্রে— মা বাবা কাকা আর সবার মায়া-মমতার বৃত্ত থেকে। অন্য জায়গায়।

ধোবী বাইরের দিকে তাকাল। বাড়ির ছাদের ওপর রুপালী চাঁদ হাসছে। সারা উঠোনে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া

শরীর আর মনকে শান্ত করে দিয়ে যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে বাসনের ঝন ঝন শব্দ আসছে।

বাইরে মা কিছু বলছেন। বাড়ির গোলমাল সম্পর্কে হয়তো মায়ের কথা থেকে কিছু জানা যেতে পারে-- এই ভেবে ধোবী মন দিয়ে তাঁর কথা শুনল। মা চন্দরাকে বলছিলেন— যাও, সনিয়াকে ডেকে আনো। আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।

চন্দরা বলল— এখনই যাচ্ছি, ওকে ডেকে আনছি। এখানেই নিয়ে আসব ?

—নিধি কোথায় ?

—তুই বাবু তো মন্দিরের চাতালে বসে আছেন। রাম প্রহরাজ, হরি মহান্তি আর বাম ওঝার সঙ্গে কথা বলছেন।

কি কথা হচ্ছে ?

আমি শুনি নি। টিমি আমাকে রাস্তায় বলল যে, আপনি আমাকে ডেকেছেন। আমি যে সোজা মন্দিরে রাস্তা দিয়ে এলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিমি আমাকে তোমার ব্যাপারেও কিছু বলেছে। ও বলেছে, শিবরাত্রির রাতে সনিয়াই ধোবীকে বাড়িতে ছাড়তে এসেছিল। আর সে কথা তুমিই ধোবীকে বলেছ।

আরো কয়েকটা কথা ধোবী শুনল। মা আবার বললেন— চন্দরা! তুমি একটা কাজ করো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সনিয়াকে ডেকে আনো। আমি এখানেই তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।

ধোবীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। মাথা ঘুরে গেল। কি করে ওখান থেকে পালাবে, ভেবে পেল না। আস্তে আস্তে সে নিজের ঘরে ফিরে এল। পালঙ্কের ওপর পড়ে গেল। যেন সে অচৈতন্য হয়ে গেছে। কিন্তু ধোবী এ-ও বুঝতে পারল না যে, ঠাকুমা অনেকক্ষণ থেকে ঘরে বসে মালা জপছেন।

ঝড় উঠেছে ধোবীর মনে। ভয়ংকর ঝড়। দুঃখ, অভিমান, রাগ— তার ছোট্ট মাথাটা যেন চুরমার করে দিচ্ছে। টিমি কেন এ-সব কথা

মাকে বলে দিল? টিমির সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব। শেষে টিমিই বদনাম দিল কেন? এই-সব ভেবে ধোবীর অত্যন্ত দুঃখ হল।

সে কী এমন করেছে?— ধোবী ভাবল। গরীব মানুষ সনিয়াকে সাহায্য করতে তার বাড়িতে গিয়েছিল। শিবরাত্রির সমস্ত ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। তার বিশ্বাস হল না যে, এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সনিয়ার মুখটা ভেসে উঠল সামনে। লজ্জায় সে কিছু বলে নি। সনিয়া তার হাত ধরেছিল। সনিয়া কি বলেছিল আর সে কি উত্তর দিয়েছিল— ভেবে ভেবে ধোবীর মাথা ঘুরতে লাগল।

ধোবী দেখল, একটা বড়ো ভুল সে করেছে। মনের উচ্ছ্বাসে অন্ধ হয়ে সনিয়াকে সে সাহায্য করতে গেছে। তার মনে সে আগামী সুখের আশা জাগিয়েছে। এই আশায় সনিয়া পাগল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে রক্ত জল করে খাটছে। অনেক দুঃখ, অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। তবু সে কিছু গ্রাহ্য করছে না। সে বড়োলোক হতে চায়। বড়ো হবার পাগলামিই তাকে হাড়ভাঙা খাটতে বাধ্য করেছে।

কেন যে ধোবী সনিয়াকে সাহায্য করল— সে তা জানে। মনের উত্তেজনাতেই সনিয়াকে সাহায্য করে নি সে। সনিয়াকে সে ভালোবাসে। যখন দুজনে একসঙ্গে খেলাধুলো করত, সেই ছোটো-বেলা থেকেই সনিয়াকে তার ভালো লাগে। ছোটোবেলা থেকেই সনিয়াকে সে ভালোবাসে।

কিন্তু এখন? এখন যে ধোবী নায়ক-বাড়ির বিধবা বৌ হয়ে গেছে। এখন সনিয়াকে ভালোবাসার তার কি অধিকার আছে?

ধোবী ভেবে দেখল, সনিয়ার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাওয়া উচিত। তার মন থেকে সনিয়ার সব চিন্তা মুছে যাওয়া চাই— চিরদিনের জন্যে। রাস্তার ধারে হাজার হাজার অনাথ পড়েছিল। তাদের মধ্যে সনিয়া একজন। ধোবী তাকে বাঁচিয়েছে। আজ সে জগতের লক্ষ লক্ষ গরীবদের মধ্যে বাস করছে। ধোবী তাকে সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করেছে। এবার তার নিজের রাস্তা দেখা উচিত। নিজের ঘর-সংসার করুক সে। ধোবীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

ধোবী বিছানা ছেড়ে উঠল। ঠাকুমা কি-যেন বলছিলেন। সে তবু খেয়াল করল না। সোজা বাইরে চলে গেল।

বাইরে মা দাঁড়িয়েছিলেন। সামনে চন্দরা দাঁড়িয়ে। একটু গলা তুলে বলছে— মা, সনিয়ার দেমাক কিছু কম নয়। আমি ওকে ডাকলাম। আপনার কথা বললাম। কিন্তু শুনলে তবে তো! চটে গিয়ে বলল— চন্দরা, যা গিয়ে বল যে, আমি চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়ি যাবনা। আমি গরীব ঠিকই। কিন্তু আমি এখনো মানুষ। ঠাকুর যখন প্রাণ রেখেছেন, ঘাম ঝরালে পেট ভরে খেতেও দেবেন। স্বাঁই বাড়ি থেকে আমাদের ভিক্ষে জোটেনি, আমাদের লঙ্গরখানায় খেতে হয়েছে। অনেকে মারা গেছে। স্বাঁইবাড়িতে গিয়ে বাপঠাকুর্দার জমি ফেরত চেয়েছি। উনি রাজী হননি। আবার কেন যাব ওঁর বাড়ি?

মা বললেন— বলনি আমি ডেকেছি···।—হ্যাঁ, বলেছি। সে বলল —চিন্তেই স্বাঁইয়ের বৌয়ের তাঁর বাড়িতে অধিকার আছে, বাইরে নয়। কখনো তো তিনি আমার প্রতি মমতা দেখাননি? আজ কেন তাঁর কাছে যাব? যা গিয়ে বল, আমি গরীব বটে, কিন্তু মহাদেব ঠাকুরকেও ভয় করিনা। যদি মরি, তবে নিজের মাথা উঁচু করে মরব।

চন্দরার মুখে সনিয়ার কথা শুনে ধোবী খুশি হল। সে জানত, সনিয়া ভাঙে তবু মচকায় না। প্রেম-ভালোবাসাতে বিকিয়ে যাবে। কিন্তু কারো চোখ রাঙানিতে ভয় পাবেনা। সমস্ত গাঁয়ে তো একটাই মানুষ— সনিয়া! বাকী যারা আছে, পশুরও অধম।

—মা! —মায়ের কাছে গিয়ে ডাকল ধোবী।

—কি রে?— মা ঘুরে তাকালেন।

—আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, মা!

—কি ব্যাপার?

ধোবী চন্দরাকে বলল— চন্দরা ভাই, একটু হরি মহান্তিকে ডেকে দেবে? দরকারী কাজ আছে।

কি করবে চন্দরা? একটু দ্বিধায় পড়ল। কিন্তু ধোবীর মা-ও হরি মহান্তিকে ডাকতে বলেছেন।

সে চলে গেল। ধোবীর মা কিছু একটা ভেবে জিজ্ঞেস করলেন —হরি মহান্তিকে ডেকে পাঠালে কেন?

ধোবী বলল— কাল সকালে দুর্গাপুরে যাব। শ্বশুর মশাইয়ের প্রথম পুণ্য তিথি-পালন করতে হবে। আমি না গেলে, এ-কাজ কে করবে?

ধোবীর মা দীর্ঘশ্বাস নিলেন।

কাকা কাকীমা আর বাড়ির সবাই দুর্গাপুরে না-যাবার পরামর্শ দিলেন। ধোবী কারো কথা শুনল না। সে নিজের সিদ্ধান্ত সবাইকে শুনিয়ে দিল যে, দুর্গাপুরে যাবে, পুণ্যতিথির কাজকর্ম ওখানে নিজে সে পালন করবে।

ধোবীর মনের কথা কেউ বুঝতে পারল না। চিন্তেই স্বাঁই ভাবলেন যে, ধোবী তার মায়ের পরামর্শে দুর্গাপুরে যাবার জেদ ধরেছে। পোষ্যপুত্র নেওয়ার যে ব্যবস্থা চলছে, তা ব্যর্থ করার জন্যে এমন করছে। যে মেয়ে বাবা-কাকার সামনে স্পষ্ট করে কথা বলার সাহস পর্যন্ত করত না, আজ তার এত মনের জোর হল কি করে? এর পেছনে তার মায়ের চক্রান্ত আছে।

কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। স্রোতের জল আটকাতে বাঁধ দেন না। জলটা ছেড়ে দেন আর তাকে নিজের কাজে লাগাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ধোবীর জেদের ব্যাপারে তিনি কোনো রকম ব্যাকুলতা দেখান নি। তিনি ভাবলেন, ধোবী যা চাইছে করুক। হাজার হোক, নায়ক পরিবারে সে ছাড়া আর আছেই বা কে?

স্বাঁই বললেন— ধোবীকে যেতে দাও। ওর সঙ্গে ওর মা আর কাকা-ও যাবে। হরি মহান্তি তো আছেনই। ধোবীর ইচ্ছে মেনে কাজ হবে। খরচ যা হবে, হতে দাও। ধোবীর মনে দুঃখ যেন না

হয়। হ্যাঁ, কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

দুর্গাপুরে পুণ্য তিথি পালন করা হল। ব্রাহ্মণ, কাঙালী আর-সব লোকে খেতে পেল। তিন দিন ধরে সারা গাঁয়ে ধূমধাম হল।

সবাই বিষ্ণুপুরে ফিরে এল। কিন্তু ধোবী ফিরল না। কিছুদিন পরে চিন্তেই স্বাঁই স্বয়ং দুর্গাপুরে গেলেন। ধোবীকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু তাঁর কথা সে শুনল না। তার জেদ, দুর্গাপুরেই সে আরো কিছুদিন থাকবে, জমিজমার অবস্থা দেখবে। চিন্তেই স্বাঁই বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন। ধোবীর মা সোমত্ত মেয়েকে দুর্গাপুরে একা ছেড়ে-যাওয়া উচিত মনে করলেন না। তিনিও দুর্গাপুরে থেকে গেলেন।

ফেরার আগে চিন্তেই স্বাঁই হরি মহান্তিকে বললেন— সাবধান! ধোবীর বয়স কম। ওর কথায় তাড়াহুড়ো করে কাজ করবেন না। আমার কাছে খবর পাঠাবেন।

হরি মহান্তি এ-ব্যাপারে একমত। চিন্তেই স্বাঁই ফিরে গেলেন।

স্বাঁই বাড়ি থেকে সনিয়া নিরাশ হয়ে ফিরেছে। সে ভাবল, জমিদার শিব ছোট রায়ের কাছে আরেকবার যায়, তহশীলদার গোবিন্দ প্রধানের সাহায্যে আর্জি জানায়। বিষ্ণুপুর গাঁয়ে জমিদারের অনেক জমি আছে। লোকে তাতে চাষবাস করে। ভগবান করুন, তারও ওই রকম— কিছু জমি জুটে যায়। দু-চার একর পেলে তার কাজ চলে যাবে। মহাদেব মন্দিরের কাছে যে পুকুর আছে, তারই সঙ্গে পাঁচ-দশ একর ঢালু জমি। যদি হয়, সেই জমির কিছুটা পাট্টায় নিয়ে নেবে। বাপ-দাদার মতো সে-ও জমিতে খাটবে।

ছাগল দুটোকে চরতে ছেড়ে দিয়ে, ঘরে তালা লাগিয়ে সোজা নিমপুরে গেল সনিয়া— সেখানে জমিদার থাকেন। গোবিন্দ প্রধানের পায়ে পাঁচটা টাকা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সে। গোবিন্দ প্রধান হেসে বললেন— কি ব্যাপার, বাবা? কি হল? স্বাঁইমশাই

কি বললেন ?

সনিয়া সব-কিছু জানাল। নিমপুরে আসার কারণটাও বলল। আরেকবার প্রধানের পা ছুঁয়ে বলল— প্রধান মশাই ! অ্যাপনি সাহায্য না করলে আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাব। কেন পড়ে থাকব এখানে ? মজুরী করে যদি পেট চালাতে হয়, তাহলে এই পৃথিবীতে অনেক জায়গা পড়ে আছে। জমিদারের কিছু জমি অকারণে পড়ে আছে। চাষ করার অনুমতি পেলে কি আমি আপনার বাড়িতে মোটে খালি হাতে আসব ? জোঁক-সাপে ভরা পাশে একটা পুকুরও আছে। আপনার অনুমতি পেলে তার জল জমিতে ব্যবহার করব। একটু তো দয়া করুন, প্রধানমশাই !

সনিয়ার বক্তব্য খুব মন দিয়ে শুনলেন প্রধান। তিনি কাগজ-পত্র বের করে দেখলেন। বললেন— ওরে সনিয়া ! জমি যে বারো একর আছে। পুকুর দেড় একর। জমিদার কি তোর কথা শুনবেন ?

—শুনবেন কি না সে আপনি জানেন।

—সেলামী কত দিবি ?

—যা আপনি ঠিক করবেন। —ঢোঁক গিলে বলল সনিয়া।

প্রধান একটু চিন্তা করে বললেন— বারো একর জমির বারো দুগুণে চব্বিশ টাকা। দেড় একর পুকুরের জন্যে পনেরো টাকা। কেরাণীর খরচ, জমিদারের দস্তখতের খরচ ইত্যাদি সব মিলিয়ে উনষাট টাকা হচ্ছে। মাত্র এই ক'টা টাকার বন্দোবস্ত কর আর পাট্টা নিয়ে যা। এ ছাড়া অনাবাদী জমির খাজনা একর প্রতি এক টাকা।

সনিয়া বলল— প্রধানমশাই ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করি। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

প্রধান বললেন— আচ্ছা, তুই আজ বাড়ি যা। টাকা নিয়ে আসিস। জমিদারকে আমি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কথাটা পাকা করে নেব। একবার যদি না বলে দেন, তাহলে হ্যাঁ বলানো শক্ত হবে।

—কবে আবার আসব ?

—দু'দিন পরে। তাড়াহুড়োতে কাজ পণ্ড হবার ভয় আছে। সময়

বুঝে ঠিক তোর ব্যাপারটা বলতে হবে। বুঝলি ?
সনিয়া প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এল।

দুটো দিন যেন দু'বছরের সমান মনে হল সনিয়ার। বাড়িতে তার মন বসছেনা। মহাদেবের মন্দিরের কাছে যে পুকুর আছে, সেখানে চলে গেল। বহুদিনের পুকুর। ভগবান জানেন কে কাটিয়েছিলেন। সারানোর অভাবে মজে গেছে। পুকুরে জল খুব কম। সনিয়া ভাবে, জমিদার যদি পুকুরটা তার নামে লিখে দেন, তাহলেও আবার ওটা কাটাবে।

পুকুরের পাশে ঢালু জমি পড়ে আছে। শেয়াল-খ্যাঁকশেয়ালের আস্তানা। কাঁটা-ঝোপ সেখানে। গাঁয়ের লোকে পোষা জন্তু-জানোয়ার মারা গেলে ওখানেই ফেলে আসে। সনিয়া হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ঝোপ কেটে, জঙ্গল পরিষ্কার করে ঢালু জমি সমান করবে। পুকুরের জল তুলে ক্ষেত সবুজে ভ'রে তুলবে। নিজে সে চাষার ছেলে। মাটির আহ্বান সে নিশ্চিত শুনতে পাবে। নিরাশ কেন হবে সনিয়া ?

সনিয়া ঝোপের কাছে গেল। জমিও পরীক্ষা করে দেখল। চারদিকে চোখ বোলাল। দেখল, ঢালু জমির সামান্য দূরে ভালো জমিও আছে। কিছুদিন আগে বহুলোক এ জমির মালিক ছিল। কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই সব জমি আত্মসাৎ করেছেন। যারা হালের সাহায্যে জমিতে সোনা ফলাত, সেই চাষীরা কোথায় আছে, ভগবান জানেন। যারা ফিরে এসেছে, চিন্তেই স্বাঁইয়ের জমিতে মজুরী করছে। এমনও কিছু লোক আছে যারা চাষের অর্ধেক চিন্তেই স্বাঁইকে দেয়। স্বাঁই ঘরে বসে পরের ফসলে নিজের ভাঁড়ার ভরছেন, পরের টাকায় বড়োলোক হয়েছেন। সনিয়া চিন্তেই স্বাঁইয়ের চাকর নয়। সে ফসল নিজের ঘরে তুলবে।

সনিয়া একমনে জমির দিকে তাকায়। জমিদার যদি একটু সহানুভূতি দেখান, এই-সমস্ত জমি তার হয়ে যাবে। হাল-চাষ করে সোনার ফসল ফলাবে, টাকা বাড়াবে আর ভবিষ্যতে আরো জমি

কিনবে। সে ও বড়োলোক হবে। কিন্তু তারপর ধোবী হবে তার আপন। ধোবীর টাকাতেই সে জমি কিনছে। কিন্তু তারপর সে রক্ত জল করে পরিশ্রম করে সোনা ফলাবে।

দু-দিন পর—

সনিয়া টাকা নিয়ে জমিদারের কাছে গেল। সেদিন গোবিন্দ প্রধান তার কাজে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। সন্ধে অবধি সে না-খেয়ে বসে রইল। সন্ধেবেলা প্রধান এসে বললেন— তোর কপাল মন্দ, বাবা! আমি তোর হয়ে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু উনি শুনলে তবে তো! বললেন, জমি তো খারাপ নয়। লোকে এখন নিতে আসছে। পড়ে থাকতে দাও। ওর দাম বাড়বে।

সনিয়ার মনে হ'ল যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বলল— শেষটায় কি হল?

—আরে তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? একটু সবুর কর। জমিদার বোধহয় একটু বেশি চাইছেন। যদি দশ-পঞ্চাশ টাকা বেশি নেন তো নিতে দে। তবু জমি তো আমাদের হাতে আসুক। কি বলিস?

সনিয়া মাথা নাড়ে।

প্রধান আবার বলেন— আচ্ছা, সনিয়া, শ'খানেক টাকার ব্যবস্থা করতে পারবি?— আমি তো সঙ্গে এনেছি— একশো টাকা। —বাঃ! এই তো বুদ্ধিমানের মতো কাজ। আমি জমিদারকে আবার বোঝাবো। তুই কাল এসে পাট্টা নিয়ে যাস। বুঝলি?

সনিয়া একশো টাকা প্রধানের হাতে তুলে দিল। কিন্তু তার খুব কষ্ট হল। কে জানে, কি হবে? গোবিন্দ প্রধান কি করবেন? সত্যিই পাট্টা করিয়ে দেবেন কি না! সনিয়া যে বিশ্বাসের সঙ্গে একশো টাকা তুলে দিয়েছে। পরের দিন প্রধানের কাছে গেল। কিন্তু প্রধান বাড়ি ছিলেন না। খাজনা আদায় করতে ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছিলেন। সনিয়া ফিরে এল। দিন-দিন তার উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল।

সনিয়া বারে বারে প্রধানের বাড়ি যেতে লাগল। একদিন তাঁর দেখা পেয়ে গেল। দোল আসছে। সেদিন ত্রয়োদশী তিথি ছিল।

জমিদারের দপ্তর বন্ধ। অন্যরা সবাই ছুটিতে গেছে। কিন্তু গোবিন্দ প্রধান হলেন রীতিমত বিশ্বাসী তো! তিনি জমিদারের কাছেই থাকতেন।

সনিয়াকে দেখে প্রধান হেসে বললেন— তোর কাজ হয়ে গেছে, সনিয়া! এবার আমার দোলের খরচ দিবি কি না?

সনিয়া স্বস্তিতে দম ফেলল। বলল— প্রাধনমশাই, সব পাবেন। আমি যে আপনার প্রজা হয়ে গেলাম। আমি চিরকালের জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রধান খুব খুশি হলেন। ভেতরে গিয়ে পাট্টার তিনটি কাগজ এনে সনিয়াকে দিলেন। বললেন — দু-জাতের ধানী জমির জন্যে দুটো আর পুকুরের জন্যে একটা সাকুল্যে তিনটে পাট্টা জমিদার দিয়েছেন। আগে যারা চাষ করত, তারা জমিদারের ভাগ ঠিকমত দিত না। তুই যদি খেটে জমিদারকে খুশি করতে পারিস, তাহলে তুই-ও বড়োলোক হয়ে যাবি। বুঝলি?

সনিয়ার মনে হ'ল যেন সে আকাশের চাঁদ পেয়েছে। সে যত্ন করে কাগজপত্রগুলো নিল। প্রধানকে প্রণাম করে বলল— প্রধান মশাই, আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রধান তার মাথায় হাত রেখে বললেন— এবার যা, নিজের কাজে লেগে পড়!

জমিদার সাহেব যখন পাশা খেলছিলেন, প্রধান অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে এই পাট্টাগুলো তাঁর কাছে নিয়ে যান আর তাঁর সই করিয়ে নেন। সনিয়া যে টাকা দিয়েছিল, তার একটা পয়সাও জমিদার পাননি।

সনিয়া খুশি হয়ে বাড়ি ফিরল। জমি ঢালু ধরণের হ'ল তো কি হয়েছে? জমি তো বটে। সনিয়া দেখল, ও প্রায় বিশ একর জমির মালিক। গাঁয়ের আর সবাইয়ের সঙ্গে সে-ও আজ সমানভাবে দাঁড়াতে পারবে। এবার সে চিন্তেই স্বাঁইকে কেন ভয় করবে?

সম্পত্তির নেশা পেয়ে বসল তাকে।

দোল এল আর চলে গেল। সনিয়া তা জানিতেও পারল না। দিন-রাত ভেবেছে, হাল দিয়ে জমি সমান করবে, বেশি বেশি ধান মজুত করবে। বেশি টাকা রাখা যে মুশকিল। এত বড়ো জমিতে সে কি একা চাষ করতে পারবে? দরকার হলে একটা লোক রাখতে হবে।

সনিয়া বলদ কিনল। অন্য গাঁ থেকে ভুষি আনল। মজুর লাগিয়ে নিজের কাজ শুরু ক'রে দিল। এবার গাঁয়ের লোকের চোখ খুলল। আরে! —লোকে বলতে লাগল— ব্যাপারটা কি? সনিয়া পয়সা পেল কোথায়? মহাদেব পুকুর পরিষ্কার করাচ্ছে। জমিদারের জমি পরিষ্কার করে আল দিচ্ছে, ব্যাপারটা কি?

দোলের প্রায় বিশদিন পরে। খুব ভোরে চন্দরা ক্ষেতের দিকে গিয়েছিল। দেখল, সনিয়া জমিদারের অনাবাদী জমিতে হাল চষছে। দুজন মজুর মাটি তুলে ফেলছে। সকাল বেলাতেই সবাই ঘামে নেয়ে গেছে। চন্দরা জিজ্ঞেস করল— সনিয়া ভাই! সকাল সকাল জমিদারের জমি কাটছ কেন?

সনিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। কপালের ঘাম মুছে বলল— ভাই, আমি জমিদারের থেকে এই জমি নিয়েছি। জমি ঢালু তো। হাত খানেক জমি কাটলে পাঁচ গুণ্ঠ জমি হয়ে যাবে। এতে বেগুন লাগাব, বুঝলে?

চন্দরা পুকুরের দিকে দেখল। বাঃ! কত পরিষ্কার হয়ে গেছে। চন্দরা জিজ্ঞেস করল— কি, পুকুরটাও নিয়েছ তুমি?

মাটি কাটতে কাটতে সনিয়া বলল— হ্যাঁ, ভাই। জমিদারের দয়া। ভেবেছি, পুকুরের মাঝখান থেকে কাদা তুলে ওপর দিকে ঢেলে দেব। এতখানি পুকুর রেখে বাকীটা জমি তৈরী করে নেব। পুকুরের কাদা দিয়েই জমি তৈরি হয়ে যাবে। নতুন জমিতে কলার চাষ করব। তোমাদের বাগান থেকে কিছু কলার চারা পাওয়া যাবে তো?

চন্দরা বলল— আরে আমাদের বাগান থেকে যত চাও নিয়ে এসো। বাবা তো কলার চারা তুলে তুলে ফেলে দিচ্ছে। সনিয়া

ভাই, তুমি খুব ভালো করেছ। এই পুকুরের জমি আজ অবধি কারো নজরে পড়েনি। ঠিকমত খাটলে এর থেকে তুমি সোনা পাবে— সোনা!

নায়ক বাড়ীর বৌ ধোবীর প্রশংসা শুধু শুধু দুর্গাপুরে নয়, এমন-কি আশেপাশের সব গাঁয়েতেই হয়েছে। লোকে এমনও বলেছিল যে, নায়ক বাড়িতে ধোবী আসতেই সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। বাড়ির সবাই মারা গেল। কিন্তু এখন লোকের মুখে শুধু ধোবীর প্রশংসাই প্রশংসা। এখন লোকে বলে, ধোবী হ'ল বাড়ির লক্ষ্মী। চিরটাকাল কি কেউ বেঁচে থাকবে? যে গরীবের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করতে পেরেছে, সে তো মানুষ নয়, দেবতা।

দুর্গাপুরে পৌছনোর পর ধোবী তার শ্বশুর, শাশুড়ী আর স্বামীর শ্রাদ্ধকর্ম করল। সে বিষয়-সম্পত্তির কাগজপত্র দেখতে লাগল। হরি মহান্তি তো প্রথম প্রথম মহানন্দে খাতাপত্র দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর আনন্দ বেশিদিন থাকল না। তিনি দেখলেন, ধোবী ধীরে ধীরে মনোযোগের সঙ্গে খাতাপত্র দেখছে। তাকে উল্টোপাল্টা বোঝানো সম্ভব নয়। বয়স অল্প হলেও তার বুদ্ধি কম নয়। জমি ও জমিদারির সব খাতাপত্র ধোবী নিজের কাছে রেখে দিল। তার উদ্দেশ্য যে কি, হরি মহান্তি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা শিগগীরই প্রকাশ হয়ে গেল।

একদিন ধোবী হরি মহান্তিকে ডেকে বললেন— মেশোমশাই! গত পাঁচ বছরে টাকা-পয়সা বা ধান যাদের ধার দেওয়া হয়েছে, তাদের একটা তালিকা তৈরি করবেন।

হরি মহান্তি বললেন— তালিকা তো তৈরি আছে। কিন্তু তালিকা দিয়ে কি হবে, মা?

—আমার দরকার আছে— ধোবী বলল।

হরি মহান্তি বললেন— আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দু-তিন দিনের মধ্যে একটা নতুন তালিকা তৈরি করে দেব।

হরি মহান্তির মনে সন্দেহ হল। তিনি ভাবলেন, চিন্তেই স্বাঁইয়ের কাছে খবর পাঠাবেন। আবার ভাবলেন— হাজার হোক আঠারো বছরের মেয়ে তো। কি আর করতে পারবে?

তালিকা তৈরি হয়ে গেল।

ধোবী একবার হরি মহান্তিকে ডেকে বললেন— মেশোমশাই! এই তালিকায় যাদের যাদের নাম আছে, সবাইকে ডাকুন। আমি সকলের সঙ্গে একটু কথা বলব।

হরি মহান্তি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন— কিন্তু তারা কি মোটে বেঁচে আছে। আকালে ঘর-দোর ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোথায় রাস্তার ধারে পড়ে মরে গিয়ে হবে। —কিন্তু কেউ তো ফিরেছে। যাদের বাড়ির কেউ ফিরেছে, তাদের খবর দিন। যাদের কেউ নেই, তাদের অন্য তালিকা তৈরি করুন।

—কিন্তু কেন, মা?

—দরকার আছে।

ধোবীর গলায় দৃঢ়তা আর কঠোরতা। হরি মহান্তি ভয় পেয়ে গেলেন। অনেক ভেবেচিন্তে পাঁচ-ছ' জনকে খবর পাঠালেন।

একদিন ধোবী সেই ঘরে এসে বসল, যেখানে বসে তার শ্বশুর স্বামী আরো অনেকে বসে জমিদারির কাগজপত্র দেখতেন। যোগিনীর মতো ধোবীর পোষাক। কিন্তু তার মনে লজ্জা বা ভয় নেই।

অনেক লোকেরা এল। তাদের সঙ্গে কথা বলল ধোবী। তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ জিজ্ঞেস করল। সবাই এ-কথা বলল যে, আকালের জন্যে তারা গাঁ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কত আর সহ্য করতে পারত পেটের ক্ষিদে? বাড়ি ছেড়ে যারা চলে গিয়েছিল, তাদের অনেকে ক্ষিদের জ্বালায় মারা গেছে। যারা গাঁয়ে ফিরল, তাদের বাঁচার আশ্রয় কোথায়? তারা হরি মহান্তিকে জমি বেচে যা পেল, তাই দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এখন তারা পরের মজুরী করছে। নিজেদের বাড়িতে নেই, গাছের নীচে কুঁড়ে তৈরি করে আছে।

ধোবী যখন লোকেদের এই বেদনাময় কাহিনী শুনছিল, তার

সামনে সনিয়ার ছবি ভেসে উঠল। সনিয়া গরীব হলেও, এ ব্যাপারে একা নয়। এমন হাজার হাজার লোক আছে, যারা প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরেছে। ধোবী তার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীকে হারিয়ে এদের সবাইকে পেয়েছে। এরা সবাই তার আপন। তার যত ক্ষমতা আছে, সমস্ত দিয়ে এদের সবার বাঁচার ব্যবস্থা করবে। একদিন এদের সব-কিছু ছিল। কিন্তু আজ কিছু নেই। আজ মানুষের সমাজে থেকেও এরা নিজেদের মনে করছে একা। তবু তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা সে করবে।

ধোবীর চোখে জল এসে গেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল— দেখো মা, কত অসহায় এরা! ভগবান কত কঠোর হয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা কি জেনেশুনে এতটা কঠোর হতে পারব? হাজার হোক, আমরা মানুষ— গাছ বা পাথর নই। এত বড়ো বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কি করব? একটাই তো পেট আমার। এটা কি ভরবে না?

ধোবীর প্রস্তাবে তার মা একমত হলেন। সে হরি মহান্তিকে ডেকে বলল— যাদের জমি কেনা হয়েছে, ফিরিয়ে দিন। দলিলপত্র ফেরত দিয়ে দিন।

মহান্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এ কি হচ্ছে? মনে খুবই সন্দেহ হল। ভাবলেন, কিছু করা উচিত। কিন্তু কার কাছে নালিশ করবেন? ধোবী যে গিন্নী। ধোবী গাঁয়ের ওঝা, সাহু, মহাপাত্র, কাণ্ডী আরো অনেককে ডেকে দলিলপত্র সই করে ফেরত দিয়ে দিল। বলল— এখন থেকে আপনাদের জমি আপনাদেরই হয়ে গেল। নিজেরা চাষ-আবাদ করে খান। দরকার হলে হরি মহান্তির কাছ থেকে আরো কিছু ধান নিয়ে নেবেন। কোনো সুদ দিতে হবে না। ফসল হলে ফিরিয়ে দেবেন।

হরি মহান্তি হকচকিয়ে গেলেন। দেখলেন যে, সব-কিছু নয়ছয় হয়ে গেল। কত পরিশ্রম করে, কত কৌশলে তিনি জমি কিনেছেন। কিন্তু আজ নাবালিকা ধোবী সব উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি করতেই বা কি পারেন?

লোকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল— মা লক্ষ্মী এসেছেন, লক্ষ্মী! গরীবের দুঃখ আর কে বুঝতেন?

চারদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল নায়ক-বাড়ির বৌ জমি ফিরিয়ে দিচ্ছে। যাদের জমি নেই, তাদের কিছু জমি দিচ্ছে। দিন-চালাবার মতো ধানও দিচ্ছে। সত্যিই, ধোবী লোকের অবস্থা বিবেচনা করে জমি, ধান ইত্যাদি দিচ্ছিল। যারা জমি ফিরে পেল, তারা অত্যন্ত খুশি হল। কিন্তু যাদের জমি ছিল, তারা ধোবীর দুর্নাম করতে লাগল। বলল যে, নায়কের বৌ পাগল হয়ে গেছে। বাড়ির সম্পত্তি নষ্ট করছে।

সাতদিনেই সব জমি ফেরত দেওয়া হয়ে গেল। তবু ধোবীর বাড়িতে আবারও ভীড় লেগে রইল। লোকে নানা ধরনের আর্জি নিয়ে এসেছে। ভেবেছে, ধোবী তাদের চাহিদা পূর্ণ করবে।

খবর পেয়ে চিন্তেই স্বাঁই এলেন। হরি মহান্তির কাছে সব-কিছু শুনলেন। ধোবীর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ধোবী তাঁকে বোঝাল— যাদের জমি তাদেরই ফেরানো হয়েছে, বাবা। আমার তো আর কেউ নেই। একটাই পেটের জন্যে এত জমি নিয়ে কি করব? ওরা নিজেদের জমি পেয়ে সুখে ঘর-সংসার করুক— এই আমি চাই।

কিছুদিন আগের কথা, যখন চিন্তেই স্বাঁই সনিয়াকে জমি ফেরত দেন নি। বাড়ি থেকে তাকে বের করে দিয়েছেন। অপমান করেছেন। ধোবীর মিনতি শোনেন নি। —এই-সব চিন্তেই স্বাঁই ভাবছিলেন। সেদিন ধোবী আঘাত পেয়েছিল মনে। আজ তার প্রতিশোধ নিল।

সেদিন চিন্তেই স্বাঁই কিছু বলেন নি। পরের দিন তাঁর বৌকে ডেকে বললেন— এত বড়ো সম্পত্তি নয়ছয় হয়ে গেল। তার জন্য দায়ী কে? ধোবী তো ছেলেমানুষ। তুমি কেন ওকে বোঝাওনি?

ধোবীর মা বললেন— ছেলেমানুষ হলেও খুবই সাবধানী। এত বড়ো সম্পত্তি রাখবে কার জন্যে? কে খাবে? তুমি বলছ, ও পোষ্য নেবে। কিন্তু পোষ্য ছেলের ওপর কি ভরসা করা যায়? আমি বলি, একটা ভালো ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

—ওর-ও কি তাই ইচ্ছে আছে ?

—ওর ইচ্ছে অনিচ্ছেয় তোমার দরকার কি ? তোমার সঙ্গে সে ঝগড়া করছে না। ব্যাপারটা এই যে, ও যদি ঘর-সংসার না-ই করে, তাহলে জমি-সম্পত্তি রেখে যাবে কার জন্যে ? গরীবেরা জমি পেল, পালন-পোষণ করল, সুখে থাকল— এটাই তো ভালো।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— ধোবী বিয়ে করলে এই সম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার থাকবে না।

—তুমি তো সম্পত্তিই ভালোবাস ! আমি ভালোবাসি আমার মেয়ে ধোবীকে। সে যদি মজুরের হাত-ও ধরে, তবে সে-ই তাকে খাওয়াবে। সম্পত্তি দিয়ে কি হবে ?

চিন্তেই স্বাঁই আর কথা বাড়ালেন না। সেদিন দুপুরেই হরি মহান্তিকে ডেকে বললেন— পাল্‌কীর বন্দোবস্ত করুন। মা-মেয়ে দুজনেই কাল সকালে বাড়ি ফিরে যাবে।

—রাতে

চিন্তেই স্বাঁই ধোবীকে ডাকলেন। বললেন – এখানে আর বেশী দিন থাকা ঠিক নয়, মা। কাল সকালে আমরা বাড়ি ফিরে যাব।

ধোবী বলল— না, বাবা। এখানে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এখনো আমার অনেক কাজ বাকী আছে। সেগুলো শেষ না করে আমি কি করে যাই ?

—বিষ্ণুপরে থাকলেও কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে না। হরি মহান্তি সব-কিছু সামলে নেবেন।

—আমি যাব না, বাবা !

—যাবি না ? কিন্তু তোর মা তো যাবে। ওদিকে বাচ্চাদের অসুবিধে হচ্ছে। তুই এখানে একলা থাকবি কি করে ?

—হ্যাঁ, আমি একলা থাকতে পারব।

—ওরে, তা কি করে হবে ? তোর খুব অসুবিধে হবে।

—কোনো অসুবিধে হবে না, বাবা। এ যে আমার কর্মভূমি। যখন ছোটো ছিলাম, তখন আপনার কাছে আনন্দে দিন কাটিয়েছি।

এই বাড়িতে সাত পুরুষ ধরে আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী কাটিয়েছেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের জীবন এখানেই কেটেছে। পরের সেবা করতে করতে স্বামী ও শ্বশুরের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে এই বাড়িতেই। এ যে আমার তীর্থের সমান। এ হল জগন্নাথের মন্দির— মন্দির। এর চেয়ে বেশি সুখ আর কোথায় পাব? যেখানে তাঁরা পুড়ে ছাই হয়েছেন, আমি সেখানেই থাকব, সেই মাটিতেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নেব। এতে আমার শান্তি হবে, বাবা!

ধোবীর চোখে জল এসে গেল।

কিছুক্ষণ চিন্তেই স্বাঁই চুপ করে থাকলেন। নিজের মেয়ের কথা শুনে তাঁর মনে আঘাত লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি ভুল করেছেন। তাঁর স্ত্রী যা বলেছেন, তাই সত্যি। ধোবীর বিয়ে হয়ে গেলে, তার মনের এই চির-উদাসী ভাব আর থাকত না। কিন্তু সম্পত্তির কি হত? বাড়ির কোনো মেয়ে বা তার কোনো উত্তরাধিকারী দখল করে নিত। তাছাড়া স্বাঁই বাড়ির মেয়ে যদি বিধবা হবার পরে আবার বিয়ে করে, তাহলে বাড়ির কোন্ মান-সম্ভ্রম থাকবে? চিন্তেই স্বাঁই ভেবে দেখলেন যে, তিনি লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরতে পর্যন্ত পারবেন না। লোকে মুখের ওপর কিছু না বললেও পরে তো গুজব ছড়াবে— ক্ষতি করবে। তাছাড়া ধোবী হল বড়ো ঘরের মেয়ে— বড়ো ঘরের বৌ। বিধবা হবার পর সে কি পরের বাড়ি গিয়ে হেঁসেল ঠেলবে?

মনের দুর্বলতা লুকিয়ে চিন্তেই স্বাঁই বললেন— তোর অনেক সম্পত্তি। এই সম্পত্তি-তে অধিকার কায়েম রাখতে তোকে পোষ্য নিতেই হবে। মরার পরে পিতৃ পুরুষকে জল দেবে কে?

কিছুক্ষণ পরে ধোবী বলেছে— এত তাড়া কিসের?

—তাড়া তো করতেই হবে মা! অন্যের ছেলেকে আপন করা সহজ কথা নয়। ছোটোবেলার থেকে লালন-পালন করলে, তবেই এই বাড়ীর ওপর তার মমতা বাড়বে। তোরও তার ওপর ভালোবাসা বাড়বে। বিদেই তো তোর ভাই। তোরা দুজন একই রক্ত নিয়ে

জন্মেছিস। বাইরের কাউকে আনলে, মমতার বন্ধন যতটা হওয়া উচিত, ততটা দৃঢ় হবে না। বিদেই যদি তোর দত্তক পুত্র হয়, তোদের দুজনের বন্ধন অটুট থাকবে, মা!

ধোবী বলেছে— আপনি যা বলছেন তা ঠিক, কিন্তু আমাকেও ভাবার সময় দিন। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী মারা যাবার পর আপনি আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের জন্যে শোক করার সময়ও আমি পাইনি। তাঁদের কাজ শেষ হয়নি। আমাকে এখানে রেখে মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। যতক্ষণ তিনি আমার কাছে আছেন, দুঃখ যে কি আমি বুঝতে পারছি না। আমার কাঁদার সময় পর্যন্ত হচ্ছেনা, বাবা! আপনি আমাকে এখানে রেখে যান।

ধোবী তার বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। চিন্তেই স্বাঁই তার মাথায় হাত রেখে বলেন— মা! এত উদ্‌বিগ্ন হচ্ছিস কেন? তোর কথাই থাকবে। তোর মা আমার সঙ্গেই যাবেন। সাবধানে থাকিস, যেন বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হতে না পারে। সব সময় সেই দিকে নজর রাখিস। তুই জানিস না, সম্পত্তি করা কত কষ্ট সাধ্য। যারা সম্পত্তি করে তারা জানে।

ধোবী কোনো উত্তর দেয়নি। তার ধারণা, ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তকে যদি অন্ন দেওয়া যায়। যাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে— তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সম্পত্তি তাতে নষ্ট হয় না। যদি এতে কিছু নষ্ট হয়, তা হল মানুষের দম্ভ, আক্রোশ।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— কী নেই তোর? তোর কিসের অভাব? যাকে যে জমি ফিরিয়ে দেবার ছিল, ফিরিয়ে দিয়েছিস। গরীব, কাঙাল, ভিখিরির জন্যে মন্দিরে একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দে। এমনও হতে পারে যে, প্রতিদিন ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়ে যে আসবে, মন্দিরে সে খেতে পাবে। এত টুকুই করে দে, ব্যস! বাকী যা সম্পত্তি আছে, ঠিক ভাবে তার দেখাশোনা কর।

কিছুক্ষণ পরে চিন্তেই স্বাঁই আবার বলেছেন— ধোবী! এখনো তুই ছেলেমানুষ। মানুষকে তুই চিনিস না। মানুষ সরল প্রাণী নয়।

যার উপকার করবি সেই এসে তোর বুকে ছুরি বসাবে। দরদ দেখিয়ে যাদের তুই জমি ফেরালি, দেখিস ওরাই তোর ক্ষতি করবে। যা কিছু করেছিস, তা স্বাভাবিক নয়। এ যে পাগলামো। তোর এই ভালো কাজের জন্যে লোকে তোকে বোকা বলবে।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের কথা শুনে ধোবী কিছুই বলেনা। —সে জানে সে যা করেছে, তা ঠিক। তার জন্যে নিন্দা বা প্রশংসার আশা সে করে না। কে তার ক্ষতি করবে? ভালো বা মন্দ করার শক্তি মানুষের হাঁতে নেই। এই শক্তি ভগবানের হাতে। ভগবান চাইলে ভালোও করতে পারেন, মন্দও করতে পারেন। কি করতে পারে মানুষ? ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হবে, অন্য কারো নয়। মানুষের উচিত ভগবানের বিশ্বাস রেখে অন্যের সেবা করা। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা। মানুষের সেবা যে করে না, সে দেবদ্রোহী। তাকেই সইতে হয় দেবতার অভিশাপ।

ধোবী চুপ করে থেকেছে। কিছুক্ষণ পর চিন্তেই স্বাঁই বলেছেন— তুই যদি থাকতে চাস, কিছুদিন থাক তোর মা আমার সঙ্গে চলুক। হরি মহান্তি বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোক। ওঁর ওপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তুই ওঁকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করিস না। তাঁর কথা শুনে চলবি। আমি ভাবছি, বিদেইকে তোর কাছে রেখে যাব। তোর কাছে থাকলে ও খুব খুশি হবে। ও তোকে ভালোবাসে।

ধোবী হ্যাঁ না কিছুই বলেনি।

চিন্তেই স্বাঁই শেষে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজই করেছেন। পাঁচ বছরের ছেলে বিদেইকে তিনি ধোবীর কাছে রেখে গেলেন।

পাঁচ বছরের ছেলে বিদেই এসে ধোবীর কাছে থাকল। প্রথমে ধোবী খুশি হয়নি। তার মনে হল, বিদেইকে দত্তক নেবার ব্যাপারে এ-এক ছলনা। প্রথম প্রথম ধোবী তাকে এড়িয়ে যেত। কিন্তু বিদেই একটি নিষ্পাপ শিশু। তার কোমল মুখ, চঞ্চল চোখ বিদ্যুতের মতো উচ্ছলতা দেখে ধোবী দেখল সে কতই না ভুল করেছে। সে কাকে

এড়িয়ে যাচ্ছে ? একটি নিষ্পাপ শিশুকে ? বিদেই তো তার ভাই, তারই রক্তধারা ওতে ? কত আনন্দে খেলা করছে। হাত বাড়ালেই খিলখিল করে দৌড়ে আসে, কোলে লুটিয়ে পড়ে।

বিদেইকে ধোবী একমনে বার বার দেখে। তার নরম ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'দিদি' বলে যখন সে নেচে খেলে বেড়ায়, ধোবীর আনন্দ হয়। বিদেইকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার গালে চুমু খায়। তাকে কাঁধে নিয়ে আনন্দে নেচে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলও ফেলে।

ধোবীর একাকিত্বের একমাত্র সহায় বিদেই। ধোবীর একমাত্র বন্ধু সে। বাড়ীতে চাকর-বাকর আছে, তবু বিদেইকে ধোবী নিজে দেখাশোনা করে। নিজের হাতে তাকে খাওয়ায়-পরায়; কোলে ঘুম পাড়ায়। সারাদিন নানা ধরনের পোশাকে তাকে সাজায়, আর দেখে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বোঁজে। দেখতে দেখতে সে নিজেকেই ভুলে যায়। বুকের ভেতর অনুভব করে, মা হবার প্রবল বাসনা। বিদেইকে বুকে জড়িয়ে তার এই বাসনা ক্ষণেকের জন্য পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, ক্ষণেকের জন্য শুধু।

ধোবী শিউরে ওঠে। বুক কাঁপে তার। যেন তার অন্তর থেকে মাতৃসত্তা চীৎকার করে ওঠে: সৃষ্টির অধিকার আছে তার, স্বাভাবিক বাসনা তার সৃষ্টিতেই।

বিদেইকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে সে। তার চঞ্চল চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর এক অজানা আশঙ্কা জন্মেছে তার মনে। পুজোর ঘরে চলে এসেছে সে। দরজা বন্ধ করে রাধামাধবের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছে— চোখ বেয়ে ঝরে পড়েছে অশ্রু।

ধোবীর মনে পড়ে যায় তার স্বামীর কথা। তাঁর কাছে সে সমস্ত লজ্জা-সরম ভুলে স্বর্গ-সুখ পেয়েছিল। তার মনে মা হবার স্বাভাবিক ইচ্ছে জেগেছিল। তার স্বামী মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু-শোক এখন আর নেই। এবার সে অনুভব করছে, মা হবার বাসনা

তার অপূর্ণ থেকে গেল। মনের এই যন্ত্রনা তাকে অবিরাম কষ্ট দিচ্ছে। যন্ত্রনায় সে ছটফট করছে— ঠাকুরের কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলেছে।

গভীর ভাবে ভাবছে সে সনিয়ার কথা। কেটে-যাওয়া দিন-গুলোর কিছু ঘটনা তার মনে পড়ছে। শিবরাত্রির দিন নির্জন ঘরে তাকে ছুঁয়েছিল সনিয়া। সেই স্পর্শে ধোবীর হৃদয় কেঁপে উঠেছিল।

ধোবীর লজ্জা হয়। সে ভাবে, সনিয়ার মনে আনন্দ-বাসনা সে-ই জাগিয়ে তুলেছে— যা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। তার অনুশোচনা হয়েছে, শেষে কেন সে এমন করল? এই ভেবেই সে অস্থির হয়েছে। তার দরুণ ঘরে সে বেশিক্ষণ বসতে পারেনি। বাইরে বেরিয়ে এসে সে হরি মহান্তিকে ডেকে পাঠিয়েছে।

—পুকুর খোঁড়ার কাজ কতদূর হল?

হরি মহান্তি কোনো উত্তর দেবার আগেই তাঁর নজর পড়ে ধোবীর মুখের দিকে। ধোবী বুঝি কাঁদছে। মহান্তি ভাবলেন— কিসের আশঙ্কা তার মনে? কিছু বুঝতে না পেরে তিনি বললেন— 'কাজ তো চলছে'।

—মজুরদের ঠিকঠাক খাবার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, মা! মন্দিরে নতুন লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। ওখান থেকেই সব মজুরেরা খেতে পাচ্ছে। কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

—আমি নিজে দেখতে চাই।

ঘরের কাজ শেষ করে এখন ধোবী বাইরের কাজও দেখতে শুরু করেছে। লোকে কি বলবে, কি গুজব ছড়াবে— সেদিকে নজরই দেয়নি। সকাল-সকাল নিজের কাজ শেষ করে বিদেইয়ের দেখাশোনা করে, তাকে চাকরের কাছে রেখে সে বেরিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লোকের খবর নিয়েছে। গাঁয়ে কেউ অসুস্থ, কেউ উপোসী। এমন লোক আছে যাদের ঘরের চালা মেরামত হয়নি। অথচ প্রত্যেক বছর যা একবার করা উচিত। হাতে

পয়সা নেই বলে কারোর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। ধোবী সবার খবর নেয়। এছাড়া পুকুরের কাঁদা-পাঁক পরিষ্কার করানো, কুয়ো মেরামত করানো, গাঁয়ের কাদায় ভর্তি রাস্তা ঠিক করানো— এই ধরনের নানান কাজ ধোবীকে করতে হয়েছে।

কয়েক মাস পরে ধোবী গাঁয়ের সবাইকে আপন করে নিল। তার দৃষ্টিতে গাঁয়ের সবাই হল তার পরিবারের লোক। সে কারোর দুঃখ সহ্য করতে পারল না। গাঁয়ের লোকেও ধোবীকে আপন করে নিয়েছে। তার কথা সবাই শোনে। সবাই বিস্মিত হ'ল— এত অল্প বয়সে এত বুদ্ধি হল কি ক'রে?

নিষ্ঠার সঙ্গে ধোবী জীবন কাটাচ্ছে। গো-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখানো, দেবতার ভক্তি, জাতি-নিয়ম মেনে সবাইকার সঙ্গে উচিত ব্যবহার করা— সে তার কর্তব্য মনে করেছে। সে ভাবে, সমাজের মধ্যে উচ্চ-নিচ জাতি ভেদ, ধনী দরিদ্রের তফাত থাকা উচিত। তা না হলে সনাতন হিন্দুধর্মের কি মূল্য রইল? সবাই যদি সমান হয়, সবাই যদি সুখে থাকে, তাহলে লোকে শাস্ত্রের কর্মফল-নীতি মানবেনা। লোকে নীতি না মানলে, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্মের ভেদ পর্যন্ত থাকবে না। তাহলে সমাজও টি ঁকে থাকতে পারবে না।

ধোবী পুরাণ পড়েছে। ব্রাহ্মণের মুখে শাস্ত্র শুনেছে। একজন বিধবার যেমন থাকা উচিত তেমন ভাবেই থেকেছে। সবাইকে খোলামনে, মুক্ত হাতে সাহায্য করেছে। সবাইকে আপন ভেবেছে।

ধোবীর প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকে বলে— ধন্য ধোবী! কিন্তু হরি মহান্তি খুশী নন। তার মন ভেঙে গেছে। তিনি ভাবছেন, ঘরের পয়সা অযথা খরচ হচ্ছে, দিনের পর দিন সম্পত্তি কমে যাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে ধোবী ছেলে মানুষ। তিনি ভাবলেন, বয়স কম বলে ধোবী সব কথা ঠিকমত বুঝতে পারছেনা। কিন্তু তিনিও বোঝাবার সাহস পাচ্ছেন না। তিনি জানেন, বেশি বোঝালে ধোবীর মনে দুঃখ হয়। সে কাঁদে। ফলে, সম্পত্তি বেশি করে নষ্ট করার জন্য তার মনের জোর বেড়ে যায়। কখনো

কখনো সে ভেবেছে, গরীব মজুরদের ডেকে বিনা পয়সায় জমি দিয়ে দেবে। এ-সব কথা চিন্তেই স্বাঁইকে তিনি লিখতেও পারেন না। স্বাঁই মশাই বা কি করবেন? রাগে লাল হয়ে নিজেকেই গালমন্দ করে চুপ করে থাকবেন। আজকাল কার ছেলেমেয়েরা যা ভাবে, তাই করে। কারোর কথা মোটেই শোনে না।

এই কথা ভেবে হরি মহান্তি চুপ করে থাকলেন। কাউকে কিছু বললেন না।

একদিন পরিয়ার মা গাঁয়ে এল। পুনী তাকে ডেকে তার ভাই সনিয়ার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। শুনল সনিয়া জাতে ফিরেছে, বাড়ি তৈরি করেছে, মহাদেবের মন্দিরের কাছে জমিদারের জমি নিয়ে চাষ করছে। এখন তার কাছে অনেক মজুর কাজ করে। তার সনিয়া দাদা সুখেই আছে। সহোদর বোন পুনী এই গাঁয়ে রয়েছে। কিন্তু সে কখনো তার খবর নিতেও আসেনি।

পরিয়ার মা চলে গিয়েছে। ভাই সনিয়ার আর নিজের কথা সে ভাবে। ভাই জেনে শুনে তাকে ভুলে গেছে। ছোটো জাতে বাস করা আর মরে যাওয়া তো একই কথা।

সনিয়ার চোখে পুনী মারা গেছে। সনিয়া কখনো পুনীর নাম পর্যন্ত করে না। তার কথা ভাবেও না। তাহলে পুনী কেন সনিয়ার জন্য ভাববে? তাকে একটু দেখার জন্যে কেন ছটফট করবে? বিষ্ণুপুরে যেতে তার খুব ইচ্ছে হয়েছে। তার মনের কথা সে মধুয়াকে বলেছে। মধুয়া কিন্তু বারণ করেনি। তবু সে যেতে পারেনি। তার ভয় হয়েছে, যদি সনিয়া তাকে কিছু না জিজ্ঞেস করে, না ভালোবাসে, তাহলে সে কি করবে? গাঁয়ের লোকেও জিজ্ঞেস করতে পারে— পুনী! তুই অছুঁত বাউরীর ঘরে গেলি? কুয়ো বা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করলি না কেন? কি করবে? কাকে নিজের মুখ দেখাবে সে?

বহুবার ভেবেছে, লোকের নিন্দে থেকে বাঁচতে সে সত্যিই

আত্মহত্যা করবে। কিন্তু তা মনে হতেই তার বুক কেঁপে উঠেছে। খুব ভয় পেয়েছে। মধুয়ার সুন্দর মুখ— মজবুত শরীর— তার চোখের সামনে নেচে উঠেছে।

মধুয়াকে একা রেখে ও কি করে মরবে?

এখন মরতে পারে না পুনী। তার পেটে এখন মধুয়ার সত্তা। পুনীর মনে মা হবার কামনা বয়ে চলেছে। মধুয়াও তা জানে। ব্যাকুল হয়ে সে পুনীকে দেখেছে। তার চোখে চোখ রেখেছে। লজ্জায় পুনী মাথা নীচু করে নিয়েছে। উৎসুক হয়ে বোকার মতো মধুয়া কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে বসেছে। পুনী হেসেছে। কোন উত্তর দিতে পারেনি।

পুনী হাসতে হাসতে মধুয়ার সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। মধুয়াও আবার তার পেছনে ছুটেছে। আঁচল টেনে ধরেছে পুনীর। পুনী ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর। সত্যিই কত সুন্দর লাগে পুনীকে। এই সৌন্দর্য তো সে আর কোথাও দেখেনি। সময়ে-অসময়ে মধুয়া টেনে নিয়েছে পুনীকে নিজের কাছে!

পুনী মরবার চিন্তা ত্যাগ করেছে।

যেদিন থেকে ধোবী দুর্গাপুরে এসেছে, পুনী নায়ক-বাড়ির দিকে যায় না। তার খুব লজ্জা করে। গাঁয়ের অন্য লোকেদের কাছে সে ধোবীর প্রশংসা শুনেছে। শুনে তার খুবই হিংসে হয়েছে। যে ধোবী চিন্তেই সাঁইয়ের মেয়ে আর তার ছোটোবেলার সঙ্গী, সে-ই আজ লক্ষ টাকার গৃহিনী। আর সে··· ?

মধুয়াও গিন্নীমার প্রশংসা করেছে। পুনী সব শুনেছে। কিন্তু চুপ করে থেকেছে।

একদিন মধুয়া ধোবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দু-একর জমি চাইল। ধোবী অমত করল না। মধুয়া জমি পেয়ে গেল। চাষের জন্য দুটো বলদ পেল। ধোবীর বাড়ির অন্য চাকর-বাকরেরা অছুঁত মধুয়ার সৌভাগ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারা বলেছে— গিন্নীমা মধুয়াকে খুব পছন্দ করেন। ওর ওপর তাঁর খুবই মায়া— অটল বিশ্বাস।

এ কথা সত্যি। ধোবীর মধুয়াকে খুবই পছন্দ। তাকে বিশ্বাস

করে। সে বলে, মধুয়া অছুঁত বাউরী জাতের হলেও, তার মনে কিন্তু শক্তি আর সাহস আছে। মধুয়ার মনে দয়া, ধর্ম আর ভালোবাসা রয়েছে। রাস্তায় পড়ে থাকা এক অজানা মেয়েকে সে আশ্রয় দিয়েছে। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে সে একজন ভিখারিনীকে আপন করেছে। কারোর ঠাট্টার পরোয়া করেনি, হুমকির ভয় পায় নি।

প্রয়োজনে ধোবী মধুয়াকে ডেকে পাঠিয়েছে, বলেছে— ওরে মধুয়া! ধর্মশালার কাজ কি শেষ না হয়ে থেকে যাবে? আরো লোক চাই। বর্ষার দিন আসছে। কাঁচা ইঁট পড়ে আছে। খোলাতে না চড়ালে তো সব নষ্ট হয়ে যাবে।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না, মা-ঠাকররুণ! আমি সব ঠিক করে দেব। —মধুয়া বলেছে।

মধুয়ার মুখে 'মা ঠাকরুণ' শুনে ধোবী চমকে উঠত। পুনীর স্বামী মধুয়া। তার মজবুত শরীর, শক্ত-সমর্থ হাত দেখে ক্ষণেকের জন্যে ধোবী মুগ্ধ হত। পরে চোখ সরিয়ে অন্য কথা বলত।

মধুয়া খুবই পরিশ্রমী। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক— সে কাজে লেগে থাকে। ধোবী তা জেনে খুশি হয়েছে। ইঁট খোলায় আগুন পড়ল। ধর্মশালার ছাদ-গাঁথা হয়ে গেল। ধোবী যেদিকেই তাকায় দেখে, মধুয়া কাজ করেছে। একটুও আল্‌সেমি নেই তার। অন্য মজুরদের মতো বাজে কথায় সময় নষ্ট করে না। ঘেমে নেয়ে গেছে তার শরীর। ধোবী ভেবেছে, মধুয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাকে কাছে ডাকল— মধু! একটু এদিকে আয়।

ধোবী আগে আগে, পেছনে মধুয়া। ধোবীর হাত ধরে দৌড়চ্ছে বিদেই। ধোবী মুখ ফিরিয়ে দেখে বলল— আরে মধু! তুই সকাল থেকে তো কিছু খাসনি। কপাল থেকে ঘাম মুছে মধুয়া বলেছে— সকালে তো আমি কাল রাতের 'মাণ্ডিয়া'র রুটি খেয়ে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা ঠিক আছে। এই নে চারটে চাকলি পিঠে খেয়ে নে। —ধোবী তাকে পিঠে দিল।

ধোবীর 'চার' মানে গিয়ে দাঁড়ায় দশ কি বারো। পিঠেগুলো

সব কোঁচড়ে বেঁধে মধুয়া বেরিয়ে এল। কিন্তু খাবার আগে তার পুনীর কথা মনে পড়ল। কত সুস্বাদু খাবার। পুনীর মুখে একটু না দিয়ে কি করে খাই? পুনী যে আমার পথ চেয়ে আছে। আমার খাওয়ার আগে ও কখনো খায় না। এই নিয়ে কতবার ঝগড়া হয়েছে। বার বার বলা সত্ত্বেও পুনী খায়নি, অপেক্ষা করেছে।

--আরে মধু! পিঠেগুলো খেয়ে নে, ধুতিতে বেঁধেছিস কেন?—ধোবী ব'লল।

মধুয়া কোন উত্তর দেয় না। লজ্জায় মুখ নীচু করে নেয়।

—খেয়ে নে নারে। বাড়ী নিয়ে যাবি? আর কি নেই আমার বাড়ীতে? খেয়ে ফেল্। পেয়ে যাবি আরো।

মৃদু স্বরে মধুয়া বলে— আমি চান করিনি, মা!

ধোবী মধুয়ার মনের কথা বুঝতে পেরে ভাবে মধুয়া সত্যিই সুখী। বলেছে— হ্যাঁরে মধু! পুনী আমার কাছে আসে না কেন? ওতো আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওকে নিয়ে আসিস।

সমাজের কঠোর নীতি নিয়মকে ধোবী ভয় পায়। পুনীর সম্পর্কে বেশী কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না।

—মধু! তুই খুব গরীব। কাপড় নেই তোর। একটা ছেঁড়া ধুতি ছাড়া পরনেও আর কিছু নেই।

—আমি খুবই গরীব, মা ঠাকরুন! মজুরী করে আপনার থেকে যা পাই, তাতে পেট ভরে না। কাপড় কোত্থেকে কিনব?

—আচ্ছা, দাঁড়া!

ধোবী ভেতর থেকে একটা ধুতি আর শাড়ী নিয়ে এসে বলে—নে, একটা পুরনো ধুতি আছে, তুই পরিস আর এই পুরনো শাড়ীটা বৌকে দিস। ঠিক আছে?

মধু এতই কৃতজ্ঞ— এতই খুশী হল যে, ধোবীর পায়ে হাত দিয়ে বলল— মা ঠাকরুন, আপনি গরীবের মা।

ধোবী আর কিছু শুনতে চায়নি। তার চোখ জলে ভরে গেছে। সে ভেতরে চলে গেছে। অন্য চাকর-বাকরেরা হিংসে করেছে।

বলেছে— পুরনো বলে যে কাপড়গুলো দিয়েছে, তা মোটেই পুরনো নয়— একেবারে নতুন। জাতে নীচু বাউরী মধুয়াকে মা ঠাকরুন এত ভালবাসেন কেন? লোকে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছে। নানান কথা উঠেছে। সবার মনে সন্দেহ হয়েছে। মধুয়াকে এত পছন্দ করেন কেন? মধুয়া একজন সুন্দর তরুণ যুবক— এই জন্য কি?

মধুয়া পালিয়ে এসেছে বাড়ীতে। এসে দেখেছে পুনী গালে হাত দিয়ে এক দৃষ্টে তার পথ চেয়ে বসে আছে।

মধুয়াকে দেখে পুনী ঠিকই হাসল। কিন্তু অন্তর থেকে সে খুশী হতে পারে নি। সে জানে ধোবী তাকে জমি দিয়েছে, ধান দিয়েছে আরও অনেকভাবে সাহায্য করেছে। তার সংসারের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুনী খুব খুশী হতে পারেনি। মধুয়ার মুখে সে ধোবীর অনেক প্রশংসা শুনেছে। সে জেনেছে, মধুয়াকে ধোবী স্নেহ করে। এটা কি কোন আনন্দের কথা? পুনীর ইচ্ছে হয় মধুয়াকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়, অনেক দূরে, যেখানে ধোবী নেই।

ধোবী এ-গাঁয়ে অনেকদিন হ'ল এসেছে। সে প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে লোকের খবর নিয়েছে। বাউরী বস্তিতেও সে একদিন গিয়েছিল। কিন্তু ধোবীকে দেখেই পুনী কপাট বন্ধ করে ঘরে লুকিয়েছে। লোকে বলেও ছিল— এটা মধুয়ার বাড়ী। কিন্তু ধোবী একবারও তাকায়নি। সে এগিয়ে গেছে।

পুনীর দরজার ফাঁক থেকে দেখে চোখের জল ফেলেছে।

ধোবী কি পুনীর খবর পায়নি? নিশ্চয় পেয়েছে। কিন্তু লোকের ক্ষতির ভয়ে কিংবা ঘৃণায় সে পুনীর সঙ্গে দেখা করতে চায়নি। পুনী কি করে যাবে ধোবীর সঙ্গে দেখা করতে? আর কেনই বা যাবে? যদি যায়ও তাহলে তাহলে তার বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। ধোবীকে 'মা ঠাকরুণ' বলে ডাকতে হবে। এ সব কি পুনী করতে পারবে?

এই কারণে মধুয়া হাজারবার বলা সত্ত্বেও পুনী ধোবীর বাড়ী যায়নি। কোন একটা অজুহাতে বাড়ীতেই থেকে গেছে।

একদিন মধুয়া অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেছে— পুনী ! যেমন করেই হোক, তোকে কিছুক্ষণের জন্মেও যেতে হবে। 'মা ঠাকরুণ' সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসিস। লক্ষ্মী তুল্য দেবী উনি।

পুনীর বুকে কেউ যেন ছুরি বসিয়ে দিল। কিছুদিন আগের কথা তার মনে পড়ে যায়। চিন্তেই স্বাঁই জাতে ছোট। এই কারণে ধোবীকে পুনীর বাবা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হননি। এ যে সেই ধোবী ! মনে হয় এ যেন কালকের ঘটনা।

সেই ধোবীর সামনে পুনী একজন ঝিয়ের মত গিয়ে দাঁড়াবে ?

পুনী মধুয়াকে কোন উত্তর দেয় না। সে আবার ভাবে, চিরকাল এ সংসারে কার গর্ব থাকে ? যখন সময় আসে, পৃথিবী বদলে যায়। যার আশ্রয়ে পুনী বেঁচে আছে, সেই মধুয়া ধোবীর পা ছুঁয়েছে। বনেই পরিভার মেয়ে আর সনিয়ার বোনের মান-মর্যাদা নিয়ে সে আর এখন বেঁচে নেই। রাস্তার ধারে যে মরতে বসেছিল, সেই পুনী সে। অছুঁত মধু ভোই তাকে তুলে এনেছে ঘরে। সেই পুনীর কিসের সম্মান ? কিসের অভিমান ?

হ্যাঁ ! পুনী ভেবেছে, সে ধোবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

মধুয়া এ-কথা শুনে খুব খুশী হ'ল।

তিন বছর পরে—

ঈশ্বর জানেন, কবে শুরু হয়েছে এই সময় — বছর-মাস দিন-ক্ষণ ···আর কবে শেষ হবে··· ?

সত্যিই সময়ের কোন আদি-অন্ত নেই। মানুষের কল্পনাও ঐরকম অনন্ত। এই অনন্ত কল্পনায় ধূলিকণার মত অনেক পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় আর কল্পনার বিস্তারে শেষ হয়ে যায়। মহাকালের ব্যাপ্তিতে মানব-সভ্যতার ইতিহাস যেন দু-দিনের ঘটনা। এই হিসেবে তিন বছর তো কিছুই নয়।

কিন্তু সনিয়ার পক্ষে এই তিন বছর পার করা কম কথা নয়। সে ভেবে দেখল, বছরের প্রতিটি দিন তাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে।

রোদে বৃষ্টিতে তাকে ক্ষেতে যেতে হয়েছে। রাতের ঘুম অগ্রাহ্য করে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছে। গাঁয়ে দোল, দশহরা, রামনবমী, শিবরাত্রি— আরো অনেক পার্বণ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে। কিন্তু সনিয়া শুধু চাঁদা-ই দিয়েছে। সকলের আনন্দ-উৎসবে যোগ দেয়নি। তার যত সময় ক্ষেতে পরিশ্রম করে আর বলদগুলোকে খাওয়াতে— দাওয়াতেই কেটে গেছে।

পনের বছরের একটি অনাথ মুসলমান ছেলেকে সনিয়া তার বাড়ীতে জায়গা দিয়েছে। তার নাম রহিম। কলেরায় বহুলোকে মারা গেছে। সে একটা লাঠি ধরে এদিকে-সেদিকে ভিক্ষে করে বেড়াত। তার দুর্বল শরীরে সনিয়াই নতুন জীবন এনেছে। এখন রহিম সনিয়ার সবচেয়ে বিশ্বাসী চাকর। রহিম তার অবলম্বন আর বন্ধু। বিশু শামল সনিয়ার ঠিকে মজুর। প্রত্যেক বছর তারা উপরি ভাতা পায়— খুবই বিশ্বাসের সঙ্গে তারা কাজ করে।

রহিম আর বিশুকে নিয়ে সনিয়া তিনবছর ক্ষেতে কাজ করেছে। মহাদেব মন্দিরের পাশের জমি সে ওদের সাহায্যে চষে সমান করে ফেলেছে। এই জমি এখন বাগান হয়ে উঠেছে। বাগানে সব সময় কলা ফলে আছে। এ ছাড়া জমিতে আলু, বেগুন আর নানা ধরনের সব্জি ফলেছে। চিনে বাদাম আর তামাকও হয়েছে। নীচের জমিতে ধান। ভালো জাতের ধান হয়েছে তার জমিতে। লোকে সনিয়ার জমি ও বাগান দেখে হকচকিয়ে গেছে। আর বলেছে, সনিয়া মাটির বুক চিরে সম্পদ করেছে। এখন দশের জায়গায় বিশ একর জমি হয়ে গেছে তার।

কিন্তু এত জায়গা-জমি করেও সনিয়ার মনে সুখ ছিলনা। তার ভাবনা, সম্পত্তি নিয়ে সে কি করবে? যার জন্যে এত উপার্জন করছে, সে কোথায়? যারা দুর্গাপুর থেকে এসেছে তাদের অনেকের কাছে সনিয়া ধোবীর প্রশংসা শুনেছে। ধোবী মন্দির করেছে— গরীব নিরাশ্রয়দেব জন্যে আশ্রম তৈরী করেছে। ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছে, নিরাশ্রয়কে দিয়েছে থাকার জায়গা। আকালগ্রস্ত লোকেরা যারা

গাঁয়ে ফিরেছে, তাদের সাহায্য করেছে— অচ্ছুঁতকে সমাদর জানিয়েছে।

আকাল-পীড়িত অনেক লোক দুর্গাপুরে স্থায়ীভাবে বসতি করেছে। এদের কোন জাত বিচার ছিলনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, হরিজন— সবাই একই জাতের মানুষ হয়ে গেছে। লোকে পাছে এদের খারাপ নজরে দেখে— ধোবীর তাই এদের জন্যে খুবই মায়া।

ধোবী এদের কদর করেও সব সময় দূরে থেকেছেন। তার দৃষ্টিতে এদের দেহ অপবিত্র। —তারা হিন্দু বটে, কিন্তু অচ্ছুঁত। ধোবী হিন্দু সমাজের উঁচু জাতের সন্তান। হিন্দু ঘরের বিধবা বৌ। বিধবার যে নিয়ম মেনে চলা উচিত। ধোবী তাই মেনে চলে।

এ-সব শুনে সনিয়া আরো খুশী হয়েছে। কখনো কখনো ভেবেছে, ধোবীর সঙ্গে একবার দেখা করলে কি হয়? কিন্তু সাহস হয়নি। লোকে কি ভাববে? স্বয়ং চিন্তেই স্বাঁই ধোবীকে সন্দেহের চোখে দেখেন। বিশ্ব শুদ্ধু তিনি জানিয়েছেন, বিদেইকে ধোবী পোষ্য নিয়েছে। তবু ধোবী সব সম্পত্তি খুশীমত উড়িয়ে দিচ্ছে। কি করে তিনি ধোবীর এই পাগলামো সহ্য করেন?

সনিয়া জানতে পেরেছে, চিন্তেই স্বাঁই ধোবীকে বিষ্ণুপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর মায়ের কাজের সময় পালকী পাঠিয়েছেন। কিন্তু ধোবী আসেনি কোনো একটা অসুখের অজুহাতে। বিষ্ণুপুরে না এসেও সে কাজের সব খরচ দিয়েছে। তার গোমস্তা হরি মহান্তিই সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ধোবীর এই না আসাটা যেন জোঁকের মুখে নুনের ছিটের মত। চিন্তেই স্বাঁই জোঁকের মতই ছটফট করেছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারেননি। বলবেন-ই বা কি? একদিন বিদেইকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। ধোবী কোন আপত্তি করেনি। কিছুদিন পরে চিন্তেই স্বাঁই বিদেইকে আবার দুর্গাপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

সনিয়া জানতে পেরেছে, বাপ-মেয়ের মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেছে। দুজনের বনিবনা নেই। চিন্তেই স্বাঁই ভাবেন— ধোবীকে যদি

কোন রকমে বিষ্ণুপুরে আনতে পারেন, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর হাতে এসে যায়। এই ব্যাপারে তিনি সব সময় চেষ্টা করেন। তিনি ভেবে দেখেছেন, সনিয়ার সঙ্গে তাঁর সেদিনের ব্যবহার ধোবীর খুব খারাপ লেগেছিল। সেদিন থেকেই ধোবী বিদ্রোহ করেছে। সনিয়া এ-সব কথা প্রহরাজের কাছে শুনেছেন।

সনিয়াও তার প্রমাণ পেয়েছে। এক বছর আগে একদিন চিন্তেই স্বাঁই সনিয়ার বাড়ী এলেন। সেদিন তিনি তার খুব প্রশংসা করে বললেন— আরে সনি! তোর তো বলদও আছে, কাজের লোকও আছে। তোর বাবা আমাকে যে-জমি বেচে দিয়েছিল, তা তুই বাট্টায় নিয়ে নে।

সনিয়া কোন উত্তর দেয়নি। সে দেখল যে জমি আমি নিজের হাতে কেটেছি, তার চাষের সময় আমার নেই। আমি আরও জমি নিয়ে কি করব? তবে হ্যাঁ, ওই জমি আমার পুর্বপুরুষের ছিল। যদি বেচতে চান তো টাকার ব্যবস্থা করে কিনে নিচ্ছি। তার এই মনের কথা চিন্তেই স্বাঁইকে সনিয়া বলেও ফেলল।

কিন্তু চিন্তেই স্বাঁই কোন উত্তর দিলেন না।

আরেকদিনের কথা। মহাদেবের মন্দিরের চৌহদ্দিতে, প্রহরাজের উপস্থিতিতে চিন্তেই স্বাঁই সনিয়াকে দেখে বললেন— আরে সনি! নিজের বয়সের খেয়াল আছে! বয়স যে বেড়ে চলেছে। এবারে বিয়েটিয়ে করে ফেল। কি প্রহরাজমশাই? ভগবান তো তোর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর চিন্তা কিসের?

চিন্তেই স্বাঁই সনিয়ার কল্যাণ কামনা করছেন কেন? সনিয়ার জন্যে তার এত কিসের দরদ? তিনি জানেন যে, ধোবী সনিয়াকেই ভালবাসে। সনিয়া তার কথা কাউকে না বললে কি হবে, সে-ও যে ধোবীকে ভালবাসে। কিন্তু চিন্তেই তা গ্রাহ্য করেন নি। তবুও তার মনের গহনে সন্দেহ জেগেছে। সনিয়ার ব্যাপারে সব সময় খবর রেখেছেন। লোকেদের জিজ্ঞাসা করেছেন— সনিয়া কি দুর্গাপুরে যায়? দুর্গাপুর থেকে কোন লোক কি তার বাড়ীতে আসে? চিন্তেই যাদের

এ-সব কথা জিজ্ঞেস করেছেন, তারা আবার অন্যদের বলেছে। এই ভাবে কথা ছড়িয়ে গেছে। সনিয়াও শুনেছে সব।

সব শুনেও সনিয়া চুপ করে থেকেছে। অনেকদিন ভেবেছে, দুর্গাপুরে গিয়ে ধোবীকে দেখে আসে। কিন্তু মনের বাসনা মনেই মরেছে। সে জানে, সে যদি দুর্গাপুরে যায়, তাহলে সে কথা চাপা থাকবে না। গুজব ছড়িয়ে পড়বে। ক্ষতি করবে লোকে। ধোবী বিধবা। লোকের চোখে সে অপমানিত হবে। ধোবী যদি সনিয়ার ঘরণী হয়, চিন্তেই স্বাঁই তা সহ্য করতে পারবেন না। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে, দুর্গাপুরের যাবতীয় জমি সম্পদ হারিয়ে কি ধোবী সনিয়াকে বিয়ে করবে? এ বোধহয় সম্ভব নয়।

শিবরাত্রির কথা মনে পড়ে সনিয়ার। শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কল্পলোকের এক আনন্দময় ছবি। ধোবী যেন সেদিন কল্পনায় তার আত্মীয় হয়ে গেছিল। এই ঘর যে কার, সে বলেও ছিল। সনিয়া আর ধোবীর, পরস্পরের। লোকে বলে বিয়ের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যেতে দাও। সময় আর স্থানের দুরত্বে ধোবী আর সনিয়ার মধ্যে কোন ব্যবধান তৈরী হতে পারে না। তারা দুজনে এক, একই থাকবে। তার জন্যে সনিয়া পরিশ্রম করবে, অপেক্ষা করবে।

কিন্তু কতদিনের জন্যে? সনিয়ার মন পরের মুহূর্তেই দমে যায়। ক্লান্ত হয়ে গেছে তার মন। দিনের পর দিন শরীরটা শিথিল মনে হচ্ছে। কিছুই ভাল লাগে না। অনেকদিন অপেক্ষা করেছে। আর সম্ভব নয়। মন তার একজন সঙ্গী খুঁজছে।

সে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দূরে দেখতে পেয়েছে মেঠো রাস্তা দিয়ে কয়েকজন মেয়ে আসছে। তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে সে নেই তো............? এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে থেকেছে তাদের দিকে। আমবাগানের দিক থেকে মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠের শব্দ— কেউ হাসছে। সনিয়া মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছে।

সনিয়া একজন তরুন যুবক। সে অনুভব করে, পৃথিবীর প্রতিটি

মেয়ে যেন তার আত্মাকে টানছে। না, সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। সে সঙ্গী চায়। ধোবীকে সে চায়, যার জন্যে সে বাড়ী তৈরী করেছে, পরিশ্রম করেছে, বেঁচে আছে।

সেদিন রামনবমী।

শিঙা বাজিয়ে কে জানিয়ে গেছে যে, আজই রামনবমীর নাটক হবে— রামলীলা শুরু হবে। প্রহরাজমশাই 'বিশীরামায়ণ' পড়বেন আর লোকেরা মুখোশ পরে নাচবে। পরি দলাইয়ের দু'ছেলে— চন্দরা আর ভণ্‌রা— রাম ও লক্ষ্মণ সাজবে। বিনি কাণ্ডীর ছেলে মাঙ্গলিয়া সীতা হবে। বিশী জেনা রাবণ আর মাধব রাউত বিভীষণ। গাঁয়ের লোকে তাকে হনুমান সাজতে বলেছে। চিন্তেই স্বাঁই নিজে তাকে খবর দিয়েছেন। কিন্তু সনিয়া রাজী হননি।

সে চাঁদা দিয়েছে। কিন্তু পাঁচ গাঁয়ের লোকের সামনে রাত জেগে ঘুম নষ্ট করে নাচা তার পছন্দ নয়। সনিয়া রাজী না হওয়াতে গাঁয়ের লোক অসন্তুষ্ট হন। চিন্তেই স্বাঁই বললেন— কিছুদিন সবুর করো। সময় আসবে। সনিয়া নিজে এসে গাঁয়ের লোকের পায়ে পড়বে।

এ-কথা জানতে পেরেছে সনিয়া। সে দেখল যে গাঁয়ের লোকের শত্রুতা করা উচিত হবে না। সবাই যদি বেঁকে বসে তাহলে গাঁয়ে ও থাকবে কি করে? মনে মনে ঠিক করেছে, সন্ধে বেলায় ও মন্দিরে গিয়ে মুখোশ পরে নাচবে।

দুপুরের পর রহিম এসেছে। তাকে কাছে ডেকে সনিয়া বলে— আরে, তুই দেখছি কথা শুনবি না! এই রোদে ঘেমে নেয়ে মাটি কাটছিস কেন? জ্বর হ'লে তুই-ই তো ভুগবি। আমি সবাইকে উত্যক্ত করে ছাড়ব।

রহিম মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার জীবনে সনিয়া ছাড়া আর কে আছে? সেই-ই রহিমের মা-বাপ! শরীর খারাপ হলে সনিয়াই তার বিছানার পাশে বসে ওষুধ খাইয়েছে। পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। যদি রহিম জমিতে না যায়, তাহলে সনিয়া নিজে

গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে দিয়ে আসে। তাই আগের থেকেই সে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ শেষ করে রাখে।

সনিয়া বলল— আচ্ছা, যা, তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি একটু পান্তা করে রাখছি। রাতে আর রান্না করব না। রাতে তুই একটু সাবধানে থাকিস। গরু, বাছুর, ছাগল আর ঘরের দিকে খেয়াল রাখিস। আজ রামনবমী। আমি নাচতে যাব। গাঁয়ের লোকে খবর দিয়েছে। আমি যদি না যাই তো সবাই খুব অসন্তুষ্ট হবে।

রহিম কপালের ঘাম মুছে বলে— বিশি কাকা হাট থেকে ফিরে খাবে কি? ওর জন্যে একটু ভাত রেখে দাও ডেকচিতে। সনিয়া ঘরের চাবি রহিমকে দিয়ে বলে— নে, ওকে দিয়ে দিস।

নিজের হাতে রাঁধে সনিয়া। রহিম যখন থেকে এসেছে, তার দুঃখ একটু কমেছে। রহিম জল বা হাঁড়ি ছোঁয় না কিন্তু বাইরের কাজ শেষ করে রাখে। রহিম মুসলমানের ছেলে। কিন্তু বাড়ির চালে মনে হয় যেন সে সনিয়ার সহোদর ভাই। একটা মুসলমানের ছেলের সঙ্গে সনিয়ার এই ব্যবহারে লোকে কিছু সন্দেহ করেছে। কিন্তু সনিয়ার নিষ্ঠা দেখে কেউ কিছু বলতে পারে না।

সনিয়া নিষ্ঠাবান। নীতি-নিয়ম মেনে চলে। রহিমকে একটু তফাতে রেখে চলে। সে ভাবে, সবার ধর্ম সমান। যে যেমন ভালো বোঝে, করুক; সুখী থাকুক। পরস্পরের মধ্যে লোকের সহনশীলতার ভাব দেখান উচিত। সতিই, এক সংসারের মানুষ যদি পরস্পরের কথা না ভাবে, তাহলে সংসার চলে কি করে? সংসারটা যেমন, তেমনি পৃথিবী!

বিষ্ণুপুরের রামনবমী আশেপাশের দশটা গাঁয়ে বিখ্যাত। প্রহরাজ ভালো গান করেন। মৃদঙ্গদারেরাও খুব ওস্তাদ। নাচিয়েরাও ভালো। এ-অঞ্চলের সবাই বিষ্ণুপুরের রামনবমী দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং চিন্তেই স্বাঁই এ' ব্যাপারে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করেন। নতুন নতুন পোষাক, নতুন নতুন মুখোশ পরে যখন নাচিয়েরা বেরোয় লোকে

মুগ্ধ হয়ে পড়ে। রাবনের মঞ্চ বেশ ভালোই উঁচু হয়।

দুর্গাপুরের মেয়ে-বৌ আর পুরুষ মানুষেরা সন্ধের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। দুই প্রহর রাতের পর রামলীলা শুরু হয়। আলো ফোটার আগে শেষ হয়ে যায়। সকালে যে-যার বাড়ী ফিরে আসে।

রামলীলার প্রতিটি সন্ধ্যায় সনিয়া যোগ দিয়েছে। হনুমানের মুখোশ পরে নেচেছে। সে যখন গাছের ডাল ভাঙে, লোকে খুব মজা পায়। স্বয়ং চিন্তেই স্বাঁই, সনিয়ার খুব প্রশংসা করেছেন। লোকে বলেছে যে, সনিয়া না হলে রামলীলার কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। এ-কথা শুনে সনিয়াও খুব খুশী হয়েছে— ভেবেছে, সে হাজার হাজার গ্রামবাসীর মধ্যে বর্তমান। ক্ষণেকের জন্যে সে তার দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে গেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসেই এক অদ্ভুত একাকীত্ব অনুভব করেছে। মনে হয়েছে তার, যেন সে কোনো জঙ্গলে অজ্ঞাতবাসে আছে।

এ-কথা মনে হলেই সনিয়ার চোখে জল এসেছে। বুকের মধ্যে একটু নিঃস্ব নিঃস্ব ভাব অনুভব করেছে। যেন সারাটা জীবন তার নীরস হয়ে গেছে। সে এত পরিশ্রম করে কার জন্যে? কার জন্যে ঘর তৈরী করেছে? কে এই সম্পত্তি ভোগ করবে?

সনিয়া ভেবেছে, সে আবার একবার গিয়ে ধোবীকে জিজ্ঞেস করবে। সে তাকে স্পষ্ট করে জানাবে ধোবীর জন্যে সে রক্ত-ঘাম ফেলে সব সম্পত্তি করেছে। হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু মনতো এ-কথা বলে। আবার ভাবনা হয় লোকে কি বলবে? তার পা থেমে যায়।

রহিম তার উঁচু উঁচু ভাব দেখে বলে ব্যাপার কি, সনিয়া দাদা? তোমার কিসের দুঃখ?

সনিয়া হেসেছে। কোনো উত্তর দেয়নি।

একটু থেমে রহিম বলেছে—

সনিয়া দাদা, তুমি বিয়ে করছো না কেন? দেখো না, কাজ কত

বেড়ে গেছে। বৌ দিদি এলে ঘরের কাজ সামলাবে, রান্না করবে, এই চাবিটাও রাখবে। চাবি সামলে রাখা তো আমার কর্ম নয়। কখনো যদি হারিয়ে যায়— ?

সূর্য উঠেছে আকাশে।

রহিমের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সনিয়া ভাবে— গাঁয়ের লোকে তো একই কথা বলে। শেষে কালকের ছেলে রহিম-ও এই কথা বলছে ? সবাই কি আমার ব্যাপারে একই কথা ভাবে ?

সনিয়া হেসে বলেছে— তোর খেতে কষ্ট হচ্ছে না তো ? আচ্ছা, তোর জন্যে ছোট্ট দেখে একটা মেয়ে নিয়ে আসব। তুই আগে বিয়ে কর। কেমন ?

রহিম লজ্জা পেয়ে বলেছে— আমি নিজের কথা কি মোটে বলেছি ? আমি তো তোমার বিয়ের কথাই বলছিলাম। আর কতদিন এ'সব কষ্ট সইবে ? নিজের হাতে আর কতদিন রান্না করবে, বলো না ?

সনিয়া বলেছে— আচ্ছা, খণ্ডায়ত জাতের একটা ছোকরা আনব। সে আমাদের রেঁধে দেবে।

রহিম চুপ করে থাকে।

পরি-দলাইয়ের ডাক শোনা যায়— সনিয়া ! বাড়িতে আছো ?

সনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে— কি ব্যাপার পরী কাকা ?

—প্রহরাজ খবর দিয়েছেন, আজ রামলীলা তাড়াতাড়ি শুরু হবে। 'লক্ষ্মণ মুর্চ্ছার' পালা আছে আজ। লক্ষ্মণের প্রাণ না ফেরা পর্যন্ত রামলীলা শেষ হবে না। এই জন্যে আগের থেকেই তোমাকে সাজ-পোশাক পরে তৈরী থাকতে হবে। চিন্তেই স্বাঁই আজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। রামলীলার সঙ্গে লোকও খাবে। মাঝ রাত্তিরে খাওয়া শুরু হবে।

একটু থেমে পরী দলাই ব'লল— নিধিস্বাঁই সামিয়ানার নীচে বসে আছেন, তোকে ডেকেছেন। গাঁয়ের লোকে যে-যার ক্ষমতা অনুযারী এই ভোজের ব্যাপারে চাঁদা দেবে।

পরী দলাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই শিঙা বেজে উঠল।

গাঁয়ের লোকের ডাক পড়েছে। সবাই চলেছে মন্দিরের দিকে। সভা বসবে আজ।

সনিয়া পরী দলাইয়ের সঙ্গে বেরোয়।

মন্দিরের কাজে মণ্ডপের নীচে প্রহরাজ, চিন্তেই স্বাঁই, নিধিস্বাঁই, গাঁয়ের অন্য লোকজনরা বসে আছে। সনিয়া তাদের পাশে গিয়ে বসে। তিনবছর আগে লোকে অছুঁ্যত বলে তাকে অবহেলা করেছিল যেখানে— সে ঠিক সেই জায়গাতেই বসল।

প্রহরাজ একটা কাগজ নিয়ে বসেছেন। কে কত চাঁদা দেবে লেখা হচ্ছে। চিন্তেই স্বাঁই দু'টাকা চাঁদা দেবেন। অন্যরা কি দেবে, এখনো তা স্থির হয়নি। তর্ক চলেছে। লোকে তাদের খারাপ অবস্থা ও নিরুপায়তার দরুণ আট আনা থেকে চার আনা পর্যন্ত চাঁদা কমাতে বলছে।

নিধি স্বাঁই সনিয়াকে বললেন— ভোজের জন্যে তোকে একটাকা চাঁদা দিতে হবে। সবার এই মত। একদিনের তো ব্যাপার। কি বলিস? ঠিকতো?

নিধি স্বাঁই খুবই মেজাজে আছেন। সনিয়া তাকে বলল— নিধিকাকা, আমিও কিছু বলি? আজ লক্ষ্মণ-মূর্চ্ছার পালা হবে তো? কিন্তু তার সঙ্গে যদি খাওয়া-দাওয়া হয়, তাহলে লোকেদের অসুবিধে হবে। ভোজটা দু-চারদিন পরে হলেই তো ভালো হয়। তা-না হলে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছা পালা আজ বন্ধ থাকুক। একসঙ্গে দুটো হলে অসুবিধে হতে পারে।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— সনিয়া তো ঠিকই বলেছে। অন্য গাঁয়ের লোকজনকে ভোজে নেমতন্ন করা হয়েছে। ওটা তো বন্ধ রাখা যাবে না। নাটক মুলতুবি থাকুক। একটা ভালোদিন দেখে আরম্ভ করা যাবে।

প্রহরাজ বললেন— কাল রাতে শিঙা বাজিয়ে জানান হয়েছে যে, আজ লক্ষ্মণ মূর্চ্ছার পালা হবে। দূর দূর থেকে মেয়েরা আসবে। তারা যে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। আজ তাই ভোজ বন্ধ

রাখা যাক।

নিধি স্বাঁই বললেন— খবর এসেছে, দুর্গাপুর থেকে অনেক লোক আসছে। ধোবীও আসছে পালকীতে। সে-ও কি ফিরে যাবে?

সনিয়া চমকে ওঠে। চিন্তেই স্বাঁইও চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন —ফিরে যাবে?

নিধি বললেন— মধু ভোই আমায় খবর দিয়েছে। আপনি ঘরে ছিলেন। আপনাকে জানাতে পারিনি। বৌদিকে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছি। ধোবী এখানে এসে রাম লীলা দেখবে। বাড়ীতেও কিছুক্ষণের জন্য যাবে। তারপর ফিরে যাবে দুর্গাপুরে।

চিন্তেই স্বাঁই গম্ভীর হয়ে গেলেন। সনিয়ার মনে উত্তেজনা হল।

উদী সাহু বলল— তাহলে ভোজও হোক, রামলীলাও হোক! কে কত চাঁদা দেবে প্রহরাজমশাই বলুন। এ ভাবে কথা গড়ালে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সনিয়া বলল— চাঁদা যদি তুলতে হয় এখন থেকে তোলা উচিত। সন্ধ্যেবেলা ভোজ শুরু হবে। একটু পরে রাম লীলা শুরু হবে। বাগী কাণ্ডী বলল— ভাই, চাঁদা তুলতে তুলতে যে দুপুর হয়ে যাবে। সন্ধ্যের আগে ভোজ হবে কি করে?

সনিয়া উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে গাঁয়ের লোকেদের বলল— ভুলে যান চাঁদার কথা। এই দায়িত্ব আমার। গাঁয়ের দেবতা ভোগও হবে। গাঁয়ের লোকেই যাবে। আমি গরীব তো কি হয়েছে? এটুকু দায়িত্ব কি নিতে পারব না? সবাই ছা-পোষা মানুষ। তাদের দায়িত্ব বেশী। তাদের ঘরে যে অভাব বাড়বে। অথচ আমি একা। আমার দায়িত্বও কম। গাঁয়ের লোকের যদি মত হয়, তাহলে ভোজের সব খরচ আমি দেব। নিধি কাকা তার ব্যবস্থা করুণ। আমার তৈরী বাড়ী আমার নয়, তারই। যা-কিছু প্রয়োজন, লোক পাঠিয়ে বাড়ী থেকে আনিয়ে নিন।

সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। যেন সনিয়ার কথা তাদের বিশ্বাস হচ্ছেনা। চিন্তেই স্বাঁই তো অবাক

হয়ে গেছেন। তিনি ভাবলেন যে, সনিয়া প্রতিশোধ নিল। যেন সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে নেই, বরং চিন্তেইয়ের মুখে চড় মারছে। চিন্তেইয়ের সমস্ত দম্ভ, সমস্ত প্রতাপ সে যেন মাটিতে দলে একাকার করে দিয়েছে। বনেই পরিভা যেদিন সনিয়ার সঙ্গে ধোবীর বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে দিয়েছিলেন, সেদিনও তিনি আজকের মত অপমানিত হননি।

চিন্তেই স্বাঁই লক্ষপতি। তার জমির পরিমান এতই যে, এক প্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্ত নজরে পড়ে না। ক্ষেতে গাদায় তাঁর অনেক ধান নষ্ট হয়ে যায়। নিজেও তা খবর রাখেন না। বিষ্ণুপুর গাঁয়ের তিনি কর্তাব্যক্তি। কিন্তু আজ একজন আকাল-থেকে-বাঁচা কাঙালের কাছে তাঁকে মাথা নীচু করতে হ'ল। তাঁর মনের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে বলল— আরে মূর্খ! বড় সে-ই যার হৃদয় বড়। গরীব কি ক্ষুধার্ত, অসহায় হতভাগ্য— সে যাই হোক না কেন।

গাঁয়ের লোকে হরিধ্বনি দিয়ে উঠেছে। বেজে উঠেছে শিঙা। সবাই সনিয়ার প্রশংসা করছে। সনিয়ার সুখ্যাতিতে যেন বাতাস কেঁপে উঠছে। নিধি সনিয়ার হাত ধরে বললেন— গাঁয়ের লোকে একমত। তুই নিজের কাজ কর।

—আপনি ব্যবস্থা করুন! সনিয়া বলে।

—আরে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। প্রহরাজ বললেন পরীকে বলে দাও, সে তার বড় জাল নিয়ে আসুক। দেখেছো, সনিয়া তার নতুন পুকুরে কত মাছ করেছে।

লোকে আবার হরিধ্বনি দিয়েছে।

আহত বাঘের মত চিন্তেই স্বাঁই গর্জে উঠলেন। ওঃ! এত গোলমাল হচ্ছে কেন? এই পরী! জাল নিয়ে আয় আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

তাঁর ঠোঁটে বিশাক্ত হাসির একটা ছোট্ট রেখা···।

ধোবী এসেছে। সঙ্গে বিদেইকেও এনেছে। রামনবমীর উৎসব ধূমধামের সঙ্গে উদযাপিত হ'ল। লক্ষ্মণ-মূর্চ্ছা নাটকও খুব মর্মস্পর্শী হ'ল। ভোজের যাবতীয় খরচ সনিয়া দিয়েছে। গাঁয়ের আবাল বৃদ্ধ

সবাই আনন্দে খেয়েছে। খুবই উৎসাহে রামলীলা দেখেছে।

লক্ষ্মণ-মূর্চ্ছার অভিনয়ের সময় লোকে উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রত্যেকটি কথা শুনেছে। লক্ষ্মণ অচেতন হ'লে লোকে কাঁদল। মেয়েরা কয়েকজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে ওষধি আনলে লক্ষ্মণ আবার বেঁচে উঠেছে। এই দেখে লোকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বারবার হরিধ্বনি দিয়েছে।

চাতালে বসে ধোবী নাটক দেখছিল। সে বার বার চোখের জল মুছেছে। ধোবী জানত না, তার আসার খবর পেয়ে কত খুশী হয়েছে সনিয়া। ভোজের সমস্ত খরচ সে দিয়েছে। ধোবীর উপস্থিতিতে সনিয়ার হৃদয় নতুন উৎসাহে ভ'রে গেছে। হনুমানের মুখোশ পরে সে অত্যন্ত উচ্ছ্বাসে লাফালাফি করে অভিনয় করেছে।

রামলীলা শেষ হবার পর মা আর কাকীমার অনুরোধে ধোবী বাড়িতে গেছে। সনিয়াও হনুমানের মুখোশ খুলে উদাস মনে বাড়িতে ফিরে এসেছে। রহিম বাড়ির বারান্দায় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দু-দিন পরে ধোবী দুর্গাপুরে ফিরে গেল। বিষ্ণুপুরে থাকা-কালীন ও সবার বাড়ি এক-একবার গিয়েছে। কিন্তু সনিয়ার বাড়ি যায়নি। সনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তার পথ চেয়ে থেকেছে। সে এল না দেখে, মনে খুব আঘাত পেয়েছে সনিয়া। প্রাণ যেন তার দেহ মুক্ত হয়ে ধোবীকে অনুধাবন করেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তার কাছে জনশূন্য মনে হয়েছে। তার সমস্ত উৎসাহ আনন্দ শেষ হয়ে গেছে। কোন কাজেই মন লাগেনি।

রহিম তার উদাসীনতার কারণ বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছে সে— সনিয়া দাদা! তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

সনিয়া হেসে বলেছে— আরে পাগলা! তুই বুঝবি না……।

রহিম একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যেন সে কিছু জিজ্ঞেস করছে।

সাবিত্রী অমাবস্যা।—

পুনী উপোস করেছে। মেয়েরা বড় নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রত করে। পুনী জানে। মধুয়ার জন্য সে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে ব্রত পালন করেছে। মধুয়া তাকে আশ্রয় দিয়েছে। নতুন জীবন দিয়েছে। তার কোলে তিন বছরের একটি সন্তানও দিয়েছে। বাচ্চাকে যখন সে এক মনে দেখে, তার বাবার কথা মনে পড়ে। মুখটা তার বাবা বনেই পরিভার মত। সে তার বাচ্চার নাম রেখেছে বনেই। যেন তার বাবা তারই কোলে নবজন্ম নিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশ তোলপাড় করে কালো মেঘ জমেছে। জোরে বাতাস বইছে। মধুয়া এখনও কাজ থেকে ফেরেনি। রোজই তো দেরী হয়। কিন্তু পুনী কখনো ভয় পায় না। সে জানে মধুয়াকে ধোবী স্নেহ করে। তাকে শক্ত কাজ দেয় না। কিন্তু না জানি কেন সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মধুয়ার পথ চেয়ে রয়েছে। এমনই মানুষের মন, যাকে সে ভালবাসে, তার অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে।

কোলে বাচ্চা নিয়ে পুনী কুপী জ্বেলে অপেক্ষা করছিল। দরজা ঠেলে কে যেন ভেতরে ঢুকল। আরে, এ যে মধুয়া! পুনী খুশী হয়েছে খুব। মধুয়াও খুব খুশী। সে একটা নতুন শাড়ী পুনীর সামনে রেখে বলল— মা-ঠাকরুণ, তোর জন্যে শাড়ি পাঠিয়েছেন। বললেন, আজ কোন্ ব্রত আছে। তোর কথা খুব বলছিলেন। তুই যাসনি কেন?

পুনী প্রত্যেকদিন যায়। প্রত্যেকদিন ধোবীর সঙ্গে গল্প করে ফিরে আসে। ধোবী কিন্তু তাকে কিছু দেয়নি। যা-ই দিতে চেয়েছে, মধুয়ার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘরে আরো অনেক আছে। ধোবী তাদের লুকিয়ে পুনীর জন্যে জিনিস পাঠিয়েছে। তা সত্ত্বেও কথা চাপা থাকেনি কোন-না কোন উপায়ে গাঁয়ের বৌয়েদের কানে পৌঁছে গেছে। পুনী যদি কোন নতুন গয়না পরে, তাহলে সবাই তাকে জিজ্ঞেস করে— আরে! এই গয়না তোকে কে দিল?

অন্য বৌয়েরা পুনীকে হিংসে করে। তারা বলে— বাড়িতে দু-দুটো বলদ পোষার ক্ষমতা কি মধুয়ার আছে? নতুন বাড়ি ওর কি কখনো করা সম্ভব? রাস্তার ধার থেকে তুলে এনেছে যে পুনীকে,

তার জন্যে শাড়ী ও কি কিনতে পারে কখনো? কার জন্যে আজ এই সব হচ্ছে? এই মধুয়ার জন্যে? যার কোন চাল চুলো নেই? এর কারণ অন্য যে··· ।

কথা বাড়াতে মেয়েরা পটু। কেউ কেউ পুনীর সায় দিয়ে বলেছে— পুনী, তুই কেন বলে দিস না, তোরও রোজগার আছে। বলে দিবি, একলা মধুয়ার নয়, আমার আরো লোক আছে। কে কে দিয়েছে আমি মনে করে রেখে দিয়েছি? বলে দেনা······ ।

কিন্তু ওদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিল যারা পুনীকে ভালো করে চিনত। তারা বলেছে— পুনী কি বলতেই শুধু আকাল থেকে বেঁচে এসেছে— ওর মনটা পরিষ্কার। ওর মনে কোন ছল চাতুরি নেই। এই সমস্ত জিনিস ওকে মধুয়াই দিয়েছে। পুনীও জানে মধুয়া কোত্থেকে এনে দেয়। কিন্তু বোকা বলে একটুও জিজ্ঞেস করে না— তুমি কোত্থেকে এ'সব জিনিস আনো? কোন্ কারণে এত সব জিনিস দেয় তোমাকে?

পুনী এ-কথা শুনে চমকে উঠেছে।

বৌয়েরা আরো বলে— মা ঠাকরুণের বাড়িতে আরো তো চাকর-বাকর আছে। কিন্তু মধু ভোইকে বেশী পছন্দ করেন। কাজ শেষ করে সবাই সন্ধে বেলা বাড়ি ফেরে। কিন্তু মধুয়া ফেরে মাঝরাতে। কি পুনী? মিথ্যে কথা?

পুনী সাপের মত ফোঁস করে ওঠে— ও কখন বাড়ি ফেরে তাতে তাদের কি দরকার? তোরা নিজেরা কেন রোজগার করিস না? কে তোদের বারণ করেছে? যদি এতই জ্বলিস, যা না গিয়ে মধুয়ার সঙ্গে পীরিত কর্— কে বারণ করেছে তোদের?

রাগে পুনী আর কিছু বলতে পারে না। ওখান থেকে চলে যায়। তখন কেউ কেউ বলে উঠেছে— রাস্তার ধারে মরছিলো। এখন ওর দেমাক দেখো! কুটনি, ও কুটনি........।

আরও অনেক কথা ওরা বলেছে। কিন্তু পুনী কান দেয়নি। ঘরে ফিরে ছেলেকে কোলে নিয়ে ভেবেছে— মধুয়ার সম্পর্কে, ধোবীর

সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে। কিন্তু তার চিন্তা শেষ হয়নি। কোন উপায় সে বার করতে পারেনি। সে ভেবেছে— সবাই সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফেরে, মধুয়া ফেরে মাঝরাতে। কিন্তু কেন? তার কান্না এসে গেছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। বার বার এই কথাই তাকে কষ্ট দিয়েছে।

মধুয়া যখন মাঝরাতে ঘরে ফিরল পুনী একমনে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। কত পরিশ্রান্ত সে। পুনীর বুক কেঁপে উঠেছে। কিছু বলতে পারে নি। থেমে থেমে বলল— এত দেরী হ'ল কেন?

মধুয়া বলল— মা ঠাকরুণের কাছে ছিলাম। মজুরদের পয়সা দিচ্ছিলাম। —কাজ শেষ হলে মা ঠাকরুন বললেন— ওরে মধু! আজ তো বিদেইয়ের জন্মদিন, একটু বসে যা! একটু জলখাবার খেয়ে যা! ওখানে বসে বসেই চোখ বুঁজে এল। ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পরে উনি তোমার জন্যেও জলখাবার পাঠালেন— এই নাও।

মধুয়া তার ময়লা গামছার গিঁট খুলে পুনীকে জলখাবার এগিয়ে দিল। পুনী দেখে, আটটা চাকলি-পিঠে।

পুনীর পিঠে খেতে ইচ্ছে হয়নি। বাড়িতে রাখতেও তার মন সায় দেয়নি। মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। হয়ত মধুয়া কিছু খারাপ ভাববে— তাই পিঠেগুলো সে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তার ঘুমই আসেনি। বিছানায় পড়ে পড়ে ভেবেছে। কিন্তু ক্লান্ত মধুয়া শিগ্গিরই অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেছে। পুনী আবার উঠে বসে মধুয়ার মুখটা দেখেছে। অনেকক্ষণ এ-ভাবেই তাকিয়ে থেকেছে। তার মাথায় আসে নি কিছু।

পুনী দেখল, অনেক রাত হয়ে গেছে। আলো নিভিয়ে দিল। মধুয়ার চওড়া বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেলে........।

ধোবী জিজ্ঞেস করল পুনীকে— আরে পুনী! এ কী মুখ করে আছিস? খুব শুকনো দেখাচ্ছে! মধুয়া কি কিছু বলেছে? আচ্ছা, আজ ও ফিরে আসুক, ওকে বেশ করে শোনাচ্ছি........।

পুনী হাসল। সত্যিই ধোবীর মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে

গেল সে। মেয়েরা তার পেছনে অনেক লেগেছে— অনেক গালমন্দ করেছে কিন্তু ভুলে গেল সে। ধোবীর পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মুখটাই তাকে সমস্ত ভুলিয়ে দিয়েছে। ধোবীর আন্তরিক কথাবার্তা শুনে সে খুবই খুশী হয়েছে। যে ধোবী এত ভালো, পবিত্র— তাকে সে কি করে সন্দেহ করে? তার পা ছুঁতে ইচ্ছে হয়।

পুনী বলল— ধোবী দিদি, আকালে এত লোক মারা গেল, কিন্তু আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে, হাজার লোকের অপমান পরিহাস— সব সহ্য করে বেঁচে থাকব? আমার ভাই সুখে রয়েছে, তবু একদিন ও খবর নিতে আসেনি। কোন্ মুখে আমি তার কাছে যাব?

ধোবী গম্ভীর হয়ে সব কথা শুনল। অনেক চিন্তা এল তার মনে। বুকের মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করল। সে জিজ্ঞেস করল— তুই সব সময় এ-কথা বলিস কেন পুনী? মধুয়া শুধু জাতেই বাউরী, কিন্তু রূপেগুণে তার সামনা সামনি হবার মত কে আছে? ভগবান তোদের সুখে রাখুন।

ধোবীর মুখে এ-কথা শুনে পুনী খুশী হয়েছে। মনে মনে তার গর্ব হয়েছে। কিন্তু কে জানে কেন মধুয়ার মুখে ধোবীর প্রশংসা শুনতে তার খারাপ লাগে।

সেদিনও সাবিত্রী অমাবস্যার রাত। মধুয়া অনেক দেরী করে বাড়ী ফিরেছে।

মধুয়ার গলা শুনে পুনী বলল— তুমি না বলেছিলে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে? ঘরের সব কাজ শেষ করে ফেলেছি। বলদ-গুলোকে বেঁধে জল খাইয়েছি। সত্যিই তোমার ঘরের কাজ খুব বেড়ে গেছে। আমি আর কত করব?

পুনীর চোখে জল এসে গেছে।

মধুয়া উদ্বিগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। পুনী কাজ করতে পারছেনা— একথা প্রথম পুনীর মুখ থেকে শুনল মধুয়া। সে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, তুই এবার বল— তোর ইচ্ছেটা কি?

—আমি যা বলব তাই করবে?

—হ্যাঁ, করব! বলতো শুনি?

—তোমার নিজের কাজ এখন এত বেড়ে গেছে একটা মানুষ পেরে উঠবে না। তবু তুমি পরের চাকরি করবে কেন? চাকরি ছেড়ে দাও না!

শুধু এই বলে পুনী মুখ নীচু করে নিল। সে এক অজানা ভয়ের আশঙ্কা করল। সে ভাবল, নিজের বোকামিতে সে তার মনের সন্দেহ বিষ উগরে দিয়েছে। আর সেই বিষ পান করে সে জ্বলছে। মধুয়ার মুখের দিকে তাকাতে তার সাহস হল না। কোনে পড়ে থাকা একটা শাড়ী তুলে নিয়ে দরজার দিকে সে পা বাড়াল।

মধুয়া পুনীর উদ্দেশ্য বোঝেনি। সে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন পুনীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। খানিক পরে বৃষ্টি এল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এল।

ধোবীর মায়ের চোখের জল ঝরছে। দুর্বল হাতে তিনি জল মুছে ভাবছেন, তার স্বামীর কঠোর মন কিভাবে বদলানো যায়? সনিয়ার ওপর এতটা অসন্তোষ ভাল নয়। তার বাবা বনেই পরিডা যদি অপমান করেও থাকে। সনিয়া তার জন্যে দায়ী নয়। বনেই পরিডা তো মারা গেছে, সেই সঙ্গে চিন্তেই স্বাঁইয়ের অসন্তোষেরও মৃত্যু হওয়া উচিত!

সত্যিই চিন্তেই স্বাঁই অত্যন্ত অভিমানী। একবার যা বোঝেন তাতেই গোঁ ধরে বসে থাকেন। যতই বোঝাও তাঁর মন ফিরবে না।

ধোবীর মা ভাবছেন— আজ সাবিত্রী অমাবস্যা। সধবা মেয়েরা সব আজ উপোস করেছে। স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে তারা আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। সতী সাবিত্রীর মত তারা আজ দিন কাটাবে। তিনিও তো তাই করেছেন। তাঁর কঠোর স্বামীর সুখের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ের, ধোবীর কি অবস্থা? ছোটবেলাতেই হতভাগিনী হয়েছে আর চোখের জল ফেলে দিন কাটাচ্ছে।

মেয়ের মনের কথা মা জানতেন। ছোটবেলা থেকে সনিয়াকে

ভালবাসে ধোবী। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসেও সনিয়াকে ভাল-বেসেছে। একথা মায়ের কাছে গোপন নেই। ধোবী সনিয়াকে কত-যে পছন্দ করে, নিধির মুখেও তিনি তা শুনেছেন। টিমি অনেক কিছু বলেছে। ধোবীকে তিনি নিজেও জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু ধোবী কোনও উত্তর দেয়নি। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। সনিয়াকে এখনো ধোবী গভীর ভাবে ভালবাসে। এই ভালবাসাই তাকে সনিয়ার থেকে দূরে রেখেছে। এই কারণেই সে মা-বাবার কাছে আসতে চায় না।

ধোবীর মা তাঁর স্বামী ও দেওরকে সবই বুঝিয়েছেন। নিধির কাছে কোন যুক্তি সফল হবেনা। চিন্তেই স্বাঁই যদি রাজি হন, তাহলে কাজ হবে।

ধোবীর মা আঁচলে চোখ মোছেন। তিনি চিন্তেই আর নিধিকে বললেন— তোমাদের মুখ থেকে আমি আজ শেষ কথা শুনতে চাই। ধোবীর জন্যে সনিয়াই ঠিক। দুজনের বিয়ে দিয়ে দাও। ওদের আর কষ্ট দিওনা। একবার ভাবো তো, কেন ধোবী তার শ্বশুরের সম্পত্তি নষ্ট করছে? বাম ওঝার মেয়ে টিমির কথা কখনো ভেবেছ? ও চন্দরার সাথে পালিয়েছে তো! তুমিই বাম ওঝা আর বিশী জেনাকে দোষী ঠাউরেছো। তুমিই সামনে বলেছ, এর জন্যে টিমি নয়, বরং রাম ওঝাই দায়ী।

ধোবীর মা চিন্তেই স্বাঁইকে আরো অনেক কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন— তুমি বলনি যে বেশী চালাক মেয়ে আর ঘি একই রকম। জামাইয়ের কোন খবর যখন পাওয়া যায়নি, তখন পলাশ পাতা পুড়িয়ে মেয়েকে আর কারো হাতে কেন তুলে দাওনি?— এই কথা তোমারই ছিল তো?

বাম ওঝা তার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দেবতাকে অর্থদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু চন্দরার বাবা বিশী জেনা নিজের দোষ স্বীকার করেছে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করেনি। ধোবীর মা এসব জানার পর থেকেই ধোবীর ব্যাপারে অনেক কিছু ভাবছেন।

নিজের বৌয়ের কথা শুনে চিন্তেই স্বাঁই গর্জে উঠেছেন। চেঁচিয়ে

উঠে বলেছেন— কার সঙ্গে ধোবীর তুলনা করছ? রাম ওঝার মেয়ে টিমি আর আমার মেয়ে ধোবী কি এক? শ্বশুরের সম্পত্তি নষ্ট করছে বলে, তার মানে এই নয়, বংশের কলঙ্ক লাগিয়ে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেব!

চিন্তেই স্বাঁই আরও বললেন— সনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে ফিরেছে। সবই ঠিক কিন্তু তার বাউণ্ডুলেপনা কি মোটেই শেষ হয়েছে? সে যে লঙ্গারখানায় অচ্ছুঁতদের সঙ্গে বসে খেয়েছে— এই দোষ কি মোটেই কাটবে? এখনও সে তার বাড়িতে একটা পাঠান ছেলেকে রেখেছে। তার হাতের রান্না খায়। লুকিয়ে চুরিয়ে এ-কাজ করছে। কিন্তু একদিন তো ধরা পড়বে? আমার ধোবীকে কি এর হাতেই তুলে দেব? তাই যদি করি, তাহলে রাস্তায় মাথা তুলে হাঁটতে পর্যন্ত পারব না, বুঝেছে?

এবার নিধি বললেন— দাদা! যদি সনিয়াকে আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা অন্য কোথাও ধোবীর জন্য পাত্র খুঁজতে পারি। আপনি যদি মত দেন, আমি অন্য পাত্র দেখি!

চিন্তেই স্বাঁই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নিধির দিকে তাকিয়ে বললেন— ওঃ! দুজনে আমার মাথা নীচু করার জন্য পরামর্শ করেছ, না? তাহলে শোনো! ধোবী সুখে আছে। বিদেইকে দত্তক নিয়েছে। আমার কথা না শুনে সে সম্পত্তি নষ্ট করছে। কিন্তু তাকে আমি কখনো আটকাইনি। বলতে কি বিদেই আমারই ছেলে। আমার সম্পত্তিতেও তার অধিকার আছে। ধোবীর সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে আমার সম্পত্তিতে আরামে থাকবে। সেদিন আমরা থাকব না। কিন্তু হ্যাঁ— ধোবী সেই বিদেইয়ের দেওয়া উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে থাকবে, মনে রেখ।

ধোবীর মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। চীৎকার করে বললেন— কি বললে? বিদেইয়েরও অধিকার আছে! কিন্তু শুনে নাও— এই সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ ধোবীর। আর আমি বেঁচে থাকতে বিদেইকে........।

ধোবীর মাকে চিন্তেই আর বলতে দিলেন না। মাঝখানেই বলে

উঠলেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বেঁচেবর্তে থাকতে বিদেইকে আমি নিজে দওক নেব। তখন তুমি কি করবে, শুনি একটু? যখন থেকে ধোবী পরের ঘরে চলে গেছে, তখন থেকে স্বাঁই পরিবারের সম্পত্তিতে তার আর কোন অধিকার নেই।

ধোবীর মা বললেন— এ আমি কখনো হতে দেব না।

হাসতে হাসতে চিন্তেই স্বাঁই বললেন— তুমি কে? এ সমস্ত সম্পত্তি আমার। আমার কাজে বাধা দেবার সাহস তোমার আছে? সমস্ত সম্পত্তি বিদেইয়ের নামে লিখে দেব।

ধোবীর মা চোখের জল মুছে বললেন— সম্পত্তি করেছ তুমি। এ যদি তুমি মেথরকে দিয়ে দাও, আমি কিছুই বলব না। কিন্তু ধোবীকে জন্ম দিয়েছি আমি। ওকে সনিয়ার হাতেই আমি তুলে দেব। তুমি তোমার আয়েস— তোমার দম্ভ নিয়ে বেঁচে থাকো। কিন্তু, ও'সে মূর্খ, গোয়ার, মজুর যাই হোক— আমি ঐ সনিয়ার সঙ্গে ধোবীর বিয়ে দেব। যতক্ষণ না তা করতে পারছি, এ-বাড়ির জলস্পর্শ করব না।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— থাক, থাক! এত বড়ো প্রতিজ্ঞা করে বসো না, ধোবীর মা!— তারপর বললেন— আচ্ছা, তুমি কি চাও? একজন কাঙালের সঙ্গে আমার মেয়ে ধোবীর বিয়ে দিয়ে স্বাঁই পরিবারের কলঙ্ক লাগাব— এই তো? পাগলামো ছাড়ো। বেশী জেদ দেখালে এক ফুঁয়ে তোমার সনিয়াকে গাঁয়ের থেকে উড়িয়ে দেব— বুঝেছে?

একটু থেমে চিন্তেই স্বাঁই বললেন— ধোবীর মা, আরো শোনো! অনেক কষ্ট করে সনিয়া বাড়ি করেছে, সামান্য জমি নিয়ে পেট চালাচ্ছে। জেনেশুনে তার ক্ষতি ক'রো না। প্রাণ চায় তো উপোস করো, ব্রত করো— নিধির কাছে গিয়ে যা মন চায় বকে যাও! কিন্তু ঘরের কথা যদি বাইরে যায় আর লোকে যদি তা নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে, তাহলে শুনে রাখো— যার ভালো করতে যাচ্ছ, তারই ক্ষতি হবে।

এই বলে চিন্তেই স্বাঁই রেগে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ঘন অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের গর্জনে সন্ধ্যার শান্ত আবহাওয়া কেটে গেছে।

সেদিনও পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার করেছিল। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমক আর তুমুল বৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপছিল। সতী সাবিত্রীর কোলে তার স্বামী সত্যবানের শবদেহ। একজন সতীর কোল থেকে সত্যবানের আত্মাকে নিয়ে যাওয়া যমরাজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি সেই আত্মা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সেদিনও ঘন ঘোর অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী ঢাকা পড়েছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুত চমকাচ্ছে আর অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়েছে।

ধোবী রাধামাধবের মূর্তির পায়ে মাথা ঠেকাল। চোখে বইছে অশ্রুজল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল— হে প্রভু! নারীকে এত হীন, এত লাঞ্ছিত করলে কেন? কেন আমাকে এত কষ্ট করতে হচ্ছে?

কিন্তু সাবিত্রী অমাবস্যার রাতে ধোবীর সত্যবান কে ছিল? সনিয়া, না নিতেই নায়ক? সনিয়াকে সে মন থেকে চায়। প্রথম যৌবনে ধোবী তাকে হৃদয় দিয়েছে। সনিয়ার সুখে সে খুশি হয়েছে আর তার দুঃখে চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু নিতেই নায়কের ব্যাপারে এমন করেনি। সমাজ ও জাতের নিয়ম মেনে যখন সে নিতেইয়ের হাত ধরল, তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তবুও সে নিতেইয়ের সংসারে এসেছে। এই সংসারেই সে তার ভরা যৌবন খুইয়ে দিয়েছে।

এখন কে তার সত্যবান? সনিয়া পরিভা না নিতেই নায়ক?

সনিয়া তার সব হারিয়ে কাঙাল হয়েছিল। তবুও সে তার প্রিয় গ্রামকে ভোলেনি। গাঁয়ের মাটিতে মিশে যেতে সে ফিরে এসেছে। তার মুখে ধোবী আহার তুলে দিয়ে জল খাইয়ে তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের মত বেঁচে থাকতে ধোবী প্রেরণা দিয়েছে তাকে। কিন্তু নিতেই নায়ক ছিল অন্য ধরণের। নিজের স্ত্রীকে খুশী করার জন্যে সে কাঙাল সেবা করেছে আর ঐ কাজেই হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে।

কে বড়ো— মন, না, শরীর ?— ধোবী তার উত্তর জানে না। তবুও একজন সধবার মত সে সাবিত্রী অমাবস্যা ব্রত করেছে।— সারাদিন উপোস করেছে। বাড়ির ঝিয়েরা এই দেখে পরস্পর ইশারা করে হেসেছে। অনেকে বলেছে— বড়লোকের........বড় ব্যাপার........!

দেবতার পায়ে পড়ে থেকেছে ধোবী। রাধামাধবের মূর্তির কাছে ঘিয়ের প্রদীপ হাওয়ায় কেঁপে উঠেছে। ধোবীর হৃদয়ও যেন কেঁপে উঠেছে।. পেতলের মূর্তির দিকে তাকিয়ে মাটিতে পড়ে প্রার্থনা করেছে।— প্রভু! জানি না আমায় ক্ষমা করবে কি না! কিন্তু শিবরাত্রির দিন সনিয়া দাদার পা ছুঁয়ে যা বলেছি, তার তুমি সবই জানো। আমার মনের ভাবনা তো তোমার অজানা নেই, প্রভু?

সে হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করল। যেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সনিয়া। যেন অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলছে— তোমার পথ চেয়ে আছি, ধোবী! আসবে তো? ধোবী যেন তার উত্তরে বলেছে— তোমার পায়ে মাথা রেখে তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো!

চমকে উঠেছে ধোবী। না, না, এ অসম্ভব! হে ভগবান! এ তুমি কি দেখাচ্ছ আমাকে?

ধোবীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠেছে। সে আবার মাথা নীচু করে ভগবানের পায়ে প্রণাম করেছে। প্রার্থনা করেছে— আমার মনে শক্তি দাও, প্রভু!

একজন ঝি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল— মা!

ধোবী উঠে বসল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু সেই অশ্রু না মুছেই উত্তর দিল সে— কি হয়েছে রে? বিন্দেই উঠে পড়েছে?

—না সে তো ঘুমোচ্ছে। তার কাছে ঝি বল্লা আছে। আপনার গাঁ থেকে একজন লোক এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে বেচারা! বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতে চায়।

ধোবী উঠে দাঁড়াল। চোখের জলমুছে বলল— বাবা পাঠিয়েছেন বোধ হয়!

—না, মা ঠাকরুণ! ও তোমার নাম ধরে বলছে। চাকর-বাকর

হলে তো নাম ধরত না আর কেউ হবে বোধ হয়।

—আর কেউ?— ধোবী চমকে উঠেছে। সনিয়া দাদা নয় তো? সনিয়া দাদা ছাড়া আর কেউ তো তাকে নাম ধরে ডাকে না। সাবিত্রী অমাবস্যার গভীর রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ও এসেছে কেন?

ধোবী দৌড়ে বাইরে এল। ঝিকে আলো আনতে বলল। বারান্দার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দেখল। মুখ থেকে আপনিই একটা শব্দ বেরিয়ে এল— কে?

সনিয়াকে কোন উত্তর দিতে হয়নি। ঝি আলো নিয়ে এসেছে। সেই আলোতে ধোবী দেখল, সনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। মাথার থেকে জলের ধারা চুঁয়ে পড়ছে। সমস্ত কাপড় কাদায় ভরে গেছে।

ধোবী সনিয়ার ভরাট মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। ক্ষণেকের জন্যে তার মনে কয়েক ঝলক ছবি খেলে গেল। অনেক কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সে-সব ভাবার সময় কি এই? আলো হাতে যে ঝি দাঁড়িয়ে আছে সে কি ভাববে?

ধোবী ধীরে ধীরে বলল— আরে, সনিয়া দাদা! অচেনা লোকের মত বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে কেন? এটা কি তোমার বাড়ি নয়? ভেতরে এসো, না?

সনিয়া ধোবীর পেছন পেছন গেল।— মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে। পরস্পর কথা বলার জন্যে দুজনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই।

মধ্যরাত। চারদিকে এক অদ্ভুত ধরণের নীরবতা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ এখনো মেঘে ঢাকা। সনিয়ার ঘুম আসছে না। ধোবীর সেবায় সে সব কিছু ভুলে গেছে। মাঝরাতেই সে সনিয়াকে খাবার খাইয়েছে। অশ্রুসিক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বারবার সেধেছে— আরো কিছু নাও। তুমিতো কিছুই খেলে না। সনিয়া ভেবেছে যেন সে মায়াপুরীতে এসেছে।

ধোবী কি সত্যিই তাকে ভালবাসে?— সনিয়া বারবার এই

কথাই ভেবেছে। সনিয়া বেঁচে আছে আজ কার জন্যে? ধোবীই তাকে জীবন দিয়েছে, সম্পত্তি দিয়েছে আর···আর দিয়েছে হৃদয়ের খাঁটি ভালবাসা। কিন্তু ধোবীকে ছাড়া এ-সব নিয়ে সে কি করবে? জাত ধর্মের বিভেদ ধারণায় তার বিশ্বাস নেই। ভয়ঙ্কর আকাল তাকে শিখিয়েছে জাতের নামে যে বিভেদ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা মিথ্যে। জাত ও ধর্ম এক মায়া— মানুষকে স্বার্থপর করতে শেখায়। তা জানা সত্ত্বেও সে নিজেকে জাতের বন্ধনে বেঁধেছে। হনুমানের মুখোশ পরে সে অনেক দাপাদাপি করেছে। মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরের পাথর-প্রতিমার ওপর কোন বিশ্বাস নেই তার। তবুও মন্দিরের সংলগ্ন যাত্রার জন্যে চাঁদা দিয়েছে সে। সকলের সঙ্গে সে-ও এই পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নুইয়েছে।

এই ভণ্ডামী কেন চলেছে? সনিয়া তার কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেনা। সে ভাবে, এবার তার কি করা উচিত? আর কতদিন সে প্রতীক্ষা করবে? একাকীত্ব তার আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু ধোবী এখন নায়ক পরিবারের বৌ। তার সম্পত্তি, চাকর-বাকর ছেড়ে কি করে কুঁড়ে ঘরে যাবে? কি বলে তাকে তার কুঁড়েতে আমন্ত্রণ করবে? কি করে জানাবে তাকে মনের কথা?

সনিয়ার চোখে ঘুম আসছেনা। অন্ধকার ঘর। বাইরের বারান্দায় লণ্ঠনের একটা হাল্‌কা আলো। সমস্ত পৃথিবী ঘুমে অচেতন। একটিই মানুষ জেগে আছে— সে হ'ল সনিয়া।

শেষমেষ কেন সে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে ঘনঘোর অন্ধকারে দুর্গাপুরে এসেছে? তার কি করা উচিত? অজস্র 'কেন' তার মনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আশা-নিরাশার মাঝখানে সে অস্থির হয়েছে।

সনিয়া উঠে বসল।

ঠিক সেই সময়ে অন্য ঘরে ধোবী তার চোখের জলে বিছানা ভাসিয়ে চলেছে। ধোবীও উঠে বসল। ঘরে আলো জ্বলছে। পাশে বিদেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পালঙ্কের পাশে অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছে ঝি-বল্লী। নাক ডাকছে তার।

ধোবী ভাবল এখন আর নিজেকে ঠকানোর প্রয়োজন নেই। সে কেন বার বার এ-ভাবে ছটফট্‌ করবে? লোকে একটু বলবে। কিন্তু সে কেন পরোয়া করবে? লোকে যদি বলে তো বলুক। সে কেন ভয় পাবে? সে ভাবল, সকাল হলেই সে সব-কিছু সনিয়া দাদাকে বলে দেবে।

ধোবী নিশ্চিন্তে বসতে পারল না। ঘরে কোন জানালা ছিল না। কেরোসিন তেলের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। একটা বিদঘুটে দুর্গন্ধ আসছে। ধোবীর যেন দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ধোবী দরজা খুলল। উঠোনের ওদিকে কোন একজন লোক লণ্ঠনের আলো বাড়াচ্ছে।

—সনিয়া দাদা! ধোবী ভাল করে দেখল। সনিয়াই বটে। সনিয়ারও ঘুম আসছে না। সে-ও ধোবীর মত ছটফট্‌ করছিল।

এই ঘরেই ধোবী তার স্বামীর কোলে মাথা রেখে কিছুদিন কাটিয়েছে। কত অল্প ছিল সেই সময়। দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল। এই ঘরেই তার স্বামী গাঁয়ের জনসেবায় প্রাণ দিয়েছে। আর আজ···? আজ সাবিত্রী অমাবস্যার রাতে ওই ঘরে তাঁর আত্মা ফিরে আসেনি: আজ যে এসেছে, সে হ'ল সনিয়া দাদা।

ধোবী নিজেকে সামলাতে পারল না। আবিষ্ট হয়ে সনিয়ার কাছে চলে এল। সনিয়া চোখ তুলে দেখে— ধোবী!

ধোবী বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করল— কি, ঘুম আসছে না?— সনিয়া ভেতরে গেল। পালঙ্কে বসে বলল— না, ধোবী! বড় গরম আজ।

ধোবীও ভেতরে গেল। কিন্তু পালঙ্কে বসল না। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ কারোর মুখ থেকে কোন কথা বেরল না। দুজনে যেন পরস্পরের মনের কথা ভালোভাবে বুঝতে পারছে। কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। দুজনার ঘাড় ঝোঁকানো। ধোবীর মনের কথা যেন অশ্রু হয়ে ঝরে পড়েছে। অনেক কথা মনে আসছে। কিন্তু মুখ খোলে না। মনের কথা মনেই থেকে যায়।

আর সনিয়া চোখ নীচু করে একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদ্ভুত ধরণের নিঃস্তব্ধতা। শুধু নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ঘাড় তুলে সনিয়া ধোবীর দিকে তাকাল। তার চোখে অশ্রুজলেব ধারা। সনিয়া বলল— কাঁদছো কেন, ধোবী?

বাঁধ ভেঙে গেলে বন্যার জলে যেমন উচ্ছ্বাসে বয়ে যায়, সনিয়ার একটি কথাতেই ধোবীর চোখে অবাধ অশ্রুধারা বইল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। থেমে থেমে সে বলল— সনিয়াদাদা! আমি খুবই অন্যায় করেছি। আমার কপাল পোড়া জীবনে আর কোন্ সুখ রইল? আমি বিধবা। সমাজ, ধর্ম, জাত-আরো অনেক নিয়মের বন্ধনে আমি যেন বাঁধা। নিয়মের এই চৌহদ্দিতে আমি যেন অস্থির হয়ে আছি। আমি এই বন্ধন কি ভাঙতে পারব? বোধ হয় এই নিয়েই অস্থিরভাবে থাকতে হবে।

ধোবী হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সনিয়া বলল— কাঁদছ কেন ধোবী? আমি তো তোমার এই উত্তর শোনার জন্য তৈরী হয়ে এসেছি। তোমার মুখ থেকে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরব। ধোবী আজ থেকে আমি স্বাধীন। আমাকে এখন আর হনুমানের মুখোশ পরে নাচতে হবে না।

ধোবীর চোখ থেকে অবিরাম অশ্রুধারা বইছে। কিন্তু কিছুক্ষণ সে কান্না বন্ধ রেখে সনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সনিয়া যেন হাসছে। ধোবী বুঝতে পারল না, কেন সনিয়া হাসছে।

সনিয়া বলল— তুমি-ই আমাকে জাতের মুখোশ পরিয়েছো, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি-ই আমাকে হনুমান সাজিয়ে নাচিয়েছো। ঘর, জমি, সম্পত্তি তুমি-ই দিয়েছো। হনুমান সেজে কিছুদিন আমি লাফালাফি করলাম। সকলেই তো এমনি করে। সকলের কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকে— স্বার্থ থাকে কিছু-না-কিছু। কিন্তু আমার স্বার্থ ছিল একটু অন্য। তোমার চোখের জলেই আমি তা পেয়ে গেছি— আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। পাগলের মত নকল পৃথিবীতে বেঁচে না থেকে এবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। এবার আমার পাগল ভাব শেষ হবে।

আমি এখন একটা স্বাধীন হনুমান।

সনিয়া তার কথা শেষ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবল—এখানে আর এক মিনিটও থাকা উচিত নয়। সকাল হলেই লোকে জেনে যাবে যে, একজন অপরিচিত লোক ধোবীর বাড়ীতে এসেছিল। সারারাত তার ঘরে ছিল। ধোবীর নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ছাপ পড়বে। লোকে তার ক্ষতি করবে। তার চেয়ে ভাল এক্ষুনি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া।

ধোবী বলল— সনিদাদা! আমার একটা অনুরোধ আছে···।

সনিয়া ঘাড় তুলে ধোবীর দিকে তাকায়।

—তুমি বিয়ে করো, সনিয়া দাদা!

সনিয়া শুনে হেসে ফেলে। বলে— তিন বছর আগে শিবরাত্রির দিন। মনে আছে?

আবার সেই কথা! শিবরাত্রির সেই দুর্বল মুহূর্তের কাহিনী! অনেক অনুতাপ করেও ধোবীর মনে শান্তি আসছেনা, সে তার মন শক্ত করতে চাইছে, কিন্তু পরমূহূর্তে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেউ যেন তার মনের অতল থেকে বলছে— সনিয়ার সমর্থ বুকে মাথা রেখে, তার বলিষ্ঠ হাতের মাঝখানে গভীর ঘুমে মগ্ন হও ধোবী! পৃথিবী কি বলবে? জ্বলতে থাক না পৃথিবী! তার কি প্রয়োজন পৃথিবীর সঙ্গে? সে কেন সনিয়াকে জ্বালাবে আর নিজে জ্বলবে?

ধোবীর শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলছে। উত্তেজনার শেষ সীমায় সে পৌঁছে গেছে। সেকি পাগল হয়ে যাবে?

সনিয়ার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সনিয়া কি বলে— তারই অপেক্ষায়।

সনিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল— এর জন্য চিন্তা করো না, ধোবী। যে কাজ হয়না, যা সম্ভব নয়— মানুষ তাকে সহ্য করে নেয়। তোমার মনে দুঃখ দিতে বা শান্তি কেড়ে নিতে আমি এখানে আসিনি। তোমার সংকল্প স্থির থাকুক। আমি বাধা হবনা।

একটু থেমে সনিয়া বলল— এখন যাবার অনুমতি দাও, ধোবী!

এখানে তোমার বাড়িতে তোমার কাছে যদি বেশিক্ষণ থাকি, তাহলে দুজনেই দুঃখ পাব। দুজনের কষ্ট বাড়বে— দুজনের সংকল্পে বাধা পড়বে। এটাই ভালো আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই।

সনিয়ার কথা ধোবী সহ্য করতে পারল না। ও আবার কেঁদে ফেলে বলল— না, সনিয়াদাদা! তুমি যেয়ো না। তোমাকে আমি কাছে পেয়েছি। এখন আর ছাড়তে পারব না। —কিন্তু বেশী কিছু বলতে পারল না। ছোট মেয়ের মত কাঁদতে লাগল।

ধোবীর মনের ব্যথা সনিয়া বুঝতে পারল। যে উত্তর পাবার জন্যে সে দুর্গাপুরে এসেছে। তা সে পেয়ে গেছে। সে ভেবে দেখল, ধোবী এখনো তার, আর চিরকাল থাকবে। সনিয়ার কথাতেই ধোবী সমস্ত দুঃখ-অপমান সহ্য করে নেবে। কিন্তু সে কেন ধোবীকে কষ্ট দেবে? হয়ত মনের উত্তেজনায় ধোবী তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবীর চোখে হয়ে যাবে কলঙ্কিনী। জেনেশুনে সে কেন এমন করতে দেবে?

ধোবী এখনও তার হাত ধরে রয়েছে। সে আস্তে করে সরিয়ে নিল হাত। অত্যন্ত মমতার সঙ্গে বলল— আমার কথাতো বোঝ, ধোবী! রাগ বা অভিমানে আমি ফিরে যাচ্ছিনা। আমি তোমার মনের দৃঢ়তা, অটল সংকল্পের মহত্ব বুঝি। তোমার আদর্শই আমার আদর্শ। তাকেই সামনে রেখে আমি ফিরে যাচ্ছি।

বল্লী ঝি এসে বলল, বিদেই উঠে পড়েছে। ব্যাস, এই সুযোগ-ই সনিয়ার পক্ষে অনেক। চুপি চুপি বাইরে চলে এল সে। ধোবী পাথরের প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল।

ঘনঘোর অন্ধকার। কি করে এগোয়? ধোবীর অশ্রু-সজল চোখ, কাঁপা ঠোঁট, পাথরের মত নিশ্চল মূর্তি এই অন্ধকারেও সনিয়ার চোখের সামনে নেচে উঠল। যেন তার সামনে দাড়িয়ে ধোবী বলছে— যেওনা, সনিয়া দাদা!

সনিয়া ক্ষনেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। নিজের মনকে অনেক বোঝায় সে। কিন্তু মন মানে না।

পৃথিবীর এই হ'ল মায়া। সনিয়া অনুভব করে, মায়ার বন্ধন কত

দৃঢ়। এই বন্ধন ডোর যখন ধীরে ধীরে বাঁধা হয়, লোকে জানতেও পারে না। কিন্তু পরে যখন তা দৃঢ় হয়ে পড়ে। সে আর মুক্তি পায়না।

এক আবেশে সনিয়া কিছুদূর চলে যায়। —গাঁয়ের এক প্রান্তে এসে পৌঁছয়। অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে, সে দেখতে পেল— দূর-দিগন্ত আলোকিত হয়ে গেছে।

ভোর। অন্ধকার রাত এবার শেষ হবে। কিন্তু কোথায় যাবে সনিয়া? ধোবীর টাকায় সে ঘর তৈরী করেছে। সেখানেই কি ফিরে যাবে? আবার হাল চালাবে? মাটি ভাঙবে? রক্ত-জল করে ফসল ফলাবে?

একটা গাছের নীচে অনেকক্ষণ থেমে রইল সে। কিন্তু সে এমন করবে কেন? আবার যদি আকাল আসে তাহলে, লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর শিকার হবে। বড় লোকের তো মজা। তারা আবার মানুষের রক্ত শুষবে। নিজেদের সম্পদ বাড়াবে। লক্ষ লক্ষ কঙ্কালের মধ্যে সনিয়ার কঙ্কাল পড়ে থাকবে। এইতো হবে শেষ পরিণতি। পরিণতি যদি এই-ই হয়, তাহলে কেন সনিয়া টাকা রোজগার করবে? কেন নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে?

কি করবে? সনিয়ার কিছু মাথায় আসছে না। সে অনুভব করল, এত বড় পৃথিবীতে সে একা। জীবনের কোন উদ্দেশ্য না থাকলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। মানুষকে লক্ষের পিছনে ছুটতে হয়। সেই কারণেই সে অনেক কষ্ট সহ্য করে নেয়।

কিন্তু সনিয়ার সামনে কোন লক্ষই যে নেই। তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। ধর্মে, কল্পিত ইশ্বরে, পূর্বজন্মে বা এই জন্মে। মানুষের মোক্ষে বা নির্বাণে তার কোন বিশ্বাস নেই। ঘর, জমি, সম্পত্তিতে তার ঘৃণা ধরে গেছে। সম্পত্তি দিয়ে কি হবে? কে হবে তার অধিকারী? ওকি আবার ঘর-সংসার করবে? আবার সমাজের একটা মুখোশ পরে নাচবে? কখনই না!

আলো ফুটেছে। পুব আকাশ আলোয় ভরে গেছে। সনিয়ার মন থেকেও ধীরে ধীরে অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। তার মনের গভীর

থেকে কে যেন বলছে— সনিয়া ! তোমার সামনে একটাই মহান লক্ষ্য। রাস্তার ধারে এক মুঠো ভাতের অভাবে যে প্রাণ দেয়, যে অন্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে, যে অসহায় ও অন্যের করুণায় বেঁচে আছে— সেই তো তোমার আপনজন। সে তোমার ভাই, সনিয়া। তোমার সহোদর ভাই !! তাকেই দাঁড় করাতে হবে— তোমার নিজের কোলে আশ্রয় দিতে হবে।

আবেশে সনিয়া নিজের ভিজে চুল ধরে টানে— ভাবে— ধোবী নিজের সম্পত্তি গরীবদের ভাগ করে দিয়েছে ! গাঁয়ের লোকে তার খুবই সুখ্যাতি করেছে। লোকে বলেছে, ধোবী অনেক পূণ্য অর্জন করেছে। পরজন্মের জন্য সঞ্চয় করেছে। পৃথিবীর সব মানুষ যদি সুখে থাকত, কেউ যদি কারো সাহায্য না চাইত, তাহলে পুণ্য অর্জনের ইচ্ছাই থাকত না। লোকের বংশহানির ভয়ও থাকত না।

ধোবী পুণ্য অর্জন করেছে···

এটা ভুল কথা। হ্যাঁ, ধোবী একটা নতুন সমাজ নিশ্চয় তৈরী করেছে। কিন্তু সে নিজে আলাদা রয়েছে। যাদের সে সাহায্য করেছে, তারাও মেতে গেছে টাকার মোহে— বড়লোক হবে। —ছেলে-মেয়েদের চির সুখী করবে।

শেষে এই ভুলটাই কেন বার বার হচ্ছে ?

উত্তর পুরুষের জন্য যারা টাকা বাঁচিয়েছেন, তাঁদের ছেলে-নাতিরা আজ না খেয়ে রাস্তার ধারে মরছে। ভাগ্য যারা বিশ্বাস করে, তারা বলে— এ'হল পূর্বজন্মের ফল। যদি এটাই ঠিক কথা হয়, তাহলে টাকা বাঁচাবার ইচ্ছে জাগে কেন ? ভয়ে ? বংশ হানির আশঙ্কায় ?

ধনহীন, হতভাগ্য, নিরাশ্রয় বা অসুস্থ কোন লোককে দেখলে মানুষ ভয় পায়। ভবিষ্যতে তার বা তার কোন বংশধরের এমন হবেনা তো ? এই ভাবনায় তার বুক কেঁপে ওঠে। এই ভয়ে টাকা বাঁচায়। যদি সবাইকার দু-বেলা ভর পেট খাওয়া আর অঙ্গ ঢাকার মত কাপড় জুটে যেত, তাহলে লোকে কেন টাকা বাচাত ? বাঁচানোর ইচ্ছেই

থাকত না। উত্তর পুরুষের সুখের চিন্তা কখনো মনে আসত না।

সূর্য আকাশে উঠে গেছে। সনিয়া ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ধোবীর কাছ থেকে সে এখন অনেক দূরে চলে এসেছে। সে ভাবল, যে পুনীকে সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ তাকে কাছে ডাকবে। মধু ভোইকে গলায় জড়িয়ে ধরবে। আরেকবার সনিয়ার জাত যাবে। সে অচ্ছুৎ হবে। আবার সে কঙ্কালের মত বেঁচে থাকবে সমাজ থেকে দূরে। লোকে আবার তাকে ঘৃণা করবে। সে তার মুখোশ ফেলে দেবে। হনুমানের পোশাক ফেলে দেবে। কিন্তু সে হবে একজন মানুষ— একজন খাঁটি মানুষ।

সনিয়া সামনের দিকে এগোল। —পুনীর বাড়ির দিকে।

মধুয়া অনেক তাড়াতাড়ি উঠেছে। সনিয়া যখন তার বাড়িতে পৌঁছল, ও তখন ঘরে ছিল না। কাজে চলে গেছে। মধুয়ার বাচ্চাটা এখনো ঘুমোচ্ছে। পুনী গোয়াল থেকে গোবর বের করে, গোয়াল পরিষ্কার করে বেরোচ্ছিল। বেরোতেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে সনিয়া। দাদা? তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে ভাবল, স্বপ্ন দেখছি না তো?

সনিয়া আরো কাছে এল। ভালো করে দেখল তার আদরের বোন পুনীকে। ওকেই তো সে কোলে করে খাইয়েছে। পুনী একটু বড় হয়ে গেছে। কিন্তু সুন্দর হয়েছে— আর কোন পরিবর্তন তার চোখে পড়ল না। সেই চোখ, সেই নাক, সেই ঠোঁট, তেমনিই গভীর দৃষ্টি— যেমনকার তেমনি আছে।

কিন্তু মনের বদল হয়েছে?

পুনীর জাত বদলে গেছে। কাঙাল হবার পরে পুনীর নিজের জাতে ফেরেনি। এখন সে মধু ভোইয়ের স্ত্রী। তবুও পুনী সেই পুনী-ই আছে। এখনো পর্যন্ত সনিয়া তাকে কেন আপন করে নেয়নি?

সে খুব মৃদু স্বরে ডাকল— পুনী !!

সনিয়া বোধ হয় আরো কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার স্বর আটকে গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছেনা। চোখে ভরে উঠেছে জল।

আপন ভাইয়ের মুখে আদরের ডাক শুনে পুনীও নিজেকে ভুলে গেছে। তার মনে যেন অভিমানের জোয়ার এসেছে। একটা কাটা-গাছের মত ভাইয়ের পায়ে গিয়ে পড়ল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সনিয়ার দু-হাতে তাকে তুলে ধরল।

কিন্তু পুনীর কান্না বন্ধ হ'ল না। সনিয়ার বুকে মাথা রেখে সে কাঁদল। পরিবারের সবার কথা তার মনে পড়ল— বাবা, মা, ছোট বোন কুনী আর ছোট ভাই— আকালে যারা দুর্বল শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আকালের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখের সামনে খেলে গেল। কোথায় গেল তারা সবাই? এখন কোথায়? পুনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সনিয়া তার পিঠে হাত বুলোয়। তার চোখে জল উপচে পড়ছে। সে বলল— চুপ কর, পুনী! আমি একটা মিথ্যের পেছনে শুধু শুধু ছুটছিলাম। যত আশা ছিল আমার, তাও ভুল। মনুষ্যত্বকে দলে ফেলে-ছিলাম আর ছায়ার পেছনে ছুটছিলাম।

এখন আমার ভুল ভেঙেছে, পুনী!

পুনী সনিয়ার বুক থেকে মুখ তুলে জলে-ভরা চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

—মধুয়া কোথায়?— সনিয়া জিজ্ঞেস করল। পুনী কোন উত্তর দিল না।

—তোর একটা মিষ্টি বাচ্চা আছে না? কোথায় সে? পুনীর উত্তর দেবার আগেই ভেতর থেকে বনা-র কান্নার শব্দ এল। একটা ছেঁড়া চাটাইয়ে পড়ে থাকা একটা ময়লা কাঁথায় বনা শুয়ে। যার রক্তে বনেই পরিভার রক্ত, সেই বনা ভোই ছেঁড়া কাঁথায় হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে। সেই তো বনেই পরিভার এক জলজ্যান্ত প্রতীক। সনিয়ার মনে হল, তার বাবা বনেই পরিভা আবার শিশু হয়ে স্বর্গধাম থেকে ফিরে এসেছেন। বনেই পরিভা তো তার বাবা ছিল। তার পূর্ব পুরুষদের সময়ে পরিভা বা স্বাঁইয়ের মাঝখানে কোন ভেদ ছিল না। —সব মানুষ

সমান ছিল। সবাই একই জাতের— এক ধর্মের সন্তান।

সনিয়া বনাকে কোলে নিল। কিন্তু বনা চুপ করল না। সনিয়া তখন পুনীর কোলে দিয়ে দিল তাকে।

সনিয়া পুনীর ঘরের ভেতরে এল। পুনী ভাবল, লোকে হয়ত আবার দাদাকে জাতের বাইরে করে দেবে। সে আবার সমাজচ্যুত হয়ে থাকবে। লোকে তার নামে দুষবে। কি করবে এখন? পুনী ভীষণ ভয় পেল।

কিন্তু সনিয়া তার মনের কথা বুঝেছে। সে হেসে বলল— রাগ করেছিস আমার ওপর? ছোট বেলায় তুই এমনি ভাবেই রাগ করতিস। কিন্তু তোর এক মুহূর্ত-ও তা থাকত না।

পুনী তার বাচ্চাকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। —বলল-দাদা!

কিন্তু কথাটা তার গলার মধ্যেই আটকে গেল। সনিয়া তার বড় ভাই— দেবতুল্য। তাকে এখন কি করে বলে— দাদা! তুমি চলে যাও। আমি তোমার বোন নই। যে পুনী তোমার বোন ছিল, সে মরে গেছে···।

সনিয়া লক্ষ্য করল পুনীর মুখটা মলিন হয়ে গেছে। তার মুখে যেন অনেক দুঃখের ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। স্নেহে জিজ্ঞেস করল সনিয়া— তোর অভিমান কি ভাঙবে না, পুনী? ছোটবেলার কথা মনে আছে? অনেক ভুল তুই করেছিস, কিন্তু আমি অভিমান করিনি! কখনো আমার রাগ দেখাইনি, মনে আছে?

একটু থেমে সনিয়া বলল— আচ্ছা, বল তো, কতবার আমি তোর কান মলে দিয়েছি, কটা চড় মেরেছি তোর গালে? তারপর কতবার তোকে কোলে নিয়েছি? কতবার তোকে আদর করেছি? আছে মনে?

পুনী অনুভব করে এক অপূর্ব আবেগকে, তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। সনিয়া দাদা কেন পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে? কি উত্তর দেবে সে?

সনিয়া আবার বলল— আমি নিশ্চয়ই বড়। কিন্তু তাতে কি? বড়-ভাইও ভুল করতে পারে। আমি খুবই ভুল করেছি। জাত, ধর্ম বা সম্পত্তির লোভকে তোর কাছ থেকে দূরে হটাতে পারিনি। আমাদের দুজনের মাঝখানে যে দেয়াল ছিল— তা ছিল মোহের— অজ্ঞানতার দেয়াল। সেটা আজ ভেঙে গেছে. পুনী। আমি আবার ফিরে এসেছি তোর কাছে। বসে আছিস কেন? যা, ওঠ! তোর মায়ের পেটের ভাই তোর বাড়িতে এসেছে। আনন্দ কর এটা কাঁদবার সময় নয়! ওঠ্…!

পুনী উদ্বেগে দুঃখে ভাইয়ের দিকে তাকায়। সনিয়া আবার বলে— কথা শোন্! তোর ভাইয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। বাটিতে একটু পান্তা নিয়ে আয়। তোর হাতের পান্তা খেলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

—এ তুমি কি বলছ, দাদা?— পুনী বলল— এখন আমি অছুঁত। তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, আমার বাচ্চাকে কোলে নিয়েছ— এই কি আমার কাছে যথেষ্ট নয়? আকাশের চাঁদ পেলেও এত খুশী হতাম না, আজ যতটা হয়েছি! পূর্ব জন্মে আমি নিশ্চয়ই পুণ্য করেছিলাম। তাই তোমার বোন হয়ে জন্মেছি। কিন্তু আমি অনেক পাপ-ও করে থাকব। তাই অছুঁত হয়ে গেলাম। এত লোক আকালে মারা গেল। ভগবান জানেন আমার কেন মরণ হল না। শ্মশানে অসহায় ভাবে পড়েছিলাম। শেয়াল কুকুরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে অছুঁত বাউরী মধু ভোই তার ঘরে নিয়ে এল। তার সঙ্গে আসা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। প্রাণে বেঁচেছি। বাউরীর ঘরে রয়েছি। আর, আমার পেটে এই কলঙ্ক জন্মেছে। এখন কি করব আমি? নরকেই ছট্‌ফট্ করছি। এখন এই অবস্থায় কোন মুখে তোমার কাছে যাই? এজন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতেও যাইনি! চোখের জল মুছে পুনী আবার বলে— অনেকবার ভেবেছি আমি আত্মহত্যা করব। কিন্তু করতে পারিনি। যে আমাকে মরার মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, নিজে আমার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করেছে, আমার কোলে একটা বাচ্চা দিয়েছে।

তাকে যেই দেখতে পেতাম— মরার সমস্ত উৎসাহ শেষ হয়ে যেত।

সনিয়া উদ্বেগের সঙ্গে পুনীর দিকে তাকিয়ে বলল— তুই ভুল বুঝেছিস, পুনী। যে তোকে জীবন দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে, সে তোর স্বামী— দেবতা! তোর এই সন্তান কত পবিত্র! মানুষের সন্তান সব সময়ই পবিত্র হয়। সে কলঙ্কের নয়, লজ্জার নয়। তোর সংসার সত্যিই খুব সুন্দর।

পুনী অস্থির হচ্ছিল। সে বলল— এ রাস্তায় লোক যাতায়াত করে। তুমি এখান থেকে চলে যাও, দাদা! লোকে তোমায় দেখে ফেললে তোমাকেও 'অছুঁত' করে দেবে।

—এসবে আমি লোকের ভয় করিনা।

—না, না, এ-কথা বলোনা, দাদা। পরিভা বংশ কি নষ্ট হয়ে যাবে? সাত পুরুষের আত্মাদের জল দেবে কে? বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাবে কে? আমি তোমার পায়ে পড়ি, দাদা! তুমি এখান থেকে চলে যাও। তুমি ঘর-সংসার করো, বাপ-ঠাকুর্দার নাম রাখো। তোমাকে সুখী দেখে এই নরকেও আমার শান্তি হবে।

সনিয়া ভাবল, কত নির্বোধ পুনী। সমাজের অত্যাচারেই সে নিজেকে অছুঁত মনে করে। একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে— একটা দেব শিশুর মত পবিত্র সেই শিশু। এখন ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভই বা কি? যে স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দেখছে, যার মাথায় দেবতার ভূত চেপে আছে— তাকে সত্যের আলো দেখানো মিথ্যে। সেই আলোতে তো ওর চোখ ঝলসে যাবে। লাভ কিছু হবে না।

সনিয়া আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল। পুনীও উঠে দাঁড়াল। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটু সরে গেল।

সনিয়া পুনীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখল না।

সূর্য উঠে গেছে আকাশে। গাঁয়ের গলিতে গলিতে অনেক লোক এসে পড়েছে। সনিয়ার মনে একটাই চিন্তা বার বার এ'ল— সহোদর বোন পুনী-ও তাকে ত্যাগ করল।

পুনী তার বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল: পরিভা বংশের পবিত্র রক্ত ধারার অনেক সন্তান সনিয়াকে অনুধাবন করছে।

পুনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনে তার অনেক কথা খেলে যায়। পরিভা বংশ যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। এত বড় যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না।

ধোবীর কি করা যায়, ধোবীর মা সেই চিন্তাই করছিলেন। সারারাত তিনি কেঁদেছেন। সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি।

রোদ উঠেছে। সকালের ধোয়া-মোছার কাজ চাকরেরা করে নিয়েছে। কিন্তু ধোবীর মা মুখও ধোননি। নিধির স্ত্রী পা টিপে টিপে ঘরে এল। নিজের বড় জাকে পা টিপে দিয়ে বলল— ওঠো দিদি! তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? ওঁনার ওপর রাগ করে তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। তিনিও রাগ করে সকাল-সকাল দুর্গাপুরে চলে গেলেন।—

—সকালেই আমি দেখলাম, বাইরে পালকী রাখা। বেয়ারা-ও ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? শুনলাম, উনি দুর্গাপুরে যাচ্ছেন। এখন তিনি বেরিয়ে পড়েছেন।

ধোবীর মা নীরবে কিছু ভাবতে আরম্ভ করলেন। ছোট বলল— চলো না, দিদি! কাল থেকে তুমি কিছু খাওনি। আমার দিব্যি তোমায়। চলো না··· !

ধোবীর মা ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়ে বললেন— এই ভগবান-ও এত নিষ্ঠুর, আমার প্রাণ নেন না। এখন আমার ভাগ্যে কি আছে একটু থেমে বললেন— নিধি কোথায়।

—বাইরে।

—যাও, ওকে ডাকো।

ছোট চলে গেল। পালঙ্কের ওপর বসে ধোবীর মা ভাবেন সকাল-সকাল ওর দুর্গাপুরে যাবার কারণ কি? একটু পরে নিধি এলে তিনি

এই কথাই জিজ্ঞেস করলেন।

—আমাকে দাদা তো কিছু বলেন নি, বৌদি! —নিধি বললেন।

ধোবীর মা অসন্তুষ্ট হলেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি বললেন—কিছু বলেন নি? আমাকে লুকোচ্ছ, না? সব গোলমালের মূলে তুমি, বুঝেছ? তুমি যদি ওর কথায় সায় না দিতে, যদি বেঁকে বসতে, তাহলে আমার ধোবীর কি মোটেই আটকাত!

নিধি কিছুই বললেন না। তিনি ভাবলেন— দাদা আর বৌদি দুজনেই পূজনীয়। তাঁদের সামনে তর্ক করা ঠিক নয়। কিন্তু তার স্ত্রী এই চুপ-করে থাকায় খুবই অসন্তুষ্ট হ'ল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধোবীর মা আবার জিজ্ঞেস করলেন— চুপ করে আছো যে?

নিধি উত্তর দিলেন— সত্যি, দাদা আমাকে কিছু বলেননি। সকাল সকাল উঠেই তিনি চলে গেলেন। আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি উনি কেন গেছেন। এবার উনি বিদেইকে দত্তক নেওয়াতে ধোবীকে বাধ্য করবেন। তোমার কি এতে মত আছে?

একটু হেসে বললেন নিধি— এর চিন্তা করো না, বৌদি! আমার প্রাণ থাকতে এ'কখনো হবে না।

—সত্যি?

—সত্যি বলছি, বৌদি! এ আমি করতে দেবনা। দাদা যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও চলে যাব। এই সম্পত্তি দাদা করেছেন। তাতে আমার কোন ভাগ নেই। যে বাড়িতে অশান্তির আগুন সব সময় জ্বলছে, সেখানে থেকে আমি তোমাদের মনে দুঃখ দেবনা। দাদা অসন্তুষ্ট হবেন, হতে দাও। আমি তার সম্পত্তি চাইনা। আমি মজুরী করে যা পাব বাচ্চাদের মুখে তুলে দেব।

নিধির কথা শুনে ধোবীর মা রেগে উঠলেন। যেন তার চোখ থেকে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে। বৌদিকে এই ভাবে কখনো দেখেননি। তিনি খুবই ভয় পেলেন।

গর্জে উঠে ধোবীর মা বললেন— চুপ করো, নিধি! বাচ্চারা সব তোমার? তুমি কোলে-পিঠে করে কি ওদের বড় করেছ? ওদের কখনো কোলে করেছ তুমি? ছোট জা ওদের জন্ম দিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কার কোলে ওরা মানুষ হয়েছে? কার বুকের দুধ খেয়েছে?

ধোবীর মা কাঁপতে লাগলেন। যে চোখ দিয়ে তার আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছিল, এবার কিন্তু তাতে অশ্রুধারা বেয়ে নামল।

বৌদির কথাশুনে নিধির দুঃখ হ'ল। আক্ষেপে আশঙ্কায় যেন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, তার প্রিয় বৌদির মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। বৌদিকে তিনি মায়ের মত দেখেছেন কখনো তিনি তাঁকে এমন কথা বলেননি তিনি ঘরের লক্ষ্মী। তাঁরই স্নেহ ভালবাসায় বাড়ির বাচ্চারা সব মানুষ হয়েছে। আজ বৌদির মনে কেন আঘাত করল?

ধোবীর মা আবার বললেন— নিজের ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কিংবা তার রক্ত চক্ষুকে ভয় পেয়ে যদি বাড়ি ছাড়তে চাও, তাহলে তুমি যেতে পারো। যে নিজের ক্ষমতা জানে না, তার মাথা ফাটিয়ে মরা উচিত। কিন্তু আমার ছেলে মেয়েদের কথা বলছো কেন? যেতে হয় তো চলে যাও! ছেলে-মেয়েদের কথা তুললে, এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব, বলে দিচ্ছি।

উত্তেজনার পরে ধোবীর মা চুপ করে গেলেন। নিধি হাত জোড় করে বললেন— বৌদি, আমি তোমার ছেলেমেয়েদের কথা তুলব না। তুমি তো জানই দাদা কত অভিমানী। তাঁর কথা কেউ না শুনলে খুবই বেঁকে বসেন। যা-কিছুই করো, হাজার মিনতি করো— শুনবেন না। বিদেইকে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চয় বাধা দেব। কিন্তু দাদা যদি না মানেন তাহলে বলো কি করব? বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই যে। তাই স্থির করেছি, আমি চলে যাব।

আবার ধোবীর মা চীৎকার করে উঠে বললেন— কোথায় চলে যাবে শুনি? তুমি কি ভেবেছ, আমার লাশ নিয়ে পরের কাঁধে চড়ে

শ্মশানে যাব? আমি কি তোমার জন্যে কিছু করিনি? আমি আবার বলে দিচ্ছি এ হতে পারে না। আমার লাশ তুমি নিজের কাঁধে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে, তারপর যা ইচ্ছে হয় করো।

একটু থেমে ধোবীর মা বললেন— আচ্ছা, ঠিক আছে, আজ থেকে আমি ধোবীর নাম পর্যন্ত করবনা। বলতে কি জন্মই দিয়েছি— আমি, কিন্তু কোলে পিঠেমানুষ করেছ তুমি। যেদিন ও বিধবা হল, ধরে নাও, সেদিন থেকে আমার কাছে ও মারা গেছে। হ্যাঁ ও মারা গেছে···মারা গেছে।

বৌদির এই মনের অবস্থা নিধির সহ্য হ'ল না। বাড়িতে ধোবীই ছিল ছোটদের মধ্যে সবার বড়। ধোবীকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। ধোবীর পরে আরো তিনজন বাচ্চা এ বাড়ীতে হয়েছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে নিধির যেন কোন সম্পর্কই ছিল না। বাস্তবে দাদার প্রতিটি কথা এ-ভাবে মেনে নেওয়া, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা না বলা উচিত হবে না। একটা কিছু তাকে করতেই হবে। তিনি ভাবলেন ধোবীর বিয়ে সনিয়ার সঙ্গে দিতেই হবে। এতে যদি দাদার সঙ্গে ঝগড়াও হয়, তো হোক···।

নিধি দুঃখে বসে পড়েন। বৌদির পায়ে মাথা ছুঁয়ে বলেন— ধোবীর ব্যাপারে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, বৌদি। চিরটাকাল দাদার অন্যায় সহ্য করব না। তোমার পাছুঁয়ে বলছি, ধোবীর বিয়ে নিশ্চই হবে আর সনিয়ার সঙ্গেই হবে।

বিদেইয়ের মা দেয়ালের পাশ থেকে দেখছিল। নিধির কথা শুনে বিরক্ত হয়ে রান্না ঘরে চলে গেল।

কিযে হচ্ছে, ধোবীর মা মাথা তুলে দেখলেনও না।

দেখতে দেখতে পাঁচ দিন কেটে গেছে। সনিয়া কোথায় চলে গেছে? রহিম অস্থির হয়ে পড়েছে। কিছুই বলেনি, অথচ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। বিশি সামলের কাছে সনিয়ার সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞেস করেছে। বিশিও কিছু বলতে পারেনি। সে ওখানকার লোকেদের জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু সবাই একই উত্তর দিয়েছে— আমি দেখিনি।

রহিম তার কাজে কোনো ত্রুটি করেনি। বিশিকে সঙ্গে করে তরকারির বাগানের কাজ করেছে। বাড়ির দেখাশুনা করেছে আর বাইরেই সামান্য ভাত ফুটিয়ে খেয়েছে। রাতে নারকেল পাতার চাটাই বিছিয়ে ঘুমিয়েছে। সকাল হলেই রহিমের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

নিধি স্বাঁই বার বার খবর পাঠিয়েছেন। তিনি নিজে এসে দেখে গেছেন। কিন্তু সনিয়ার কোন খবর পাওয়া যায়নি। রাম প্রহরাজ-ও দু-একবার এসেছেন। উনি বলেছেন, 'রাজ'-উৎসব খুবই কাছে এসে গেছে। তাঁর মতে 'রাজের' আগে দু-তিন রাত রামলীলা হওয়া উচিত।

জমিদারের গোমস্তা গোবিন্দ প্রধান সনিয়ার কাছে খবর পাঠিয়েছেন, সে যেন তার পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে পাঠায়। মাছ-ধরার জন্যে কয়েকজন লোকও জাল নিয়ে এসেছে। কিন্তু রহিম তাদের মত দেয়নি। সনিয়া তাকে কিছু বলেনি। তার অনুমতি ছাড়া সে কি করে মাছ ধরে?

গাঁয়ে যে পাগলীটা ঘুরে বেড়ায় সে সনিয়ার বাড়ি এসে বলেছে— সনিয়া আমার বর আর আমি ওর বৌ। আমি এখানেই থাকব। এটাই তো আমার বাড়ি। কিন্তু গাঁয়ের বাচ্চারা তার পেছনে লেগে তাকে উত্যক্ত করেছে।

রহিম তাকে খাবার খাইয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা একটানা তালি বাজিয়ে— তার পেছন পেছন ছুটেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে—'কঁই' পাগলী— 'কঁই' পাগলী— 'কঁই' পাগলী।

সনিয়া কোথায় চলে গেল? রহিমের কিছু মাথায় আসছে না।

ধোবী শরীর আর মনের যন্ত্রনায় অস্থির হচ্ছিল। যে ঘরে একদিন হরি মহান্তি মরার আঙুলের ছাপ সাদা কাগজে নিয়েছে, সেইখানেই ধোবী শুয়ে রয়েছে। চিন্তেই স্বাঁই তার কাছে বসে আছেন। একটু দূরে আলো জ্বলছে।

চিন্তেই স্বাঁই গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। অসংখ্য চিন্তা মাথায় ঘুরছে। জীবনে তিনি যে কাজ করেছেন, তার কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল— বার বার তিনি তার হিসাব করছে।

তাঁর একমাত্র মেয়ে ধোবী আজ যন্ত্রণার জ্বালায় বিছানায়। মনে হয়, যেন গতকালই তার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তার ভালোর জন্যে তো তিনি কখনো ভাবেন নি। সব সময় তিনি টাকা-পয়সা জমি-সম্পত্তি— এই সবের ধান্দায় মেতে ছিলেন। নায়ক পরিবার ও স্বাঁই পরিবারের সম্পত্তি এক করার ব্যাপারে তিনি কতই না চক্রান্ত করেছেন। কিন্তু সব বিফল হয়ে গেছে। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি দুর্গাপুরে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বিদেইকে দত্তক নেবার ব্যাপারে ধোবীকে নিরুপায় করবেন। সে অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এখন যদি কিছু কাজ না করা যায়, তাহলে বাকীটুকুও নয়-ছয় হয়ে যাবে।

দুর্গাপুরে পৌঁছুতেই হরি মহান্তি সব জানিয়ে দিয়েছেন। ঝিয়েদের ডেকে চিন্তেই স্বাঁই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। কালরাতে সনিয়া এসেছিল। সকাল হবার আগে চলে গেছে। তার কাদামাখা কাপড় এখন বারান্দার নীচে পড়ে আছে। কথাটা তুচ্ছ। কিন্তু বলার ঢঙে বড় হতে পারে। একটু ভুরু কঁচকে বললে তার অনেক অর্থ হতে পারে। বলার ঢঙে 'হ্যাঁ' কে 'না' আর 'না' কে 'হ্যাঁ' করা যায়— পূর্ণিমার রাতকে অমাবস্যার অন্ধকার করে ফেলা যায়।

অন্ধকার? হ্যাঁ, চিন্তেই স্বাঁইয়ের মনে অন্ধকার ছেয়ে আছে। তিনি সব কিছু শুনেছেন। রাগে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে যেন! ভাবলেন, এই কারণেই ধোবী তার কাছ থেকে দূরে আছে। সনিয়া কি এখানে প্রত্যেক দিন তার কাছে আসে? একদিন সে লোকের চোখে পড়ে গেছে। কিন্তু এর আগে হয়ত বার বার এসেছে। সনিয়া আকালের কবল থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। বহু কষ্টে তার প্রাণ বেঁচেছে। জাতে ফিরে, বাড়ি করে, সম্পত্তিও করেছে সে — কিন্তু এত সম্পত্তি হল কোত্থেকে?

ধোবী কি কিছু দিয়েছে?

বার বার চিন্তেই স্বাঁই এ-কথাই ভেবেছেন— ধোবী কি সনিয়াকে টাকা দিয়েছে? কত লজ্জার কথা। একমাত্র মেয়ে ধোবী শেষে তার মাথা হেঁট করালো? হ্যাঁ, এক ফুঁয়ে সনিয়া ও তার সম্পত্তি তিনি

উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এই কলঙ্ক তো ঢাকা যাবেনা। কি করা যায় এখন ?

বল্লী ঝি এসে বলল— মা ঠাকরুণ তো এনখো ঠাকুর ঘরে পড়ে আছেন। থেকে থেকে ছোটদের মত কাঁদছেন। এতক্ষণ হয়ে গেল তবু দরজা খুলে বেরচ্ছেন না।

চিন্তেই স্বাঁই ভাবলেন, এ-অবস্থায় ধৈর্য হারানো উচিত নয়। তাড়াহুড়োতে কোন কাজের ফল ভাল হবে না। লোকেও দেখে হাসবে। ধোবীর এখানে আর এক মিনিট থাকাও ঠিক হবে না। তিনি বললেন— তোদের মা ঠাকরুণ উঠলে বলে দিস যে, ওর মায়ের শরীর ভালো নয়। আমি ওকে নিতে এসেছি।

মন্দিরে উঠেছেন চিন্তেই স্বাঁই। তার মনে হচ্ছে, যেন প্রতি মুহূর্তে তার দেহটা ভার হয়ে যাচ্ছে। বিদেইও দু-একবার এসে ফিরে গেছে। জ্যাঠামশাইকে সে খুবই ভয় করত। তাই সে তাঁর কাছে ঘেঁষেনি। চিন্তেই স্বাঁই-ও তাকে ডাকেননি।

দুপুর বেলা। বল্লী এসে খবর দিল মা ঠাকরুণের খুব জ্বর। গায়ের তাতে ধান ফুটে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। উনি চোখ-ও খুলছেন না।

চিন্তেই স্বাঁই ভাবলেন, ধোবী বিষ্ণুপুরে যেতে চাইছে না। এই কারণে জ্বরের অজুহাত তৈরী করেছে। কিন্তু যা কিছুই হোক, নিজে গিয়ে দেখা উচিত। তিনি দেখতে চাইলেন।

আরে ! এতো সত্যিই জ্বর। তিনি ডাকলেন— ধোবী !

ধোবী চোখ খুলল। সে ক্লান্ত। পালঙ্কের ওপর উঠে বসল। চিন্তেই স্বাঁইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। বাবার হাত ধরে সে খুব কাঁদল আর বলল— মায়ের কি হয়েছে বাবা ? আমি যাবো, নিশ্চয় যাবো।

চিন্তেই স্বাঁই ভাবনায় পড়ে গেলেন, এবার কি বলবেন ? থেমে থেমে বললেন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, ধোবী। সামান্য কিছু হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। তোর খুব জ্বর। এখন তুই যাবি কি

করে ? জ্বর কমে গেলে, কাল কি পরশু যাব।

ধোবী চুপ করে থাকে।

জ্বর কমে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে ধোবী। চিন্তেই স্বাঁই তার সমস্ত রাগ-অভিমান ভুলে গেছেন। তিনি ধোবীর সেবা করছেন। তিনদিন পরে ধোবীর গায়ে বসন্তের গুটি দেখা দিল। সারা মুখ ঘায়ে ভরে গেছে। খুবই কষ্ট হচ্ছে। ধোবী বিছানায় পড়ে আছে। চিন্তেই স্বাঁইয়ের মন নরম হ'ল।

আশেপাশের গাঁয়ে বসন্ত ছড়িয়ে গেছে। দুর্গাপুরেও দু-তিনজন লোক মারা গেছে। চিন্তেই স্বাঁই খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। অনেক চিন্তা তাঁর মনে জাগছে। তিনি ভাবছেন, যদি ধোবী মারা যায়, তাহলে নায়ক পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। যদি থেকেও যায়, তাতে লাভ কি ? যার জন্যে তিনি সম্পত্তি রাখতে চান, সেই তো থাকবে না !

চিন্তেই স্বাঁই নিজের চিন্তাতেই নিজে চমকে ওঠেন। নায়ক পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি নেবে কে ? ভোগ করার জন্যে কেউ থাকলে, তবে তো। মানুষ তো সম্পত্তি ভোগ করে না।

বাঁচার জন্যে তার কি প্রয়োজন ? শুধু আহার আর বস্ত্র। এগুলো যদি থাকে, তাহলে থাকুক বা না থাকুক— তাতে কি এসে যায় ? লোকে সম্পত্তি করে কেন ? সেই দিয়ে শুধু রোজগারের কাজই হয়। স্বাঁই তো বুড়ো হয়ে গেছেন। এখন ধোবী যদি মারা যায় তবে সম্পত্তি করার আর কি কোন বাসনা পূর্ণ হবে ?

চিন্তেই স্বাঁই ভাবছিলেন। এই কারণেই তাঁর অনেক কথা মনে হয়েছে আর তিনি শিউরে উঠেছেন। হ্যাঁ, সম্পত্তি যদি থাকে তো নিধির ছেলে বিদেই সুখে ভোগ করবে। তাতে কি হবে ? বিদেই তার ছেলে নয়। নিধি তার মায়ের পেটের ভাইও নয়।

রক্ত-ধারা এত গভীরভাবে থাকতে পারে না। দিনের পর দিন তা ক্ষীণ হয়ে আসে। ভবিষ্যতে আরো অনেক লোকের রক্ত-ধারা চিন্তেই স্বাঁইয়ের উত্তরাধিকারীদের রক্তে মিশে যাবে। তাদেরকে

কয়েকপুরুষ পরে অনেকেই বলবে— এরা আমাদের বংশজাত। এই তো পৃথিবী !

ধর্ম, বর্ণ, জাত— এ'সবের কি অর্থ আছে ? হাজার বছর পরের মানুষ কিভাবে নিজের পরিচয় দেবে ? সে বোধ হয় নিজেকে চিনতেও পারবে না। সেই সময় হয়ত সে এ-কথাই বলবে— আমি একজন মানব সন্তান— সবাই আমার পিতা— সবাই আমার পুত্র। মানুষ আমি— মানুষ ! এই ক্ষুদ্র পৃথিবীই আমার ঘর। এই ঘরে যাকিছু আছে, সব আমার— অর্থাৎ মানব সন্তানের ! আমারই মত পিতাদের ও পুত্রদের। সবাই এই সম্পত্তি ভোগ করবে। এখানে সকলের বাঁচার অধিকার আছে।

চিন্তেই স্বাঁই ভাবলেন, তিনি ভুল করেছেন। নায়ক-পরিবারের সম্পত্তির লোভ যদি ছেড়ে দিতেন, পরিভা পরিবারের ওপর ঈর্ষা ত্যাগ করে যদি তিনি ধোবীর বিয়ে সনিয়ার সঙ্গে দিতেন, তাহলে সত্যিই ভালো হত। ঘরে আজ এই অশান্তি থাকত না।

ধোবী পাশ ফিরে শুল। সারা গায়ে রোগ আর জ্বর— যন্ত্রনায় সে ছট ফট করছে। কাতরাচ্ছে। আওয়াজ শুনে স্বাঁইয়ের চিন্তার ধারা ছিঁড়ে গেল। চমকে উঠে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তিনি বললেন— ধোবী ! কি কষ্ট হচ্ছে, মা ?

—উঁ — উঁ — উঁ — ধোবী শব্দ করল। এছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

—কি হয়েছে, মা ?

ধোবী আবার পাশ ফিরে শুল। কোন উত্তর দিল না।

চিন্তেই স্বাঁই একদৃষ্টে ধোবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এখনো পর্যন্ত নিধিকে কোন খবর পাঠান হয়নি। খবর পেলে ধোবীর মা পর্যন্ত ছুটে আসবেন। চিন্তেই স্বাঁই ভাবলেন, এ অবস্থায় ধোবীর মায়ের আসা প্রয়োজন। তা না হ'লে মেয়ের সেবা করবে কে ?

পরের দিন চিন্তেই স্বাঁই বিষ্ণুপুরে চিঠি লিখলেন। ধোবীর মাকে নিয়ে নিধি দুর্গাপুরে পৌঁছল। চিন্তেই স্বাঁইয়ের ইচ্ছানুযায়ী

বিদেই বিষ্ণুপুরে গেল। তিনি বললেন— যে বাড়িতে মায়ের দয়া হয়েছে, সেখানে বিদেইয়ের মত ছোট ছেলের থাকা ঠিক নয়। নিধিকে বিষ্ণুপুরে ফিরে যাবার জন্যে বললেন চিন্তেই স্বাঁই। নিধি তাঁর কথা না শুনে দুর্গাপুরে থাকাই স্থির করলেন।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাঁচদিন ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে সনিয়া বাড়ি ফিরল। সে এসেছে এক নতুন আদর্শ নিয়ে। রহিম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কঁই পাগলীর কথা ভাবছিল। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সে একটা কথাই আওড়ায়— এটা আমার বাড়ি— সনিয়া আমার বর। রহিম তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে। কিন্তু সে মানলে তো! রহিম তাকে খাইয়ে-দাইয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।

—সনিয়া দাদা! —দূর থেকে সনিয়াকে দেখে অস্থির হয়ে উঠল। সনিয়ার ঠোঁটে যেন পঞ্চমীর চাঁদের হাসি। তার শরীরে যেন নতুন সংকল্পের— নতুনআদর্শের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রহিমের চোখে জল এসে গেছে। কিন্তু সনিয়ার চোখে তা পড়ল না। ব্যাকুল হয়ে রহিম বলল— তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে, সনিয়া দাদা?

রহিম যে নমস্কার করতেই ভুলে গেছে। তার মন চাইছে, সে সনিয়া দাদার হাত ধরে তার গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বংশানুক্রমিক রীতি তাকে থামিয়ে দিল।

রহিম বিধর্মী— মুসলমান। এই দেশেই তার জন্ম। কিন্তু তার জ্ঞাতি ভাইদের পশ্চিমের রেগিস্তানের দিকে নজর। তারা যেন ওখান থেকেই এসেছে। জন্ম নেওয়ার বাইরে যেন এদেশে অতিথি হয়ে আছে। সনিয়ার জ্ঞাতি ভাইয়েরা রহিমকে দূরে রাখে কেন? সে-ও ভারত মাতার সন্তান।

মানুষ তার ধর্ম বদলাতে পারে, কিন্তু রক্ত বদলাতে পারেনা। ধর্মের সঙ্গে রক্ত বদলে যায় না— বাপ-মা বা পূর্ব পুরুষ বদলে যায় না। মানুষ তার খাদ্য বদল করে পশু হয়ে যায় না।— মানুষই থাকে।

ধর্ম বদলে গেলে মায়ের পেটের ভাইবোন শত্রু হয়ে যায় না।

রহিমকে অচ্ছুঁত করেছে কে? সনিয়া! রহিম নিজেকে ছোট ভাবে— বিদেশী মনে করে। এক ঘরে থেকেও সে নিজেকে সনিয়ার থেকে পৃথক মনে করে। কিন্তু কেন?

—এতদিন কোথায় ছিলে, সনিয়া দাদা।

সনিয়া রহিমের হাত ধরে বলে— আমি বিপথে চলে গিয়েছিলাম, রহিম। এবার আমি নিজের পথ দেখতে পেয়েছি। চল, ঘরে চল।

দুজনে ঘরে ফেরে।

সেই দিন— রাতে—

একটা থালায় ভাত বাড়া হল। রহিম এই কথাতে সায় দেয়নি। সে বলেছে— না, সনিয়া দাদা, তোমার জাত চলে যাবে। তোমার ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। লোকে তোমায় আবার ঘেন্না করবে। তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

সনিয়া বলেছে— ওরে, রহিম, আমি পাগল ছিলাম। এখন ঠিক হয়ে গেছি। এই ঘরে এই ছাতের নীচে যে-ই আসবে, এই খাবারই খাবে— এই থালাতেই। বুঝলি কি?

সনিয়া আবার বলেছে— সবাইকে খাটতে হবে। সবাই ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করব। আর ধরিত্রী মায়ের কোল থেকে নিজেদের আহার বের করব। যে আহার বের করবো, সকলে মিলে তা খাব। কেউ কারো ধর্মে, কারো আচরণে বাধা দেবেনা। একে অন্যকে ভালবাসবে, সম্মান দেখাবে। পৃথিবীর লোকে যাকে ঠোকর মারবে, লাথি মেরে মেরে তাড়িয়ে দেবে— এখানে আসবে, আশ্রয় পাবে। রহিম! এই কুঁড়েতেই আমরা তৈরী করব মানুষের এক নতুন সমাজ।

অবাক হয়ে রহিম সনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ থেকে কথা পর্যন্ত বেরল না।

সনিয়া বলল— কি দেখছিস, রহিম? আয়, বসে পড়।

একটা যন্ত্রের মত রহিম এগিয়ে এসে সনিয়ার সামনে বসে পড়ল। থালাতে ভাত দেওয়া হয়েছে। রহিমের চোখ দিয়ে জল বইছে। সনিয়া

নিজের হাতে একটু ভাত নিয়ে রহিমের মুখে তুলে দিল। রহিমের সমস্ত শরীরে যেন নতুন উল্লাস এসেছে। তার চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে। সনিয়া আবার বলল— রহিম, আদরের ছোট ভাই আমার, রহিম! খেয়ে নে, সব খেয়ে নে। তোকে খাওয়ালে আমার পেটও ভরে যাবে।

রহিম বলল— কিন্তু আমি ও তোমার মুখে ভাত তুলে দিতে চাই। তোমাকে না খাইয়ে আমার পেটে ভাত যাবে কি করে? সনিয়ার মুখেও রহিম একটু ভাত তুলে দিয়েছে।

প্রথম 'রজ' উৎসব।

ঠাকুর দালানের সামনের চাতালে গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা হা-ডু-ডু খেলছে। দুপুরবেলা। আকাশ মেঘে ঢাকা। গাঁয়ের লোকে ধুমধামের সঙ্গে আনন্দ করছে। চাতালের ওপর রাম প্রহরাজ কয়েক জনের সঙ্গে পাশা খেলছেন। খেলাতে যোগ দিতে চিন্তেই স্বাঁই নেই। তিনি থাকলে খেলায় আরো মজা পাওয়া যেত। প্রথম থেকেই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা ছিল। কিন্তু উনি না থাকাতে এই প্রস্তাব বন্ধ রাখা হয়েছে।

কঁই পাগলী কোত্থেকে এসে চাতালের কাছে পৌঁছেছে। এই গাঁয়েরই মেয়ে সে। মাধেই রাউত ছিল তার বাবা। এই ঠাকুর দালানের সামনে খেলাধুলা করে সে বড় হয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় সে-ও একদিন তার বাবার সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলি। কিন্তু রাস্তার ধারেই তার বাবা তাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে গেল। সে থেকে গেল একা।

পুরনো দিনের কথা আজ কঁইয়ের মনে পড়ে না। সে পেটের তাগিদে অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করেছে। তারপর এমন একদিন এলো, যখন তার পেটে একটা বাচ্চা। কঁই মা হ'ল। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কঁই আবার ভিক্ষে করতে শুরু করল— নিজের জন্যে আর বাচ্চার প্রাণ বাঁচাতে। কোথাও তার আশ্রয় জোটেনি।

কেউ তাকে মায়া-মমতা দেখায়নি। লোকের গালমন্দ ছাড়া তার আর কিছু জোটেনি। কিন্তু এসব হল পুরনো দিনের কথা। মনে করে লাভই বা কি? সে সব সহ্য করে নিয়েছে। এখন যদি কেউ তাকে কড়া কথা শোনায়, সে নিশ্চিন্তে সহ্য করে নেয়।

এমনও একদিন এল, যেদিন কঁইয়ের আদরের একমাত্র ছেলে চিরকালের জন্যে চলে গেল। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। শ্মশানে তাকে শুইয়ে দিয়ে সে পালিয়ে এসেছে। সেদিন থেকেই সে পাগল হয়ে গেছে। সেদিন থেকেই তার চোখের জল শেষ হয়ে গেছে। সে হাসতে শুরু করেছে। হাসতে হাসতে তার দম আটকে গেছে। মনুষ্য-জাতকে সে অভিশাপ দিয়েছে— শোনরে মানুষ! তুই-ও মরবি— তুই-ও কেঁদে কেঁদে মরবি।

কঁই হাসে। যখন তার বাচ্চার কথা মনে পড়ে, সে কাঁদে। যাকে সামনে পায় তাকেই নিজের দুঃখের কাহিনী শোনায়। কেউ আজ পর্যন্ত কাতর হয়নি। বরঞ্চ তাকে সবাই ঘেন্নার ভাব দেখিয়েছে। তার বাবার বাড়ির সামনে বসে অনেক কেঁদেছে। অনেক হেসেছে। কিন্তু বনেই পরিভার জমিতে নতুন বাড়িটা, পুরনো বাড়ির চেয়েও বড়। আর তার বাবার জমি? এখন শূন্য পড়ে আছে। আকালের করাল মুষ্টি থেকে সে বেঁচে গেছে ঠিকই, কিন্তু নিজের কল্পনার বৃত্ত থেকে মুক্তি পায়নি। দিন কেটে গেছে। সে-ও তার অতীতের আশা ভুলে গেছে। সে এখন ভাবে— সে সনিয়ার স্ত্রী। সনিয়াই তার স্বামী আর সনিয়ার বাড়িই তার বাড়ি।

কিন্তু সনিয়ার বাড়িতে তার থাকার অধিকার নেই। বাড়িতে একটা লোক আছে, যে তাকে খাবার খাইয়ে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু কঁই ফিরে যেতে যেতে চীৎকার করে বলে— সনিয়াই আমার বর, আর আমি ওর বৌ।

কঁই পাগল হয়ে গিয়েছে'। গাঁয়ের লোকও জানে এ-কথা। তারা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে তাকে। কঁই একই উত্তর দিয়েছে— সনিয়া তার বর, কিন্তু সে কঁইকে ত্যাগ করেছে। তার বাচ্চা ক্ষিদের

জ্বালায় মরে গেছে।

সনিয়া এ-কথা কাউকে বলেনি।

কিছু লোক কঁইকে পাগলী বলেছে। কিন্তু এমনও কিছু লোক ছিল যারা বলেছে— গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসী পাতা! তাদের বক্তব্য যদি আগুনই না থাকে, তবে ধোঁয়া বেরুবে কেন? এর পেছনে নিশ্চয় কোন কাহিনী আছে। কঁই যা বলছে, তার পেছনে কিছু-না কিছু তো…।

বাবার বয়সী রাম প্রহরাজ পাশা খেলতে খেলতে হঠাৎ অন্যদিকে তাকালেন। সেদিক দিয়ে কঁই আসছে। প্রহরাজ বললেন— আরে, কঁই এসে গেছে। বল্ তো কঁই কে তোর বর? কে তোর বাচ্চার বাবা?

গাঁয়ের ছোকরারা হা-ডু-ডু খেলতে খেলতে কঁইয়ের দিকে তাকাল। তাকে দেখেই হাসির ঢেউ বয়ে গেল। কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ই নেই যেন। সে তেমনি ভাবে বকে চলেছে— সনিয়া আমার বর— সনিয়া আমাকে ছেড়ে দিয়েছে…

উদী সাহু ঠাট্টা করে বলল— কঁই! তোর সনিয়া ফিরে এসেছে। তুই ওর বাড়ি যাচ্ছিস না কেন?

কঁইয়ের বকবকানি বন্ধ হয়ে গেল। সে চারদিকে তাকাল। সত্যিই ফিরে এসেছে সনিয়া? কোথায় আছে সে?

তার মনের কথা যেন বুঝে ফেলেছে উদী সাহু। সে বলল— এদিকে তাকে কোথায় খুঁজছিস? ওতো নিজের বাড়িতে আছে। যা-যা, ওর বাড়ি চলে যা…।

কঁই বিড় বিড় করছে। সে সনিয়ার বাড়ির দিকে চলেছে। যেতে যেতে সে আরেকবার চেঁচিয়ে উঠে বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ সনিয়া আমার বর— আর, আমি ওর বৌ।

কঁই চলে গেছে। ছেলেরা আবার হা-ডু-ডু খেলা শুরু করেছে। প্রহরাজ আবার পাশা খেলায় মন দিয়েছেন। সমস্ত গাঁ যেন খেলায় মেতে উঠেছে। আজ 'রজ' উৎসবের প্রথম দিন।

সনিয়া আবার তার কাজেকর্মে লেগে গেছে। রহিম তার সঙ্গী—

তার ডান হাত। দুই সঙ্গীর মত দুজনে শলা-পরামর্শ করে কাজ করে। হাল চালাতে চালাতে সনিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে রহিম বাস নিড়েন দেওয়া বন্ধ করে তার কাছে আসে। —রেখে দাও, সনিয়া দাদা! এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। আমি হাল দিচ্ছি।

সনিয়া রহিমের কথা শোনেনা। ও আবার লেগে পড়েছে হাল চালাতে। বলেছে— একটা পাট আমি চালাই, পরের টা তুই করে দিস।

সন্ধ্যেবেলায় দুজনে বাড়ি ফিরে আসে বলদগুলো বেঁধে বারান্দায় বসে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের ঘাম শুকিয়ে যায়। ক্লান্তির দরুণ দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। একদিন সন্ধ্যেবেলা দুজনে যখন বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছে, সনিয়া বলল— রহিম! আমরাও অন্যদের মতো রাস্তার ধারে মরতে পারতাম। কিন্তু আমরা মরিনি। আমাদের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের কথা।

রহিম বলল— আমরা তো ধরো মরেই গেছি।

সনিয়া বলল— হ্যাঁ, আমরা মরে গেছি শ্মশানে মড়ার সঙ্গে আমরাও পড়েছিলাম। মানুষের হাড়গুলো ওখানে স্তূপ করা ছিল। ওখানে না ছিল হিন্দু, না মুসলমান— সব হাড়ই মানুষের— এক মানুষ জাতের। জাত, ধর্ম আরো সব নিয়ে যারা বেঁচে আছে, তারা একমুঠো ভিক্ষেও দেয়নি। আমরা আবার ফিরে এসেছি ওদেরই কাছে। আমাদের কর্তব্য কি? তুই জানিস?

—কি? —রহিম জিজ্ঞেস করে।

সনিয়া বলল— আমাদের কর্তব্য হলঃ যাকে জাত-ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, যে মানবের সম্মানের মত বাঁচতে চায়— তাকেই আমরা এই ঘরে স্থান দেব। সে ঘাম ফেলে খাটবে আর নিজের খাটুনির ফল পাবে। এই ঘরে ধর্মের ভেদ বা জাতের ভেদ থাকবে না। এই ঘর হবে মানুষের— পরিশ্রমী মানুষের যারা নিজের মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবানের প্রার্থনায় বসে— তাদের বসতে দাও। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। এখানে যারা থাকবে

নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবে। যা কিছুই রোজগার করবে, ভাগ করে খাবে।

রহিম বলল— খুব ভালো কথা। অন্নাথ, আশ্রয়হীন যারা এখানে আসবে, তাদের সেবা করব আমরা।

সনিয়া বলল— হ্যাঁ, এই আমাদের কর্তব্য, আমাদের সংকল্প।

সনিয়ার বাড়িতে থাকতে কেউ রাজি নয়। যে বাড়িতে মুসলমান ছেলে রান্না করে, পান হরিজন জাতের বিশি জল আনে আর প্রধান বংশের সনিয়া ভাত বাড়ে— সেখানে বাপু কে থাকবে? ওখানে যে রাস্তার ভিখিরিও থাকতে চাইবে না।

ভরতিয়া জাতে চামার। গায়ে খেটে সে তার সংসার চালাত। একদিন সে তার মালিকের ওখানে নারকোল গাছে নারকোল পাড়ছিল। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যায়। কিন্তু পাশের এক বাড়ির ছাতে আটকে যায়। প্রাণ তো বাঁচল, কিন্তু ছ'মাস বিছানায় পড়ে রইল। সেরে উঠল ভাঙা-কোমর নিয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। হাতে জোরও নেই। বাড়িতে চাল নেই। ক্ষিদের জ্বালায় তার মা মারা গেছে। তার বৌ বেঙ্গুলী তাকে খাওয়াচ্ছিল। কিন্তু সে-ও কতদিন খাওয়াতে পারে। সে যে যুবতী। আরেকজনকে বিয়ে করল সে। এখন ভরতিয়া একা। কি করে বেচারা?

ভরতিয়া তার মালিকের বাড়ি যেত। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু খেতে পেয়েছে। কিন্তু মালিক গিন্নী অসন্তুষ্ট হ'তে লাগলেন। মালিক তাকে গাছ থেকে নারকোল পাড়াতে বলেছিল, গাছ থেকে পড়ার জন্যে মোটেও বলেনি। এখন তার কাজ করার ক্ষমতা নেই, মালিকের দোষ কোথায়?

ভরতিয়া কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করতে শুরু করল। ভিক্ষে করতে করতে একদিন সে বিষ্ণুপুরে এল।

রহিম তাকে বাড়িতে ডাকল। সনিয়াকে সব জানাল। সে বলল— সনিয়া দাদা, ভরতিয়া গাছের ছায়ায় বসে থাকবে। ফসল

নষ্ট করতে কোন জানোয়ার এলে ও আওয়াজ তুলে তাড়াবে। আমরা কাজে গেলে ও ঘর দেখাশোনা করবে।

সনিয়া বলল— ঠিক আছে। ওকে থাকতে দাও। আজ থেকে ও আমাদের ভাই। প্রয়োজনে সঙ্গে তো থাকবে— কিছু কথাটথা তো বলবে— এই তো চাই আমরা।

সনিয়ার বাড়িতে ভরতিয়ার আশ্রয় জুটল। এক কলাপাতায় তিনজনে খাবার খায়। একজন উঁচু জাতের হিন্দু, অন্য জন মুসলমান আর তৃতীয় জন হরিজন।

ভরতিয়া দেখল, সনিয়ার বাড়িতে জাত-ধর্মের কোন ভেদ নেই। সে মনে করল, গত জন্মের পাপের ফলে আজ তার এই অবস্থা হয়েছে। তবু জেনে শুনে পাপ করছে কেন? না, এ বাড়িতে তার থাকা চলবে না। এখানে কোন জাত-ধর্ম নেই। এর থেকে তো রাস্তার ধারে পড়ে মরা ভালো।

সনিয়া ভরতিয়াকে অনেক করে বুঝিয়ে বলল,— ভরত ভাই! পৃথিবীতে শুধু একটাই জাত আছে— মানুষ জাত। একটাই ধর্ম আছে— মানুষ ধর্ম। এ-কথা কেন বোঝোনা? অনেক বোঝাবার পর ভরতিয়া রাজী হ'ল।

ভরতিয়ার মতন আরেকজন-ও সনিয়ার বাড়িতে এসেছে। সে নাপিত কাশী বেজ। সে তার মালিকের অনেক সেবা করেছে। তিনি যখন বসন্তে ভুগছিলেন তখন কাশী সব সময় তাঁর পাশে ছিল। মালিক সেরে গেলেন, কিন্তু কাশী বসন্তে পড়ল। যৌবনেই সে তাঁর চোখ হারাল। ভিক্ষে করা ছাড়া তার আর কোন উপায় রইল না। এখন আর তাকে ভিক্ষে করতে হয়না। সে-ও সনিয়ার সংসারের একজন হয়ে গেছে।

কিছুদিন পরে বুড়ো জন এল। আকালে জনের পরিবার'এর সবাই মারা গেছে। ষাঠ বছরের বুড়ো জন এখন যায় কোথায়? কি করবে? সনিয়ার বাড়িতে তার আশ্রয় জুটে গেল।

শেষে এসেছে কঁই পাগলী। সে হাসে, কাঁদে, চেঁচামেচি করে—

ভগবান জানেন কি-না-কি বকবক করেছে। সব সময় বলেছে—সনিয়া! তুমিই আমার বর আর আমি তোমার বউ।

সনিয়া সমস্ত কিছু শুনেছে। সহানুভূতিতে তার মন ভরে গেছে। ভেবেছে সে— যদি সময় না ঘুরে যেত, তাহলে বনেই পরিভা কঁইকে তাঁর সংসারের বউ করে আনতো। কঁই এ বাড়ির গৃহিনী হত। যদি তাই হ'ত কঁই কেন ঘুরে মরতো? অন্যের সঙ্গে থাকত কেন? নিজের বাচ্চাকে হারিয়ে পাগল হ'ত কেন?

সনিয়া ব'লল— কঁই! এটা তোরই বাড়ি। এই জন কাকা তোর শ্বশুর। কাশী বেজ, ভরত সানল— তোর তুই ছেলে। রহিম তোর ছোট ভাই। আর আমি? আমি তোর বর।

—কঁই! তুই এখানেই একেবারে থেকে যা। চারদিকে যা কিছু দেখতে পাচ্ছিস। সব তোর। আমরা যা রোজগার করব, তোর সামনেই রেখে দেব। তুই-ই ভাগ করে আমাদের খাওয়াবি। দিতে পারবি তো?

কঁই এক দৃষ্টে সবাইকে দেখছিল। সনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে— এরা সব কারা? আমার বনেই কাকা কোথায়? আমার কাকীমা কোথায়? কোথায় মনিয়া, কুনী আর পুনী?

সনিয়ার চোখে জল এসে গেছে। কঁইকে দেখে সে ভাবে তার পরিবারের সবাই যেন ফিরে এসেছে। পুরোনো দিনের অনেক ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। একদিন সনিয়ার বাবা কঁইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন— কাঁদিস না কঁই! সনিয়ার মা-ই তোর মা।

সেই ঘটনার পর সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে।

কঁই এখন পাগলী হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। সমাজের চোখে ও বিচ্যুত। এখন ও হয়ে গেছে অচ্ছ্যুত— পতিতা। এখন প্রায়শ্চিত করলেও ও জাতে ফিরে যেতে পারবে না। ব্রাহ্মণদের আর জ্ঞাতি-গুষ্টিকে হাজার ভোজ দিলেও তার উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। ধর্ম ত্যাগ করা ছাড়া তার আর অন্য পথ নেই। এখন ও ধর্ম, জাত—সব কিছু ছেড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, পাগল হবে, ভিক্ষে চাইবে

আর কোনো গাছের তলাতে ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ?

তারপর হয়ত হঠাৎ কোনো অসুখের শিকার হবে। সময় ঘনাবার আগেই চির নিদ্রায় মগ্ন হবে। মৃত্যুর পরেও লোকে তার মৃত-দেহ ছোঁবেনা। কুকুর শেয়ালের খোরাক হবে সে। অদ্ভুত তো!

কঁই দাঁড়িয়ে রয়েছে সনিয়ার সামনে। চুলগুলো এলোমেলো। চোখে চঞ্চলতা নেই, চমক নেই। গাল তোবড়ানো। বুকের হাড় আর ক্ষীন হাত দুটি ধুলিধূসর কাপড় ঢাকতে পারছেনা। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কঁই-ও একজন।

পৃথিবীর সব বাচ্চার মতই কঁইয়ের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আজ সে সবাইকার সমান নয়। সে আজ রোগে ছটফট করে রাস্তার ধারে মরবে। ঘরে নয়, এমন কি গোয়ালেও থাকার জায়গা তার জুটবে না। ইঁদুর-বেড়ালে বাড়ির যত জিনিস নষ্ট করে, তার দশ-ভাগের এক ভাগ-ও সে পেতে পারে না। জানোয়ারের চেয়েও তাকে ইতর মনে করা হবে। সে পতিতা।

সনিয়ার কান্না পেল। অশ্রুসজল চোখে সে কঁইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল— কঁই! আমাদের বাড়ির আর কেউ বেঁচে নেই! তোর বাবা আর ছোট বাচ্চাটার মত তারাও মরে গেছে। কিন্তু এত হতাশ হবার কি আছে। এই পৃথিবীতে ভাই, বোন, বন্ধু কি কম আছে? দেখনা— এ আমার জন কাকা। কাশী, ভরত আর রহিম আমার ভাই। এরা সবাই আমার বাবা, ভাই আর ছেলে। কই! এটা তোরই বাড়ি। সবাইকার সেবা করে সুখে শান্তিতে থাক।

এই কথাটা কঁইয়ের অন্তরে বসে গেল। বিগত দিনের অনেক কথা তার মনে পড়ল। অনেক ছবি ভেসে উঠল। ক্ষণেকের জন্যে তার পাগল ভাব রইল না। কিন্তু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। কি বলল, কি বলল না, তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ সবাই নিশ্চুপ রইল। কঁই-ই মুখ খুলল। বলল— সনিয়া দাদা! তাহলে আমরা কোন কাজে বেঁচে থাকব ?

সনিয়া বলল— মানুষ বাঁচার জন্যেই বাঁচে। আমরাও এই ভাবেই

বাঁচব। আমরা বাঁচতে চাই, কঁই। আরে রহিম! যা ওকে—ওকে ভেরতে নিয়ে যা। ওতো তোর বড় বোন।

রহিম কঁইয়ের হাত ধরে বলল—এসো কঁই দিদি! এ ঘর তোমারই। এই চাবির গোছা তুমি রাখো। জন কাকার পরামর্শ মত এগুলো ব্যবহার করো।

জন কাকা বলল—এসো কঁই মা! এযে ভগবানের ঘর। আমরা তোমারই সন্তান। তুমি আমাদের মুখে অন্ন দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে পারো।

কঁই পাগলী সবাইকার মুখের দিকে তাকাল। কাউকে কাউকে সে একদৃষ্টে দেখল। তার বড় অস্থির লাগছে। যেখানেই সে গেছে, লোকে তাকে ঠোকর দিয়ে গালাগাল করেছে। কারোর কাছে এতটুকু সহানুভূতির কথা শোনেনি। কিন্তু এখানে? এখানে যে কথাটাই ভিন্ন। লোকে তাকে আদর জানাচ্ছে। বাড়িতে থাকতে আমন্ত্রণ করছে। কঁই আশ্চর্য হয়ে গেল। সে রহিমের হাত ধরে সনিয়ার ঘরে গেল।

আরো অনেক অনাথ এসেছে। সনিয়া তাদের অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু তারা মানেনি। সনিয়ার বাড়িতে থাকলে দেহ অপবিত্র হয়ে যাবে না তো? যে বাড়িতে জাত ধর্ম নেই—সেখানে থাকে কি করে?

সবার আশা, আবার ভাগ্য খুলবে। সময় বদলে যাবে। আজ ভিক্ষে চেয়ে ফিরলেও কাল আবার সুখেশান্তিতে থাকবে। জাতে ফিরবে। সমাজে তাদের সমাদর হবে। তাদের বাপ ঠাকুর্দার মত সুখে তারাও ঘর-সংসার করবে। যদি তারা নিজে পয়সা জমাতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় পারবে বড় লোক হতে। তারা জমি-জমিদারী কিনবে, প্রাসাদ বানাবে। দেশে তাদের নাম হবে। স্বর্গে পূর্ব-পুরুষদের আত্মারা শান্তি পাবে।

এমন সব লোকে সনিয়ার বাড়ীতে কি করে থাকতে পারে? দূর, পরিশ্রম কেন করবে? ভিক্ষে করে তারা যা রোজগার করে, তাতে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার। তারা বলতে পারে, এই টাকা আমার, এ আমি খরচ করতে পারি। এই 'আমার'-এর মধ্যে তারা এক দ্ভুত

আনন্দ অনুভব করে। এখন এই আনন্দ ছেড়ে তারা কি করে এক সামগ্রিক সম্পদকে আপন করে? কি করে বলে, এই পৃথিবী আমাদের— সারা আকাশ আমাদের।

সবাই ফিরে গেছে। সনিয়া ওদের সম্পর্কে ভেবেছে— নির্বোধ কে, —কে সঠিক আর কে ভুল··· ?

বাবা কাকার সেবাতে ধোবী সেরে গেল। তার মনে হল স্বর্গপুরী থেকে সে ফিরে এসেছে। ধোবীর মা-ও সেবা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বসন্তের শিকার হলেন। বসন্তের গুটি তাঁর সারা অঙ্গে বেরুল— চোখেও বেরুল। চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল। সারা গায়ে যন্ত্রণা। সারারাত ছটফট করেছেন। মুখে বার বার একই ডাক— ধোবী !

ধোবী ভাবে, ভগবান কেন ওকে বাঁচালেন ? মরলে তো আত্মার মুক্তি হত। শ্বশুর বাড়িতে নেই। মা যদি মারা যায় তো দুঃখে একটু আহা-করারও কেউ থাকবে না। বাবা তো সব সময় বলছেন— কেন এলি এখানে ? বিষ্ণুপুরে ফিরে চল। যা হবে, ভালোই হবে।

স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর ডাক শুনে চিন্তেই সাঁই অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি ওঁকে যেদিন থেকে বিয়ে করেছেন, কখনো প্রেমের চোখে দেখেননি। কোন কাজে ওর পরামর্শ নেননি। ধোবীর মা কোন কাজে কোন অভিযোগ করেননি। তবু সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তার ওপর ছিল আর আনন্দে নীরবে তিনি তা পালন করেছেন। তিনি একটাই অনুরোধ করেছেন— সনিয়ার সঙ্গে ধোবীর বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু চিন্তেই সাঁই তাঁর প্রার্থনা শোনেননি। এখন ছটফট করতে করতে ধোবীর মা বলছেন— নিধি ! তুমি বলেছিলে না, যে, ধোবীর বিয়ে সনিয়ার সঙ্গেই দেবে ?

এবারে চিন্তেই সাঁইকে তিনি কোন প্রার্থনা করেননি। তিনি তাঁর কঠোর-দাম্ভিক স্বামীকে ভালো করেই জানেন। চিন্তেই সাঁইয়ের ওপরও চিন্তার যথেষ্ট ছাপ পড়েছে। নিজের স্ত্রীকে তিনি ভালো

ভাবেই জানেন। চিন্তেই বললেন— তুমি বিশ্রাম করো তো! ভগবানের ইচ্ছেয় তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। তখন তুমি নিজে সনিয়ার সঙ্গে ধোবীর বিয়ে দেবে। কেউ তোমাকে আটকাবে না।

নিধিও একথা শুনে খুশী হলেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে গেল। উনি বললেন— বৌদি! তুমি চিন্তা করো না। ধোবীর বিয়ে সনিয়ার সঙ্গেই হবে। আগে তুমি সেরে তো ওঠো।

কিন্তু ধোবীর মায়ের স্বাস্থ্য দিনদিন অবনতির দিকে চলেছে। বসন্তের গুটিগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। একদিন তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। দেবস্থানের পূর্ণমাসীর সকালে তিনি এই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। স্বামী, দেওর ও মেয়ের সামনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লোকে বলল— ধোবীর মা অনেক পূণ্য করেছেন। তাই এক পবিত্র দিনে তার দেহান্তর হল।

নিমপুরের জমিদার খেলছিলেন। গোমস্তা গোবিন্দ প্রধান এই সময়ে তার বোঝা নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। তিনি ঠিক করেছেন, সনিয়া ছোকরাকে কড়া করে কথা শোনাতে হবে।

তিন বছর আগে সনিয়া জমি নিয়েছে। সেদিন থেকেই বলতে গেলে সে উধাও। প্রধান বছরে দুবার খাজনা উসুল করেছেন, কিন্তু কোন রসিদ দেননি। খাজনা উসুল করা আর রসিদ না দেওয়া— এটা প্রধানের অভ্যেস হয়ে গেছে। ফলে এই হয়, জমিদারের খাতায় প্রজার নামে খাজনা সব সময় বাকী পড়ে থাকে। বকেয়া পাওনা বেশী হয়ে গেলে প্রজার জমি নিলাম হয়ে যায়। এই ভাবেই প্রধান অনেক সরল চাষীর জমি আত্মসাৎ করেছেন। অনেক বিধবাই নিজের নিজের জমি খুইয়ে পথের ভিখিরি হয়েছে। প্রধানের সম্পত্তি সব সময় বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও জমিদার ছোট রায় সাহেব প্রধানকে বিশ্বাস করেন। প্রধান যা বলেন, তা-ই করেন।

প্রধানের কাছে সনিয়া নেহাত তুচ্ছ জীব। জমিদারের পিতৃশ্রাদ্ধে

অনেক লোকে তাঁর বাড়িতে খায়। খাবারের সমস্ত বস্তু এস্টেট থেকেই আসে। মাছ আনাতে প্রধান দু-জন লোককে সনিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কি হল? সনিয়ার একজন চাকর প্রধানের লোকেদের ফিরিয়ে দিয়েছে আর অপমানও করেছে। জমিদার সাহেব যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সনিয়া তা দেখেনি পর্যন্ত। প্রধান এ-ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারেন না।

প্রধান ভাবেন— দু'দিনের কথা: সনিয়া অছুঁতদের সঙ্গে বসে লঙ্গর খানায় খেতো। অজস্র মিনতি ক'রে সে জমি নিয়েছে। কিন্তু তার এত দম্ভ? হ্যাঁ, লোক যখন গিয়েছিল, সে বাড়িতে ছিল না। কিন্তু ফিরে আসার পর তো শুনেছে। সে জমিদারের কাছে এসে ক্ষমা চাইল না কেন?

প্রধান জমিদার সাহেবকে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। তিনিও খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর হুকুম ছিল, প্রজা যদি বজ্জাতি করে, তার দম্ভ ভেঙে দাও। তাকে বাড়তে দিওনা। তা না হলে অন্য প্রজারা জমিদারকে মানবে না।

প্রধানও তাই চান। তাছাড়া সনিয়া যে কাজ এখন করেছে, তাতে তার ওপর কোন মায়া-মমতা থাকা উচিত নয়। সে জাত ধর্ম— সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছে আবার বলেছে— সমস্ত সংসারটা তার। এটা পাগলামো ছাড়া আর কি? যদি সে পাগল হয়, পৃথিবী শুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে যাবে? যাই হোক, প্রধান ভেবে দেখলেন, সনিয়ার ব্যাপারে এতটা ভাবা মিথ্যে। তাঁর জানা আছে, ওর কি ধরণের উপযুক্ত শাস্তি হবে। সনিয়াকে তিনি সমূলে উৎখাত করতে চান। আর সেই কারণেই কাগজপত্র নিয়ে জমিদারের কাছে এসেছেন।

জমিদার সাহেবের পাশা খেলা শেষ হয়ে গেছে। সূর্য অস্তের সময় হয়েছে। জমিদারের নির্দেশ ছাড়া উনি বসেন না। উনি চাকর। জমিদারের কাছে কি করে বসে পড়বেন?

খেলায় জমিদার সাহেব জিতেছেন। খুবই খুশী। তিনি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে?

প্রধান কাগজপত্র নিচে রেখে জানালেন— তিন বছরের খাজনা বকেয়া পড়েছে, হুজুর !

—নালিশ ঠুকে দাও

—যে আজ্ঞে, আমাকে জাজপুর— সাবডিভিশন কাছারী যেতে হবে।

—কেন ? কোর্টের মুহুরী করতে পারবে না ?

—আজ্ঞে না, এক তরফা ডিক্রির বন্দোবস্ত করতে হবে যে।

—যা ইচ্ছে করো। বজ্জাত প্রজার কড়া শাস্তি হওয়া দরকার। তার দন্ত ভেঙে দাও।

—যে আজ্ঞে !

জমিদার উঠে ভেতরে চলে গেলেন। কয়েকটা কাগজ পত্রে তাঁর দস্তখতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাজ হল না। প্রধান আবার কাগজপত্র নিয়ে ফিরে গেলেন।

প্রহরাজের বাড়ির পাশে যে নীচু জমি তাতে শিবা ঘোষ মাটি তৈরী করছিল। বেগুন চারা লাগাতে হবে। সব চারা লাগিয়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে মালিক গিন্নী খেতে দেবে না। কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তিন বছর একটানা কাজ করেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মজুরী জোটেনি। এর আগে যা যা-কিছু পেয়েছে, মালিক গিন্নীর হাতে সঁপে দিয়েছে। প্রহরাজ আশা দিয়েছেন, —একটা ঘর তৈরী করে দেবেন। মালিক গিন্নীও তাকে অনেকবার মায়া দেখিয়েছেন— আহা ! বেচারা অনাথ ! তোকে নিশ্চয় ঘর তৈরী করিয়ে দেবেন।

কিন্তু কবে ? প্রহরাজ না তাকে বাড়ি করে দিয়েছেন, না টাকা দিয়েছেন। সেই কারণে সে আর কোথাও যেতে পারেনি। প্রহরাজের বাড়িতেও সে পড়ে থাকতে চাইছিল না। সে একটা জমা জলে পড়ে গেছে।

তাহলে শিবা ঘোষ এতদিন কেন পড়ে আছে ? প্রহরাজের

একটি নাতনী আছে, সে ছোট বয়সে বিধবা হয়েছে। তার নাম পার্বতী। শিবা ঘোষকে বস্তুত পার্বতীই আটকে রেখেছে।

পেছন থেকে পার্বতী এসে তাকে ডাকল— ও, শিবা! —শিবা চমকে উঠল। পার্বতী আরো কাছে এসে গেছে। তার কানধরে টেনে বলল— চল্ চল্, তোকে মা ডাকছে।

পার্বতীর হাত থেকে কান ছাড়িয়ে শিবা দূরে সরে গেল। সে কোদাল দিয়ে একটু মাটি কেটে বলল— তুমি যাও। আমি চারা লাগিয়ে আসছি।

খোলা চুল দুলিয়ে পারো বলল— আরে, তুই তো একদম বোকারে, বোকা! আরে মা নয়, আমি ডাকছি। চল্ চল্…।

শিবা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল— আচ্ছা, তুমি যাও— আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পার্বতী রেগে গেল। চুলগুলো হেলিয়ে দুলিয়ে সে চলে গেল। শিবা ঘোষ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রহরাজমশাই তাঁর বাড়িতে গাঁয়ের গুরুজন বৃদ্ধজনেদের ডেকেছেন। মন্দিরের সামনে এই সভা হবে। কিন্তু যে চিন্তেই স্বাঁইয়ের উপস্থিতিতে সভার কাজ ঠিকভাবে চলতে পারত, তিনি আজ আসতে পারেননি। আজ তিনি অসুবিধেয় পড়েছেন। কিন্তু গাঁয়ের লোকে তো নিজের ধর্ম, নিজের সমাজকে ছাড়তে পারেনা। সনিয়া ছোকরা যে অন্যায় করেছে, তার কিছু প্রতিকার তো করতে হবেই।

প্রহরাজ সামান্য নস্যি নিয়ে বললেন— সনিয়া জাত-ধর্ম ছেড়েছে। পতিতা কঁইকে বাড়িতে রেখেছে। এসব লোকে যদি আমাদের বিষ্ণুপুর গাঁয়ে দাপটের সঙ্গে বেঁচে থাকে, তাহলে আমরা যাই কোথায়?

পরি দলাই বলল— আপনি শুনেছেন, প্রহরাজমশাই! কঁই পাগলী আর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় না। ভালো শাড়ী পরে সে বাড়িতে রয়েছে। সনিয়ার বাড়ির চাবী তারই কাছে থাকে। ও রান্না করে অছ্যুত হরিজন, মুসলমান, খ্রীশ্চান— সবাই এক সঙ্গে খায়।

সেবা জিজ্ঞেস করল— একপাতায় কি সবাই খায়?

পরি বলেছে— না, না, আলাদা আলাদা পাতা নিয়ে বসে। কিন্তু কঁই সবাইকে একসঙ্গে খেতে দেয়।

বিনি কাণ্ডী বলল— প্রহরাজমশাই! কঁইয়ের, বলতে কি, কোন জাত আছে? গাঁয়ে অনেক লোকে থাকে। যার যা ইচ্ছে কাজ করেছে। এতে গাঁয়ের লোকের কি সম্পর্ক? আকালে আমাদের অনেক ভাই মশামাছির মত মারা গেছে আমরা তাদের বাঁচাতে পারিনি। যে ক'জন বেঁচে আছে, এখানেই তো থাকবে— আর কোথায় যাবে?

সেবা বেহারা বিনি কাণ্ডীকে সমর্থন করল। সেবা ব'লল, এমন অনেক লোক আছে যারা গাঁয়ে ফিরে এসেও জাতে ফেরেনি। তারা তো নিজের নিজের ঘর তৈরী করে গাঁয়ে আছে। তবে সনিয়ার কি দোষ? সে নিজের ঘর তৈরী করেছে আর···।

—আমিও তো একথাই বলছি। —বিনি কাণ্ডী আবার বলে— গাঁয়ের লোকের এ-কথা ঠিক করে বোঝা উচিত। আচ্ছা তোমরা সনিয়ার বাড়ি যেওনা, কিন্তু ওকে বিপদে ফেলার দরকার কি? সেতো কোন অপরাধ করেনি।

প্রহরাজ আরেকটু নস্যি নিয়ে বললেন আরে, এই সেবা বেহেরা, বিনি কাণ্ডী এরা বলছে কি? এদের মাথার ঠিক আছে তো?

প্রহরাজ চিন্তা করলেন, পবিত্র হিন্দুধর্মের কি সর্বনাশ হয়ে যাবে? আকালে যেন এল প্রলয়। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? লোকে কি জেনে-শুনে এই ভুল করবে?

প্রহরাজ দলাইয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। দলাইও বলল— প্রহরাজমশাই! সেবা বেহেরা যা-কিছু বলেছে, ঠিকই বলেছে। সনিয়া ভালো করেছে কি মন্দ করেছে, তার ফল সে নিজেই ভুগবে। যেমন করবে তেমনি মরবে। এতে আমাদের কি দরকার? ভগবানই প্রভু। সনিয়া যদি ভুল রাস্তায় যায়, তাহলে তিনি নিশ্চয় ওকে শাস্তি দেবেন। যদি ঠিক রাস্তায় থাকে, তাহলে ওকে পুরস্কার দেবেন। আমরা কি করতে পারি···?

উদীসাহু গোঁফে হাত বোলাচ্ছিল। সে বলল— সনিয়া তো গাঁয়ের

লোকের থেকে ভিন্ন হয়ে আছে। ও কারো বাড়িতে যায়না কারোর সঙ্গে কথা বলে না। কালকেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম— কি খবর সনিয়া? ও বলল— মেশোমশাই! সব ঠিক আছে। ওর সঙ্গে বুড়ো খ্রীশ্চান জন-ও ছিল। আমি বললাম— ওরে পাগলা! তুই বাড়ি করেছিস, জাতে ফিরেছিস। এবার তো বিয়ে শাদী করে সংসার করতে পারিস। কিন্তু এ-সব কি করছিস? এখন নিজের পরিবার থেকে বেরিয়ে গেলি— জাত থেকে চলে গেলি।

আমার কথার উত্তরে সনিয়া বলল— মেশোমশাই! জাত থেকে গেছি, কিন্তু পৃথিবী থেকে তো যাই-নি। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে পাঁচ-দশ জন মানুষকে বাঁচিয়ে যাই। এইতো মনুষ্যত্ব। যে পাঁচ জনকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। যদি তাদের আশ্রয় না দিতাম, তাহলে তাদের অবস্থা কি হত? কখনো ভেবেছেন এদের সম্পর্কে?

প্রহরাজ বললেন— গরীবকে আশ্রয় দেওয়া ভালো কাজ। মনুষ্যত্ব। কিন্তু নিজের জাত-ধর্মে থেকে কি-এ-কাজ করতে পারত না? তুমি ওকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

উদী সাহু বলল— জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রহরাজমশাই! কিন্তু ও বলেছে, ওর না আছে জাতে বিশ্বাস, না ধর্মে। এরপর আর কথা বাড়ানো আমি উচিত মনে করিনি। যদি সে জাত ধর্মে বিশ্বাস না রাখে, না রাখুক, প্রভু আছেন ভগবান।

প্রহরাজ বললেন— সবাই শোন। সনিয়া বলেছে, জাত-ধর্মে তার কোন বিশ্বাস নেই। যদি সবাই এমনি করে, তাহলে কি হিন্দু ধর্ম জীবিত থাকবে? এমন লোককে গাঁ থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

সেবা বেহেরা বলল— প্রহরাজমশাই! তোমার কথাটা একটু কষ্টকর লাগছে। আরে! এখন ইংরেজ সরকারের রাজত্ব চলছে। কে কাকে বের করবে? এখানে যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। প্রত্যেকে সুখে বেঁচে আছে। তা না হলে প্রত্যেক গাঁয়ে মুসলমান, খ্রীশ্চানেরা সংখ্যায় বাড়ছে কি করে? তারাও আমাদের লোক। বিদেশ থেকে আসেনি। পাঠান বস্তিতে এখনো গরু জবাই হয়। পাণ হরিজন

বস্তিতে যাও— দেখবে এখনো লোকে মরা গরুর মাংস খাচ্ছে। কেন? ওদের কেন বের করে দেবেনা? সনিয়াকে বের করে দিতে চাও, কেননা সে দুর্বল। এটা কি ন্যায়? ওদের কাছে গেলে আপনাকে ওরা কড়া কথা শুনিবে দেবে।

প্রহরাজ চিন্তিত হয়ে বললেন— আমি যা বলেছি, ঠিকভাবে তোমরা বুঝতে পারনি। পাঠান বা খ্রীশ্চান— দুজনের ধর্ম এক। প্রত্যেকের কাছে নিজের নিজের ধর্ম বড় মনে হয়। সনিয়ার ধর্ম কি? সেও কোন ধর্ম নিক। আমরা ওকে কিছু বলব না। সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। এই মেঠো রাস্তায় কত বিধর্মী চলে। আমরা কি রাস্তার মাটি কেটে ফেলে দেব? বিধর্মীও নদীতে যায়। সেই কারণে নদীর জল আমরা ছেড়ে দিই না। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, সনিয়া এখন কোন ধর্মেই নেই।……

দলাই বলল— কিন্তু সেদিন আপনি বললেন যে, প্রথমে মাত্র চার জাতি ছিল। এখন চার হাজার হয়ে গেছে। কি করে হল? এইভাবে ধীরে ধীরে হয়েছে তো! বিধান মত সনিয়া একটা নতুন জাত তৈরী করেছে। কয়েক বছর পরে একটা পরিবার একটা জাতে বদলে যাবে। হতে দাও……।

সেবা বেহেরা বলল— ঠিকই বলেছ তুমি। সবাই যদি একই জাতের হয় তো পৃথিবী চলবে কি করে? বিয়ে শাদী কি করে হবে?

প্রহরাজ অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন— গাঁয়ের সবাই পাগল তো হয়ে যায়নি? আমি যা বলছি, একটু মন দিয়ে শোনো, বিচার করো। শুধু কথা বাড়ানোতে কি লাভ? সনিয়া যা-ই করুক, আমাদের আপত্তিতে কি লাভ? ও যদি জঙ্গলে থাকত, আমাদের নজরে পড়ত না। কিন্তু ও আমাদের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে সে অন্যায় করছে। আমরা কি সহ্য করতে পারি? শাস্ত্রগুলো কি আগুনে জ্বালিয়ে দেব? ভগবান কি তা সহ্য করবেন? চিন্তেই স্বাঁই আজ গাঁয়ে নেই। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ তোমরা নিচ্ছ। তিনি থাকলে তোমরা এই কথা বলতে পারতে?

চিন্তেই স্বাঁইয়ের নাম শুনে সবাই নীরব হয়ে গেল। প্রহরাজ বললেন, যখন শূদ্রক অন্যায় করেছিল, ভগবান রাম তার প্রাণ নিয়েছিলেন। এ তো তোমারা শাস্ত্রে শুনে থাকবে। এই সনিয়া পরিভা কোথাকার কে? তোমরা কি ওকে শাসনে রাখতে পার না? গাঁয়ের মধ্যে সে চামার, পাঠান, খ্রীশ্চান— এসব নীচ জাতের লোকের সঙ্গে থাকবে, কঁইয়ের মত পতিতাকে বাড়িতে রাখবে— তোমরা কত সহ্য করবে? নিজেদের মেয়েদের নিয়ে এ-গাঁয়ে থাকতে হবে না? সনিয়া যা করছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা সব দেখছে না? এবার ছোটরা তোমাদের কাউকে মানবে না, বুঝেছ? কি, বলছ না কেন বিশিজেনা? তোমার ছেলে চন্দরার কোন খবর পেলে? রাম ওঝার মেয়ে টিমির কি হল? সে-ও তো নিখোঁজ না?

বিশিজেনা বলল— হ্যাঁ প্রহরাজ মশাই, আমার ছেলেতো ভুল করেছে। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমি। কিন্তু ও ছিল আমার রোজগেরে ছেলে। ও ফিরে এলে আমি অনেক খুশী হতাম। ওর মা তো সব সময় কাঁদে। সত্যি, চন্দরা না ফিরলে ওর মা বাঁচবে না।

রাম ওঝা বলল— চন্দরা তো ছেলে। একদিন-না-একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু টিমি যে মেয়ে। এখন আমি কি করি? তার খবর নেওয়া উচিত নয়। তার মুখ দেখাও পাপ। কি লজ্জার কথা!

বিশিজেনা বলল— কিসের লজ্জা? তুমি কি অন্যায় করেছ যে, লজ্জা পাবে? ভুল যে করেছে, শাস্তি তার হবে, তোমার নয়।

প্রহরাজ বললেন— সনিয়ার কিছু শাস্তি পাওয়া উচিত। তা না হলে বিপথগামীদের অন্যায় বেড়ে যাবে। এই ব্যাপারে তোমাদের ভাবা উচিত। চিন্তেই স্বাঁইও দুর্গাপুর থেকে ফিরে আসুন। সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে পরে।

গাঁয়ের লোকে স্বীকৃতি দিল। চিন্তেই স্বাঁই ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রহরাজ বললেন— তাহলে খুব দেরী হয়ে যাবে। আমি বলি কি, যতদিন না তিনি ফিরছেন, ততদিন সনিয়াকে জাতের থেকে

ভিন্ন করে রাখা হোক।

চিন্তেই স্বাই ভেবেছিলেন, ধোবীকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসবেন। তাঁর স্ত্রী শ্রাদ্ধকর্ম বিষ্ণুপুরেই করবেন। কিন্তু ধোবী দুর্গাপুরেই সমস্ত কাজ করার জন্য বেঁকে বসল। নিধিও তাতে সায় দিলেন। যাবতীয় কাজ দুর্গাপুরেই করা হ'ল।

হরি মহান্তি, রাম প্রহরাজ, নিধি স্বাঁই, ধোবী— এদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাঁই পরিবারের সবাই বিষ্ণুপুরে এল। ক্রিয়াকর্মে অনেকে আমন্ত্রিত হল। জমিদার ছোট রায় আর তাঁর গোমস্তা গোবিন্দ প্রধানও আমন্ত্রিত হলেন। সনিয়ার কাছেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাবার জন্য চিন্তেই স্বাঁই বলেছিলেন। হরি মহান্তি যখন চিঠি লিখছিলেন, তখন খুবই অস্থির হচ্ছিলেন প্রহরাজ। তিনি বললেন— আরে! একি করছেন আপনি?

ধোবীও এ-কথা শোনে। সে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

নিধি জিজ্ঞেস করেন— সনিয়াকে নেমতন্ন করলে আপনার আপত্তি কি প্রহরাজ মশাই!

প্রহরাজ সনিয়ার ব্যাপারে সব কিছু বলার সুযোগ খুঁজছিলেন। একটু নস্যি নিয়ে তিনি বললেন— সনিয়া? ওকি কোন মানুষ? ও তো সব রকমেই শেষ হয়ে গেছে······।

প্রহরাজ সব কিছু জানিয়ে বললেন— সমাজে থেকে কেউ সমাজের ওপর অত্যাচার করতে পারে না। সনিয়া অন্যায় করছে। আমরা যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সমাজই ভেঙে যাবে। সনিয়ার কিছু সামাজিক শাস্তি হওয়া উচিত। ওর যদি শাস্তি না হয়, আচ্ছা ভাবুন তো, গাঁয়ের যুবক যুবতীদের কি অবস্থা হবে? যে ধর্ম ও সংস্কৃতি— যে প্রথাগুলো আমরা পুরুষানুক্রমে নিজের করে নিয়েছি, সনিয়া কি সেগুলো দলে পিষে দেবে? সে আমাদের প্রাচীন মর্যাদাগুলো দলিত করছে আর আমরা নিরীহ শিশুর মত দেখে যাচ্ছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে? সনিয়াকে শাস্তি পেতেই হবে— এতেই আমাদের আর

সমাজের কল্যাণ।

চিন্তেই স্ব াঁই নীরব হয়ে গেছেন। হয়ত কিছু ভাবছেন। মরবার আগে ধোবীর মা যা-কিছু বলেছিলেন তাঁর তা মনে পড়ছে। সনিয়াকে উনি নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। সনিয়ার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সনিয়া যে বদলে গেছে। পুরনো স্মৃতি ভুলে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, জাতে ফিরেছিল। কিন্তু আবার কি হল? চিন্তেই স্ব াঁইয়ের মাথায় কিছু আসছে না।

নিধিও তাই ভাবছেন। কিন্তু ধোবীর ভাবনা কিছু অন্যরকম। সে ভাবছে, যা কিছু ঘটছে, তারজন্য নিজেই সে দায়ী। সনিয়া ধোবীর ওপরই প্রতিশোধ নিতে চায়। সে সমস্ত ধরণের অন্যায় সহ্য করে নেবে। তাই সে পতিতা কঁইকে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছে। সংসারের সমস্ত সম্পদ তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছে।

এ-কথা শুনেই ধোবীর রক্ত গরম হয়ে গেছে। তার মনে যেন আগুন জ্বলছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে প্রহরাজের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে চিন্তেই স্ব াঁই বললেন— প্রহরাজমশাই! সনিয়াও ছেলে মানুষী ছাড়েনি। এখনও তার মনে চাপল্য আছে। তার কেউ অভিভাবক নেই। যা মনে আসে তাই করে। এর জন্যে দুশ্চিন্তা করার দরকার কি? ওকেও নেমতন্ন করা হোক। ও এখানে আসুক। আমার মুখের কথা শোনার পর ওর পাগলামি ঘুচে যাবে। ঠিক রাস্তাতেই আবার ফিরে আসবে। অল্প বয়সে কিছু-না-কিছু নতুন কাজ করার ইচ্ছে হয়। যে ভুল সনিয়া করেছে, তার জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত। শাস্তি দেবার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি। চিন্তেই স্ব াঁই সনিয়াকে নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে হরি মহান্তিকে ইশারা করে দিলেন।

নিধি স্ব াঁই-ও খুশী হলেন। তিনি হরি মহান্তিকে ঠেলে দিয়ে বললেন— লেখো না……!

হরি মহান্তি নিবের কলম রেখে দিয়ে বললেন— এ অন্যায়। আমি করতে পারব না। দেখুন, বিনশপুরে মিঞা মুসলমান আছেন।

সবাই কিন্তু নিজের ধর্ম মেনে কাজ করেন। কারো মন্দ বা ক্ষতি করেন না। তাদের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র গেছে। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হলে ওঁরা নিশ্চয় আসবেন। কৃষ্ণপুরের খ্রীশ্চান সোলোমন সাহুকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তিনি খুবই ভালো লোক। সবাই তাঁর সুখ্যাতি করে। প্রত্যেক জায়গায় তাঁর সমাদার করা হয়। তিনি তো সব সময় ধর্ম শাস্ত্র নিয়ে থাকেন। তিনি এখানে এলে কত ভালো হয়। পীরপুরের জমিদার রাজীব জাতে হরিজন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার এত ভালো যে, লোকে বিস্মিত হয়ে যায়। তাকে দেখে মহামুনি বাল্মীকির কথা মনে পড়ে যায়। তার মুখে সব সময় 'হরিনাম' লেগে আছে। তাঁকেও আমি নিমন্ত্রণ পত্র লিখেছি। উনি আসবেন, কত আনন্দের কথা। কিন্তু এঁদের সামনে সনিয়া কে এমন কেউকেটা? নিজের ধর্ম ছেড়ে বিধর্মী হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে সব অন্যায় করছে। এমন লোককে নেমন্তন্নের চিঠি কি করে লিখি? না, এই কাজ আমি করতে পারব না।

প্রহরাজ বললেন— হরিবাবু, যা-কিছু বললেন, ঠিক। সনিয়া পাঠান হোক, চাই খ্রীশ্চান হোক বা হরিজন— সে এ গাঁয়ের ছেলে। এ গাঁয়ে থাকার অধিকার তার রয়েছে। এঁরা সবাই নিজের নিজের ধর্ম মেনে কাজ করে বেঁচে থাকবেন। এতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। সনিয়া কিছু নতুন কাজ করছে। বলছে কি, পৃথিবীতে না থাকবে জাত, না থাকবে ধর্ম। সবাই সমান হয়ে যাবে। এমন করাটা কি উচিত?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— উচিত তো নয়। কিন্তু মশামাছির ভয়ে খিল এঁটে ঘরে ঘুমনো উচিত হবে? একরত্তি ছেলে সনিয়া। চাইলে তো আমরা ওকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব। ওকে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠাও। যদি সে না এসে আমাদের অপমান করে, তাহলে নিশ্চয় কিছু করব। যদি আসে— তাহলে মিঞা সাহেব, সোলোমন, রাজীব জেনা, গোবিন্দ প্রধান, তোমার আমার— সবার সামনে ওকে দাঁড় করাব। ও কি সবাইকার কথা উড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজ করবে? এই পৃথিবীতে

ওকে থাকতে হবে না······ ।

হরি মহান্তি বললেন— সনিয়া তো ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যদি আসেও তাহলে কোন জাতের সঙ্গে বসবে ?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— আগে ও আসুক, তারপর আমি ওকে বোঝাবো। যদি সে মেনে নেয়, তাহলে তো পতিতকে আবার জাতে নেবার ব্যবস্থা আমাদের আছে। প্রহরাজমশাই শাস্ত্রের পাতাগুলো গুলটালেই ওগুলো পাওয়া যাবে। যতক্ষণ আমাদেব তুলসী পাতা আর গোবর ইত্যাদি আছে, ততক্ষণ অপবিত্র শরীরকে পবিত্র করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

প্রহরাজ তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে বললেন— যদি ব্রাহ্মণের দেহে যজ্ঞোপবীত আর মুখে সংস্কৃত শ্লোক থাকে, তাহলে যজমানের মঙ্গলের জন্য সব কিছু হতে পারে। কিন্তু সনিয়া কারো কথা শুনবে না। একবার তাকে জাতে ফেরাবার জন্যে আমি অনেক কষ্ট করেছি। কিন্তু কি হল ? আমার দুঃখ কেউ দেখে না। এছাড়া সবাই বলবে কম খরচে সব কিছু শেষ করো। আচ্ছা এ কি করে হয় ?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— এখন খরচের কথা বাদ দিন। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে ও আমার কাছে আসুক, তারপরে যা হয় দেখা যাবে। ভালো ঘরের ছেলে সে। আজ পতিত হয়ে গেছে। তাকে আবার জাতে নেবার শুভ কাজে যদি কিছু খরচ করতে হয়, তাহলে কেন করব না ?

প্রহরাজ বললেন— আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণ। দেবতার সেবার জন্যেই আমার কাছে পয়সা নেই, অন্যের জন্যে আনব কোত্থেকে ?

নিধি বললেন— হরিবাবু ! চিঠি লিখুন। তা না হলে কলমটা আমায় দিন। আমি লিখে দিচ্ছি। হরি মহান্তি এ-কথা শুনে কলম আর তালপাতা তুলে নিলেন। হুকুম তামিল করা যে তাঁর কাজ।

প্রহরাজ বললেন — আপনার নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে সনিয়া আসতে পারে। কিন্তু যাদের ও নিজের বাড়িতে জায়গা দিয়েছে, তাদের কখনোই ত্যাগ করবে না। হঠাৎ ধোপীর ওপর প্রহরাজের দৃষ্টি পড়ল।

প্রহরাজ বললেন— আপনি একটু ভেতরে যাবেন কি ?

সর্পিনীর মত ফুঁসে উঠে ধোবী বলল— আমি মোটেই খুকী নই। যা-কিছু বলার আছে, আমার সামনে বলুন। আমার মায়ের শ্রাদ্ধ। যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন, তাঁদের নাম জানতে চাই আমি। আপনার কি বলার আছে ?

প্রহরাজ একটু হকচকিয়ে গিয়ে আবার বললেন— কঁই পাগলী কি বকে বেড়িয়েছে আপনি শুনে থাকবেন। ও বলত সনিয়া তার বর আর ও তার বৌ। গাঁয়ের লোকে বলল, কঁইয়ের যে বাচ্চা হয়েছিল, ওটা কার ? বাচ্চাটা এখন বেঁচে নেই। কিন্তু লোকে তো বোকা নয়। এটুকুও কি জানেনা যে, বাচ্চা কার ? কঁইয়ের কথাতেই জানা গেল যে, বাচ্চাটা সনিয়ার··· ।

ধোবী শিউরে উঠল। হরি মহান্তির হাত থেকে কলম নীচে পড়ে গেল। চিন্তেই স্বাঁই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আবেশের সঙ্গে প্রহরাজ বললেন— ওপরে ভগবান আছেন। মানুষের পাপ লুকোনো থাকেনা। আকালে যখন সনিয়া দরজায় দরজায় ভিক্ষে করেছে, সে ভেবেছে কঁই মরে যাবে। কিন্তু কঁই মরেনি। মরেছে তার পেটের কলঙ্ক। কঁই পাগল হয়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, সনিয়া তার বর আর ও সনিয়ার বউ। আপনি জানেন, স্বাঁইমশাই ! সনিয়া বিধর্মী ও অছুঁতদের আর কঁইকে তার বাড়িতে জায়গা দিয়েছে ? এসব লোক দেখানো— লোক দেখানো। আজকে ও ধর্মাত্মা সাজতে চায়, বুঝেছেন ? কঁই যেদিন থেকে সনিয়ার বাড়িতে গেছে, তার পাগলামীও সেরে গেছে। যাইহোক, আপনাদের যা-কিছু করার ভেবে চিন্তে করা উচিত। আমি হচ্ছি পুরোহিত। আমি যা-কিছুই করব, যজমানের কল্যাণের জন্যে।

সবাই চুপ করে গেল।

মারা যাবার আগে ধোবীর মা যা-কিছু বলেছেন, চিন্তেই স্বাঁইয়ের তা মনে পড়ে গেল— সনিয়ার হাতে আমার ধোবীকে দিও। তিনিও কথা দিয়েছেন— তুমি নিশ্চিন্তে থাকো ধোবীর মা। যা চাও, তাই

হবে। কিন্তু আজ প্রহরাজ মশাই এ কি বলছেন? তিনি তো মিথ্যে কথা বলেন না। সনিয়াই কলঙ্কের কীট। কিন্তু ওতো জাতে পুরুষ। চিরকাল মোটেই কি এমন থাকবে। মন যদি ঘুরে যায়, সব কিছু বদলে যাবে। কলঙ্কও ঢাকা পড়বে।

এ-কথা ধোবীর কানেও এল। কিছু ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। তাহলে কি··· তাহলে কি সনিয়া দাদা এসব ব্যাপার আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল? আমাকে ঠকাতে চেয়েছিল? কিন্তু কেন?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— নিধি! সনিয়াকে চিঠি পাঠাও। ওকে আসতে দাও।

ধোবী উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল— না না, সনিয়াকে নেমতন্ন করা হবে না। বাবা! আপনি কি ভুলে গেছেন, ওর বাবা সকলের সামনে আপনাকে অপমান করেছিলেন? কি এমন বড়লোক হয়ে গেছে সে? সনিয়া বদলে গেছে? আজ নীতি, ধর্ম— সব কিছু ত্যাগ করে তার অবনতি হয়েছে। আমার মায়ের শুদ্ধিকর্মে তাকে ডেকে আমাদের সংসারের পবিত্রতা নষ্ট করা কর্তব্য নয়।

ধোবীর সমস্ত শরীর কাঁপছে। উদ্বেগে সবাই তার দিকে তাকিয়ে। চিন্তেই স্বাঁই বললেন— এই কাজে তুই বাধা দিস না, ধোবী! শেষ সময়ে মনে আছে, তোর মা কি বলেছিলেন?

—মায়ের বুঝতে ভুল হয়েছিল। তিনি ছিলেন পবিত্র, নিষ্পাপ। খুবই সরল। তাঁর চোখে পৃথিবীর সবাই ভালো ছিল। আমি সুখী হবো— এই উনি চাইতেন। আমি যদি আজ সুখী থাকি উনি যেখানেই থাকুন, খুশী হবেন। ওঁর আত্মা নিশ্চয় শান্তি পাবে। আজ সনিয়া আমার বাড়িতে পা দিলে আমি খুশী হবো না। আমার মায়ের আত্মা অপমানিত হবে, বাবা!

নিধি বললেন— ওরে পাগলী! এ-সব কি বলছিস?

ধোবীর চোখে অশ্রুজলের ধারা বইল। সে বলল— সত্যি বলছি, কাকা! আমি যে সনিয়াকে চেয়েছি, সে এই ব্যাভিচারী সনিয়া নয়। চিন্তেই স্বাঁই কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু ধোবী আবার চীৎকার

করে বলল— প্রহরাজ মশাই যা বলেছেন, সব সত্যি। সনিয়ার কাছে নেমতন্নের চিঠি যাবে না, যাবে না··· যাবে না···।

চোখের জল লুকোতে ধোবী ঘরের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার বাবা, কাকার কাছে কি করে চোখের জল ঢাকে?

এই দেখে প্রহরাজ খুশী হয়ে বললেন— তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারছিনা, মা আমার। তুমি তো যেন জীবন্ত মা দুর্গা।

হরি গোমস্তা স্বাঁই ভাইয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন— মশাই, কার মেয়ে— কার বৌ—।

নিধি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চিন্তেই স্বাঁই সচকিত হয়ে উঠে বললেন— আরে কি নির্বোধের মত বকে যাচ্ছ। পাগলামো ছাড়ো। চলো, চলো, নিধি, আমার নামেই চিঠি লেখো।

এ-কথা প্রহরাজ মশাই বুঝতে পারলেন না। যাইহোক, আরেকটা সভা হবে মাত্র এটাই তিনি বুঝলেন।

যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁরা কিছু না-কিছু জিনিস পাঠিয়েছেন। হরি মহান্তি, রাম প্রহরাজ, নিধিস্বাঁই— সবাই যে যার কাজে রয়েছেন। মাঝে আর দু-তিন দিনই কেবল আছে। ব্যবস্থা আগে করা দরকার। তা না হলে এত বড় কাজ সম্পূর্ণ হবে কি করে?

সবাই কাজে নিরত। কিন্তু ধোবী অস্থির। কাকীমা বাড়ির সব কিছু দেখাশোনা করছে। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা-হাসাই ধোবীর কাজ কিন্তু তাতেও তার সময় কাটছেনা। সে জানে যে, বাবা তার বারণ শোনেননি— সনিয়া দাদাকে নেমতন্ন করে চিঠি পাঠিয়েছেন। সনিয়া অভিমানের সঙ্গে নাপিতের হাতে খবর পাঠিয়েছে, স্বাঁই মশাই বড়লোক— তাঁর আঙিনায় সনিয়ার মত মজুর কি করে আসবে? এছাড়া নিমন্ত্রণ পত্র সনিয়া গ্রহণ করেছে। কিন্তু আসবে না কি? আজ পর্যন্ত তার কোনো আভাস নেই কেন? সে যদি না আসে। বাবাকে আরও অসন্তুষ্ট করে আর অপমান করে, তাহলে কি হবে···? ধোবী তারপর

আর কিছু ভাবতে পারে না।

সনিয়া সম্পর্কে গ্রহরাজ যা-কিছু বলেছেন, তা সত্যি কি? সত্যিই কঁইকে নষ্ট করে পৃথিবীর সামনে সনিয়া ভালোমানুষ সাজার চেষ্টা করেছে? এ-কথা চিন্তা করতেই ধোবীর চোখে জল এসে যায়। যাইহোক, ধোবী চায় সনিয়া সুখে থাকুক। কিন্তু তার মন দুঃখ পায়। কাকে বলে তার মনের কথা?

একদিন ধোবী পুনীকে সব বলে ফেলল— পুনী! সনিয়া দাদা ঠিক কাজ করছেনা। সে সুখে থাকুক, পরিভা বংশের নাম উজ্জ্বল করুক— আমাদের সবার ইচ্ছেই এই। ও যদি ভালো হয়, নাম কেনে, কত আনন্দের কথা হবে?

পুনীর কোলে তার তিন বছরের ছেলে বনা অস্থির হয়ে উঠেছে। ছেলে তো মোটে তিন বছরের, কিন্তু খুবই দুষ্টু। পুনীর কাপড় টেনে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

বনাকে দেখে ধোবীর মনে বাসনা জাগে। ভগবানের ইচ্ছেয়, তার পেটে এমন একটা বাচ্চা হলে ও কত খুশী হত। পুনীর মত সে-ও তার ছেলেকে ভালবাসত, বুকের দুধ খাওয়াত; গোপালের মত ছেলেকে কোলে নিয়ে সে অন্তহীন আনন্দ পেত। বনাকেও কোলে নিতে সে অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই ইচ্ছে কেটে গেছে। অছুঁত বাউরীর ছেলে যে! তাকে কি করে কোলে নেবে? লোকে কি বলবে?

পুনী বলল— দাদাকে আমি অনেক করে বুঝিয়েছি। আমার ঘরে ওকে বসতেও দিইনি। আমার ভয় ছিল, ওকে আমার বাড়িতে লোকে দেখলে, ওর জাত যাবে। কিন্তু মানলে তো! দেখতো, পাগলামি করে আবার কি করেছে? আবার জাত খুইয়েছে। অছুঁত পাঠান মানুষকে নিজের বাড়িতে রেখেছে। এখন পরিভা বংশের নামটাও ডুবে গেল। শেষটায় ও কি করতে চায়?

ধোবীর মন চাইছে সাবিত্রী অমাবস্যার ঘটনা পুনীকে বলে দেয়— ওকে বলে দেয়, সনিয়া দাদা তারই জন্যে এত কষ্ট করেছে। কিন্তু

ধোবী সে কথা বলতে পারে না। কেউ যেন তাকে থামিয়ে দিল···।

পুনী বলল— ধোবী দিদি! একটা কথা জিজ্ঞেস করব? মরবার সময় তোমার মা যা বলে গেছেন, তুমি কি তা শুনেছ? তুমিও কি তাই চাও?

ধোবী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখে কথা আসেনা। নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার। আরে! কত দুর্বল হয়ে গেছে সে। সমস্ত শরীরে বসন্তের দাগ··· মাথার চুল ছোট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে সে মাথা তোলে। বলে— আমার হ্যাঁ বা না তে কি হবে, পুনী? আমরা মেয়ে। আমরা পরের হাতের খেলনা···। আচ্ছা, পুনী, একটা কাজ করবি?

—কি?

— যাবি সনিয়া দাদার বাড়ি?

পুনী শিউরে ওঠে। কোন্ মুখে সে আবার বিষ্ণুপুরে যাবে? লোকে যে হাজারটা প্রশ্ন করবে। যেদিন থেকে সে অচ্ছ্যুত মধু ভোইয়ের বাড়িতে আছে, সেদিন থেকে সে ভেবে নিয়েছে বিষ্ণুরের পুনী মারা গেছে। বিষ্ণুপুরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কি করে সে এখন যায়···?

—পুনী! চুপ করে গেলি যে? যাবি কি না, বল্ না?

—কিন্তু এতো বলো, আমি যাব কেন?

—তুই ছাড়া আর কেউ সনিয়া দাদাকে ঠিক রাস্তায় ফেরাতে পারবে না, পুনী! কাঙালের মত ওখানে যারা পড়ে আছে, তুই গেলে বেরিয়ে চলে যাবে। ওদের প্রয়োজনই বা কি? খেয়েদেয়ে আরামে থাকাটাই তো! তার ব্যবস্থা আমি করব। এত লোককে সাহায্য করলাম, আর পাঁচজনকে কি করতে পারব না? আমি ওদের পেট চালানোর মত জমি দিয়ে দেব। আমার অনেক সম্পত্তি আছে যাকে ইচ্ছে তাকে দেব! এতে আর কারো অধিকার নেই। এই সব কথা সনিয়াকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবি, বুঝলি?

সব শুনে পুনীর ঠোঁটে হাসি ফুটল। চোখে এল আনন্দের

অশ্রু। খুশী হয়ে বলল— আমি যাব ধোবী দিদি! যা-কিছু অপমান সহ্য করতে হয় হোক, তোমার জন্যে আমি যাব, নিশ্চয় যাব। বনাকেও আমি নিয়ে যাব। বনার বাবাও যাবে···। লোকে দেখে তো দেখুক। কিন্তু সনিয়া দাদাকে আমি অতি অবশ্যই নিয়ে আসব। আর তোমার সামনে হাজির করব।

অস্থির ভাবে ধোবী শুনছে। একি বলছে পুনী?

পুনী বলল-- ধোবী দিদি! তুমি দেখো, আমি দাদাকে নিয়ে নিশ্চই ফিরব।

মধুভোই কাঁধে কুড়ুল নিয়ে ফিরল। মধুকে দেখেই পুনী তার বাচ্চাকে কোল থেকে নাবিয়ে দিল। ঘোমটা টেনে বলল— আরে! এটা কি দেখা করার সময় হল?

মধু বলল— মা ঠাকরুণ! ঘরের সামনেটায়, যেখানে ছাউনি ফেলার ছিল, আমি ফেলে দিয়েছি। বুড়োবাবু বললেন যে, আপনাকে এসে দেখে নিতে। তারপর রংচং করার কাজ আরম্ভ হবে।

ধোবী হাসতে হাসতে বলল— উনি যেমন বলছেন, সে ভাবেই কর। এর চেয়ে বেশী আমি কি করতে পারি? নিজের ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যা।

মধু বনাকে কোলে নিয়ে রওনা দিল। মধু চলে যাবার পর ধোবী বলল— মধু অছুঁ্যতের ঘরে জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু গত জন্মে ও নিশ্চয় কোন রাজবংশে জন্মেছিল। শুনে পুনীর গর্ব হল। কিন্তু ক্ষণিকেই তার ধোবীকে ঈর্ষা হতে শুরু করল। তার মনে হল, কেউ যেন তার বুকে ছুরি চালাচ্ছে। কিন্তু মনের কথা মনেই থেকে গেল। সে বলল— আচ্ছা বলো, ধোবী দিদি! এই পৃথিবীতে দাদার পায়ের ধূলোর যোগ্যও কেউ নেই, তাই না?

ধোবী হাসতে হাসতে বলল—তোর মুণ্ডু যা হট্! ধোবী যা করেছে, তা কি ঠিক? সনাতন হিন্দুধর্মের এক অবতারের মত ধোবী সঠিক পথে চলেছে। সে তার সমস্ত সম্পত্তি গরীব নিরাশ্রয়দের দিয়ে দিয়েছে। দেবমন্দির তৈরী করেছে, ব্রাহ্মণকে জমি-সম্পত্তিও

দিয়েছে। ঘর-সংসারে থেকেও সে যোগিনীর মত বেঁচে আছে। সে হ'ল সময়ের এক অদ্ভুত নিয়মের মতো। চোখে তার জল বয়ে নামে কিন্তু অশ্রুধারাতেই সে অনুভব করে অদ্ভুত আনন্দ আর অপূর্ব শান্তি।

এ কি তার ভুল?

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে গেছে। মেঘে ঢেকে গেছে সমস্ত আকাশ। সনিয়া তার বাড়ির বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে কিছু ভাবছে। কি ভাবছে সে? অনেক ভাবনা আসছে মনে। রীতি প্রথা মেনে চলো, তাহলে লোকে বলবে ঠিক রাস্তায় চলছ। বাপঠাকুর্দার পথ ধরেই চলা উচিত-- চাই কি সে শ্মশানের দিকে যাক না কেন। কিন্তু নতুন রাস্তা তৈরী করা শক্ত। ওতে গাড়ির চাকা ঘোরে না। নতুন রাস্তায় চলার অনেক অসুবিধে। সনিয়ার মনে হচ্ছে, যেন নতুন রাস্তাতে তার গাড়ী থেমে গেছে।

রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে সনিয়া রহিমের সঙ্গে জমিতে ধান বুনেছে। কাশী বেজ আর ভরত সামল এত পরিশ্রম করতে পারেনা। বুড়ো জনকাকাও একদিন ক্ষেতে গিয়েছে। কিন্তু একদিনের খাটুনিতে তার অসুখ করে গেছে। রহিম তার সেবা করেছে। এখন সে সেরে উঠেছে। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি এখনো। সে হাঁটতে চেষ্টা করে, কিন্তু এখনো শরীর কাঁপে।

কঁই ঘরের যাবতীয় কাজ করে যেখানে সনিয়া আর রহিমের সেই ক্ষেতে চলে এসেছে। ওদের ওপর রাগ দেখিয়েছে বলেছে— বৃষ্টিতে ঐভাবে ভিজলে জ্বর হবে, সব কাজের বারোটা বেজে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবো তো!

সনিয়া ধোবীকে বাড়ি ফিরতে বলেছে। কিন্তু ও ফিরলে তো! কঁইও বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষেতের কাজ করেছে। কিন্তু এখন কঁইয়েরও শরীর খারাপ। দু-তিন দিন ধরে ভীষণ জ্বর। চোখ পর্যন্ত খুলছে না। রহিম তার সেবা করছে। কতদিন আর এভাবে চলে? এখন যে গাঁয়ের

লোকেরা সনিয়াকে আবার ভিন্ন করে দিয়েছে। চারগুণ মজুরী দিলেও সনিয়ার জমিতে চাষ করতে কেউ রাজি নয়। জনকাকার শক্ত অসুখ। কিন্তু কবিরাজ তাকে ওষুধ পর্যন্ত দেয়নি। সবাই সনিয়ার বিরুদ্ধে। গাঁয়ের লোকের সহানুভূতি ছাড়া গাঁয়ে থাকা মুস্কিল।

বারান্দার ধারে বসে ভরত সামল এক ভজন গাইছে— "চকা নয়ন কু চাহিঁ গরীব জনে"···চাকার মত চক্ষুস্মানের (জগন্নাথ প্রভুর) কাছে একজন গরীব মানুষের প্রার্থনা।

সনিয়া মন দিয়ে ভজন শুনছিল। ব্যাকুলভাবে ভরত সামল গাইছে। কিন্তু শোনার লোক কোথায়? ভরত অসুস্থ। কে তার যন্ত্রণা লাঘব করবে? অন্য দিকে অন্ধ কাশী বেজ গাইছে— "ঘট ছুটিলে তোতে বলিবে ভূত রে"— শরীর যখন থাকবে না। লোকে তোকে ভূত বলবে।

সনিয়া মন দিয়ে সব শুনছিল। কি ভাবনায় আবার সে ডুবে গেল। চিন্তেই স্বাঁই তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। ঠাট্টা করার জন্যে? যখন ও খেতে পেত না, মজুরের কাজ করার জন্য তার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কাজও জোটেনি অসহায় মজুরদের রক্ত শুষে শুষে আজ তিনি বড়লোক হয়েছেন। এমন ব্যক্তির বাড়ি যাওয়া কি উচিত হবে? না, যা-ই কিছু ঘটুক, ও যাবে না। সনিয়া সিদ্ধান্ত নিল— চিন্তেই মন্দই ভাবুন, ও যাবে না। এর চেয়ে তো ক্ষেতে কাজ করতে করতে মরে যাওয়া ভালো।

রহিম ডাকল— সনিয়া দাদা! কঁই দিদির জ্বর বেড়ে গেছে।

সনিয়া উঠে রহিমের পেছন পেছন চলে গেল। একটা চাটাইয়ের ওপর কঁই শুয়ে আছে। তার বালিশের পাশে বসে জনকাকা কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সনিয়াও জনকাকার মত কঁইয়ের কপালে হাত বোলাতে লাগল।

জ্বর অনেক বেড়ে গেছে।

সনিয়া বলল— রহিম তুই তো খুব ক্লান্ত। কিন্তু এখন একটা কাজ করা দরকার। করবি?

—কি ? রহিম উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—তুই কবিরাজের বাড়ি যা। আর···

কবিরাজের নাম শুনেই রহিমের মুখ শুকিয়ে গেল। সে জানত কবিরাজ আসবে না। কিন্তু ভাবল, কবিরাজের পায়ে ধরে সব বলবে। যদি না আসে তাহলে, ওষুধ তো দেবে। রহিম তক্ষুনি ওখান থেকে বেরুল।

সনিয়া বলল— তুমি খুব দুর্বল হয়ে গেছ, জনকাকা। যাও, অন্য ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। তোমার অসুখ হলে সবার অসুবিধে হবে। কিন্তু জন যে সেবা করতে চায়। সনিয়ার বোঝানো— সোঝানোর পর সে অন্য ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

সনিয়া কঁইয়ের আরো কাছে গিয়ে বসল।

কঁই চোখ খুলল। সনিয়া পাশে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ঘরে আর কেউ নেই।

কঁইয়ের স্বপ্ন যেন সফল হয়েছে। তারই এই ঘর। সনিয়া তার বর— এ মিথ্যে নয়, পাগলামো নয়। এতদিন সে যেন অন্ধকারে ছিল। এখন যা দেখছে, সত্যি। পৃথিবীর মানুষকে কি এখন সে পরোয়া করে ? পৃথিবীতে প্রলয় হলেও সে নিশ্চিন্তে থাকবে। তার হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে।

কঁই চারদিকে তাকাল। সত্যি সনিয়া ছাড়া আর কেউ নেই। তার হৃদয়ের দেবতা তার সামনে বসে। আজ যেন তার ফুলশয্যার রাত। জীবনে মধুর সময় বার-বার আসে না।

কঁই তার হাত তুলে সনিয়ার হাতে রাখে। আস্তে আস্তে সনিয়ার হাতটাতে হাত বোলাতে লাগল আর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মমতায় ভরে গেছে সনিয়ার মন। আস্তে সে ডাকল— কঁই একটু বার্লি খাবে ?

কঁইয়ের শুকনো ঠোঁটে হাসির ঝলক খেলে গেল। চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল— এ বাড়ি কার সনিয়া দাদা ?

সনিয়া বলল— তুমি জানো না? এই বাড়ি তো সবার। এ বাড়ি তোমার।

ক্ষণিকের জন্য কঁই চুপ করে গেল। দু-হাতে সে সনিয়ার হাতে চাপ দিচ্ছিল। বলল— এই বাড়ি সবার। আমার নয়?

সনিয়া দেখল, কঁইয়ের জ্বর বাড়ছে। তার মনে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। এ অবস্থায় দুঃখ পেলে জ্বর আরো বেড়ে যাবে। সে বলল— কঁই! এটা তোমারই বাড়ি, আর কারো নয়। এখানে যারা আছে সবাই তোমার। জনকাকা, রহিম, কাশী, ভরত— সবাই যে তোমার। এই বাড়ি একমাত্র তোমারই।

কঁই হাসল। এই বাড়ি আমার— আমার— আমার— সে বিড় বিড় করতে লাগল। সনিয়া আস্তে তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল— চিন্তার কিছু নেই, কঁই। তুমি সেরে উঠবে— খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

কঁই আনন্দে উঠে বসল— বড় বড় চোখ করে সনিয়াকে দেখল। বলল— সনিয়া দাদা! তুমিই আমার বর। মরবার আগে আমার বাবা যে একথাই বলে গেছেন। ক্ষিদের জ্বালায় আমার হাত ধরে উনি ভিক্ষে করেছেন। নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছেন। বলতেন— কঁই! তুই দুশ্চিন্তা করিস না। ওপরে ভগবান আছেন। উনি কি দেখছেন না? ভগবান আমাদের নিশ্চই সাহায্য করবেন। উনি বলতেন— আমরা বাড়ি ফিরে যাব। তুই তো পরিভা বাড়ির বৌ। বনেই পরিভাও বলেছিলেন, ভালো সময় আবার আসবে।

বলতে বলতে থেমে গেছে কঁই। চোখ উপচে এসেছে জল।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার শুরু করল তার কাহিনী— আমার বাবার হাঁটুতে ব্যথা হল। হাটু ফুলে গেল। বাধ্য হয়ে আমি একটা গাঁয়ের মন্দিরের পেছন দিকে বাবাকে শুইয়ে দিলাম। ওখানে একটা আম বাগান ছিল। তার পেছনে ইটের গাদায় অনেক সাপ ছিল। সনিয়া দাদা, ভিক্ষে করে ভাতের ফেন তাঁর মুখে তুলে দিতাম। কিন্তু শেষে ভিক্ষেও জুটল না। সেই গাঁয়ে সম্পদশালী বড় পরিবার একটিই

ছিল। তাঁরা কাঙালদের অল্প অল্প ভাত দিত। কিন্তু তাদের ভাতও শেষ হয়ে গেল। কাঙালেরা কিছুদিন অপেক্ষা করে অন্য জায়গায় চলে গেল। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হতে লাগল। তার ওঠার ক্ষমতা ছিল না। এ-অবস্থায় আমি ওঁকে একলা ছেড়ে যাই কি করে?

—তারপর···ও! কি করে বলি, তারপর কি হল? বাবার মুখে সামান্য ভাতের ফেন দিতে আমি একজন লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সে যে কে, আমি জানতাম না। সে আমাকে ধরল। বলল, আমাকে ভাত দেবে— ভাতের ফেনও দেবে। তখনও বাবার কাতর চীৎকার আমার কানে আসছিল। কঁই! আমার মুখে একটু ফেন দে···! সেই লোকটা ছিল একটা রাক্ষস। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল— আরে, কঁই! তোর তো একটাই পেট— কত আর ভাত খাবি— ফেন খাবি?

—সনিয়া দাদা! সেদিন নিজের প্রাণ নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। এক হাতে জলের ছোট ঘটি আর অন্য হাতে ছিল একটু গরম ভাত, নুন আর একটু তরকারী। ভেবেছিলাম, বাবা খাবার খেয়ে খুশী হবেন। যে ভাত দিয়েছিল, সেই লোকটাও বলেছিল— প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় চলে এসো— ভাত নিয়ে যেও। ও লোকটা ভালো নয়। আমি ভাত নিয়ে পালিয়ে এলাম। বাবাকে বেড়ে দিলে উনি মৃত্যুর মুখ থেকে রেহাই পাবেন ভেবে।

—কিন্তু···কিন্তু ফিরে দেখি, বাবা চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন···।

—আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। নিষ্প্রাণ বাবার মুখে হাত দিলাম। জল দিলাম— কিন্তু তিনি আর উঠলেন না। সকাল হবার আগে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাচ্ছিলাম জানি না।

কঁই চোখ মুছল। তার সামনে নিজেকে সনিয়ার অপরাধী মনে হল। বাবার জন্যে কঁই নিজের সর্বস্ব বলি দিয়েছে। কিন্তু সনিয়া? সে যে তার পেটের তাগিদে নিজের বাবারও প্রাণ নিয়েছে।

কঁই বলল— পাপ কি, পুণ্য কি— এ আমি জানতাম না। এ-ও বুঝিনি যে, যা করছি, তা ঠিক কি ভুল। পেটের প্রচণ্ড ক্ষিদে সহ্য করতে পারিনি। এই সময়ে যে এক মুঠো ভাত দিয়েছে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাকে নিজের এই শরীর না দিয়ে কি করে থাকি? যখন তার কাছে অবহেলা পেয়েছি, তখন তাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি অন্য গাঁয়ের দিকে। বাঁচার আশায় কাঙালদের সঙ্গে ঘুরে মরেছি।

—সময় কেটে গেছে। আমাকে যে দেখে, জিজ্ঞেস করে— তোর বর কে? আমি বুঝলাম, আমি অন্যায় করেছি— পাপ করেছি। বর ছাড়া মা হবার অধিকার আমার নেই। যে আমার স্বামী হবে, তার বাচ্চাই আমার পেটে থাকবে। সমাজের এই নীতি। সবাই বলত, সনিয়া আমার বর। কিন্তু সনিয়া দাদা! তোমার বাচ্চা তো আমার পেটে ছিল না। কার বাচ্চা ছিল আমার পেটে? এ আমিও জানি না। সত্যি বলছি ভাই, এভাবে বাঁচার চেয়ে রাস্তার ধারে মরে যাওয়াও ভালো।

কঁই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। জ্বর আরো বেড়ে গেছে। পাথরের মূর্তির মত সনিয়া নির্বাক হয়ে তার পাশে বসে। একদৃষ্টে দেখছিল কঁইয়ের দিকে।

কঁই আবার বলল— সেদিনের কথা আজ মনে আছে, যেদিন আমার পেটের বাচ্চাটা প্রথমবার কাঁদল। আমি তার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকালাম। সত্যি বলছি, ওকে একেবারে চুপ করাবার সাহস আমার ছিল না। ভাবলাম ওকে শেষ করে দিয়ে নিজের পাপ একেবারে মিটিয়ে দেব। তারপর আমি আবার নিষ্কলঙ্ক হয়ে যাব। তারপর ফিরে আসাটা সোজা হবে। এ অবস্থায় আমি তোমার বাড়িতেই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা ছিল শক্ত। আমি তা করতে পারিনি। আমার কলঙ্কের সাক্ষী নয়নের মণিকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে মরলাম। একদিন এল, যেদিন সেও চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

—কিন্তু সনিয়া দাদা, জীবন্ত কলঙ্ক তো শেষ হয়ে গেল। তবু দাগ মিটল না। আমি পাগল হয়ে গেলাম। লোকেও ওই নামে

আমাকে ডাকতে লাগল। আমিও এখানে ওখানে সব গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিজের কলঙ্কের কথা সবাইকে বলেছি। আমার গাঁয়ের কথা— আমার সনিয়ার কথা ভুলে গেছি।

কঁই জোরে হেসে বলল— আমি এ বাড়িতে হঠাৎই এসেছিলাম। এখানে আসতেই পুরনো দিনের সব কথা মনে পড়ে গেল। আজ তোমার বাড়িতেই আমার আশ্রয় জুটেছে। আমি পাগল নই, সনিয়া দাদা— পাগল তো তুমি। পরের জন্যে খেটে খেটে মরছ, নিজের জাত ধর্মও হারিয়ে বসে আছ পরের জন্যে। গাঁয়ের সবাইকার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছ। আবার পাগলী কঁইকেও বাড়িতে জায়গা দিয়েছ। তাহলে পাগল কে, তুমি না আমি?

সনিয়া দীর্ঘশ্বাস নেয়।

উত্তেজনায় কঁইয়ের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে উঠে জোর গলায় বলে— তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ সনিয়া দাদা। আমি, কাঙাল ভিখিরি— নিজের জাতটুকুও খুইয়েছি। এ অবস্থায় আমাকে কে আশ্রয় দিতে পারে? কে আমার আপন হতে পারে? এ সব মিথ্যে। মিথ্যে— মিথ্যে— মিথ্যে। এই বাড়িতে আমি থাকব না। কোথাও একটা চলে যাবো আমি— চলে যাব···।

কঁই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখে সনিয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে আগে দৌড়ে কঁইয়ের হাত ধরে— এ কি করছ, কঁই? বোসো তো, শোনো— আমার কথা তো একটু শোনো। —জোর করে সে কঁইকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। কঁই উদ্বেগে সনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সনিয়া আবার তার হাত ধরে বলল— তুমি অনেক দুর্বল হয়ে গেছ কঁই। তোমার অনেক জ্বর। আমি তোমার সব কথা শুনেছি। কিন্তু আমার কথা তো শুনলে না। তুমি একটু শোও। রহিম এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আসছে। আবার তুমি ভালো হয়ে যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে ওঠো। তারপর আমার কথা শোনাব। আমি কিছু লুকোব না। সব বলব। সত্যিই তুমি কোনো পাপ করোনি। কঁই, পাপ তো করেছি আমি।

সনিয়ার কথা মেনে নিল কঁই। ও ঘুমিয়ে পড়ল। সনিয়া তার পায়ে একটা ঢাকা দিয়ে দিল। রাতের অন্ধকারে রহিম কোথায় চলে গেছে। ভরতের গানও থেমে গেছে। জনকাকা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। কাশী বেজ মাঝে মাঝে ভজনের ওই চরণটা দোঁহার দিয়ে গাইছে— ঘট ছুটিলে তোতে বোলিবে ভূত রে সনিয়া নিজে কিছু করতে চাইল। বার্লি— জলের গেলাসটা নিয়ে এসে কঁইকে খুব আস্তে বলল —কঁই! এই জলটুকু খেয়ে নাও।— কঁই চোখ-ও খুলল না। সনিয়া তার মুখের কাছে বার্লির গেলাস ধরল। মাথাটা সামান্য তুলে কঁই বার্লিটুকু খেয়ে নিল, আবার শুয়ে পড়ল। সনিয়া কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অনেক পরে রহিম বাড়ি ফিরল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে। তার কাছে জানা গেল, কবিরাজ ওষুধ দেয়নি। সে অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু কবিরাজ বলেছে, গাঁয়ের লোকে একটা সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ওদের সঙ্গে যদি কেউ সম্পর্ক রাখে, তবে তাকে জাতিচ্যুত করা হবে।

সনিয়া বলল— আচ্ছা তুই গিয়ে শুয়ে পড়। আমি রুগীর কাছে আছি। দরকার হলে তোকে ডেকে তুলব। —রহিম অন্য ঘরে চলে গেল।

কঁইয়ের পাশে বসে রইল সনিয়া। তার মাথায় অনেক ভাবনা। সে ভাবল, যা-কিছুই সে করেছে, সব ভুল। এই সমাজ অনেক প্রাচীন। কুসংস্কারে ভরা। এখানে থাকতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। ঠিক কি ভুল— কেউ দেখবে না। মানব-মনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক বাধা আছে। চিন্তেই স্বাঁইয়ের মত স্বার্থপর ধনীর দল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন পাহাড়ের মত। হাজার বছর আগে সমকালীন সমাজের কথা মাথায় রেখে যে নিয়মগুলো করা হয়েছিল, রাম প্রহরাজ সেই নিয়মের পূজারী। সনিয়া কিছু সংস্কারের কাজ করেছে। কিন্তু সে যা করেছে, পৃথিবীর চোখে সে সবই ভুল। বাবার প্রাণ বাঁচাতে কঁই তার দেহ বিক্রী করেছে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে

পুরুষের কাছে থেকেছে। বাচ্চাকে বুকে নিয়ে সে বহু জায়গায় ঘুরেছে। সব জায়গাতে সে বলেছে, বাচ্চা তার। কিন্তু এই সভ্যতার মূল্য কেউ দেয়নি। সত্যি কথা বলে সে লোকের চোখে হয়েছে কলঙ্কিনী। সমাজে তার কোন জায়গা নেই। তাকে যে আশ্রয় দেবে, সমাজের চোখে সে-ও হয়ে যাবে চ্যুত।

সনিয়ার চোখের সামনে যেন ধোবী দাঁড়িয়ে। শিবরাত্রির রাতে ধোবী এসেছিল। আজ ধোবী নেই। পাশে শুয়ে কঁই। সনিয়া তার দিকে একদৃষ্টে তাকেই রইল। অসহায়তা ও অক্ষমতার কারণে সে আর কোথাও যেতে পারবে না। ধোবী তো সনিয়াকে বিদায় জানিয়েছে। কিন্তু কঁই সনিয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। কঁই-ও আজ সেই পথের সঙ্গী, যে পথে সনিয়া চলেছে একা— একেবারে একা। ধোবী যদি তার মন আর ভাবনা থেকে সরেও যায়, কি তফাৎ হবে সনিয়ার? যেতে হলে ধোবী চলে যাক। সেইখানে কঁই স্থান পাবে। এই ঘরে আজ কঁই-ই হল গৃহিনী। সনিয়ার জন্য সে তার প্রাণ উৎসর্গ করতে তৈরী।

অস্থিরতায় কঁই পাশ ফিরল। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিল। চোখ খুলল। সনিয়া খুব কাছে বসে আছে। খুশী হল সে। সনিয়া তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সারা শরীর তার ঘর্মাক্ত। চাদর মুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে আছে কঁই। ঘাম দেওয়া মানে জ্বর ছেড়ে যাবে। সনিয়া চাদরের ওপর একটা কম্বলও ঢেকে দিল।

গভীর রাত। নিঃশব্দ পরিবেশ। কিছুক্ষণ পরে সনিয়া বাইরে এল। সমস্ত জিনিসপত্র ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এঁটো বাসনও এখনো উঠোনে পড়ে আছে। কঁই জ্বরে পড়ায় সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সনিয়া রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করল। অন্য ঘরে জন-কাকা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। তার পাশেই রহিম ঘুমোচ্ছে। বিছানা পাতেনি সে। হাতকে বালিশ করে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাশী বেজ গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছে। কিন্তু ভরত সামল এখনও জেগে আছে।

সনিয়া মাঝের ঘরে কুপীটা রেখে এল। আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ করেছে। হাওয়া নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে বাড়ির দিকে তাকাল। এই বাড়ি তো ধোবীর টাকায় তৈরী। ধোবীর টাকা ও ভালবাসাতেই তরুণ সনিয়ার মন নতুন বাসনায় ছেয়ে গিয়েছিল। তার ফল এই বাড়ি।

সাবিত্রী অমাবস্যার রাতে ধোবী যা করেছে, তা যদি না করত, আজ কি হত? এই বাড়ির অবস্থা আজ কি হত? এই বাড়িতে যারা আজ আশ্রয় নিয়েছে তাদের কি হত? যদি ধোবীকে সে এই বাড়িতে নিয়ে আসত, তাহলে তার জীবন-গাড়িটা বড় পুরোনো পথে চলত। ধর্ম আর সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে, সব কিছু মেনে— সবার কাছে মাথা নীচু করে সে-ও তার ঘর-সংসার চালাতো।

কিন্তু সনিয়া তা করেনি। সে আজ যা কিছুই করছে, সব কি ভুল? মানুষ কি তার স্বার্থ ছেড়ে বাঁচতে পারবে? মানুষ প্রথমে নিজের ভালোর জন্যে আর পরে সমাজের ভালোর জন্যে কাজ করে। সবাই আমার আর আমি সবার— এই সত্যের উপলব্ধি সন্ন্যাসী ছাড়া বোধহয় আর কারো হবেনা। সমাজে থেকে পরকে আপন করার কাজ অসম্ভব। এমন কাজ যে করে, লোকের দৃষ্টিতে সে পাগল।

আরো ভাবল সনিয়া— সবাই স্বাধীন হোক— সমান হোক— এটা আদর্শের কথা। কিন্তু বাস্তবে এ সম্ভব নয়। যা সম্ভব, তা হল মানুষ ছোট আর বড় হয়েই পৃথিবীতে থাকবে। সবাই সমান হতে পারেনা। নিজের নিজের কর্মফলই সবাই ভোগ করে। তা-না হলে মানুষ কাজ করবে কেন? কেন সে পরিশ্রম করবে আর তার পরিশ্রমের ফল কোনো অলস অপদার্থ বসে বসে খাবে? মনুষ্য জাতির সভ্যতা কি শেষ হয়ে যাবে?

মানুষ নিজের জন্যে কাজ করবে। তার বংশধরের জন্যেও করবে। যাতে ভবিষ্যত পুরুষদের অনন্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার বাসনা বদ্ধমূল থাকে। মানুষকে অর্থ-সঞ্চয় করতে হবে নিজের আর বংশধরের জন্যে।

ধোবী যা করছে, ঠিকই করছে। কিন্তু সনিয়া ভুল করেছে।

ধোবী গরীবদের মনে সাহস জুগিয়েছে। এক মহান আদর্শের প্রাসাদ তৈরী করেছে সে। এমন কাজ যদি সবাই করে, তাহলে তো পৃথিবীতে কারোরই দুঃখ থাকবেনা। সবাই জীবনে উন্নতি করার জন্য পরিশ্রম করবে। এসব ভাবনার পর সনিয়ার মনে হল, সে ভুল করেছে।

সনিয়া অস্থির হয়ে উঠল। তার অন্তরে যেন কারও প্রশ্ন— এসব সম্পত্তি কি আমার? রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে এসব রোজগার করেছি আমিই। আমার আশ্রয়ে যারা আছে— সবাই আমার। জনকাকা, ভরত সামল, রহিম, কাশী বেজ— সকলেই আমার। সকলের জন্যে আমি চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করব। প্রাণ উৎসর্গ করব। সবাইকে খাইয়ে পরিয়ে আমি বেঁচে থাকব।

সনিয়া নিজের কপালে হাত বুলোয়। ঘরের সামনে পায়চারী করতে থাকে। তার চোখের সামনে ধোবীর সজল চোখের ছবি ভেসে ওঠে। তার কানে যেন ধোবীরই কণ্ঠস্বর— সনিয়া দাদা, তুমি বিয়ে করে ফেল। —কিন্তু সনিয়া তার কথা শোনেনি। আবেগে কিছু বলে ফেলেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। এখন তো ধোবীর কথা তাকে রাখতে হবে। সনিয়া ভাবল, সে বিয়ে করবে— ঘর-সংসার করবে।

কঁই-ই হবে সনিয়ার স্ত্রী।

সনিয়া আজ অবধি তার বাবার বাসনা পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু আজ সে তা করবে। কঁই তার বাবার প্রাণের জন্য নিজস্ব যা কিছু দিয়েছে। কিন্তু তার বাবার ইচ্ছে আজ অবধি সফল হতে পারেনি। এবার দুই পিতার বাসনাই পূর্ণ হবে।

কঁই সনিয়ার ঘরনী হবে— তার সন্তানের মা হবে। পৃথিবীর দৃষ্টিতে যে ছিল কাঙাল কলঙ্কিনী, আজ সে এই ঘরের ঘরনী হবে। সনিয়া মাঝের ঘরে এল। সে দেখতে পেল, কঁই দাঁড়িয়ে আছে, কাকে যেন খুঁজছে। সনিয়া দ্রুত তার কাছে চলে গেল।

—সনিয়াদাদা! এখনো তুমি ঘুমোওনি? কঁই জিজ্ঞেস করল।

সনিয়া তার হাতটা নিল নিজের হাতে। শরীর ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।

জ্বর ছেড়েছে। কঁই বিছানায় বসে বলল— ভয়ের কিছু নেই। এমন জ্বর অনেকবার হয়েছে। কারোর বারান্দায় শুয়ে পড়েছি। জ্বর ছাড়লে আবার উঠে চলে গেছি। কিন্তু বারে বারে জ্বর হওয়া সত্ত্বেও আমি মরিনি। আমায় জল দাও। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

সনিয়া জল খাওয়াল। কঁই জিজ্ঞেস করল— দু-দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। কিছু রাঁধতে পারিনি। তোমরা কি খাবে?

সনিয়া বলল— রহিম ভাত রেঁধেছে। জনকাকা সাহায্য করেছে। কিন্তু তুমি কেন এসব ভাবছ? শুয়ে পড়। সকালে তুমি একদম ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি না ঘুমিয়ে আমার পাশে বসেছিলে?

সনিয়া কোন উত্তর দিল না। সে একদৃষ্টে কঁইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কঁই আবার বলল— সনিয়া দাদা, তুমিতো জানো আমি পাগলী। জ্বরের মধ্যে হয়ত উল্টো পাল্টা কিছু বকে থাকব…।

সনিয়া তাড়াতাড়ি কঁইয়ের হাত ধরে ফেলে বলল— তোমায় পাগলী করেছে কে? এই সংসার? আচ্ছা কঁই, একটা কথার জবাব দেবে?

উদভ্রান্ত হয়ে কঁই সনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা বলো, আমি তোমার কে হই?

ঈশ্বর জানেন, কঁই কি ভাবল। সে কোনো উত্তর দিল না। সনিয়ার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল।

সনিয়া বলল— জ্বরটা যখন বেড়েছিল তুমি বিড়বিড় করে সবকিছু বলে ফেলেছ, কঁই। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। সমাজ তোমাকে ত্যাগ করেছে, পৃথিবী তোমাকে ঘেন্না করেছে। কিন্তু কেউ তোমার মনের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেনি। তোমার মনে আছে, তোমার বাবার একটা কথা…মনে করো তো…আমার বাবা ঐ কথাই বলেছিলেন। দুজনেই বলেছিলেন যে, তুমি আমাদের বাড়ির বৌ হবে। যেদিন তারা এ-কথা বলেছিলেন, মনে কর, সেদিন থেকেই তুমি এ বাড়ির বৌ হয়েছে। মাঝখানে আমাদের দুজনের জীবনে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

কিন্তু তার জন্যে আমরা দায়ী নয়। তুমি নিজের সংসারেই ফিরে এসেছ কঁই। পাগল হয়ে যে কথা বলেছ, জ্বরের মধ্যে যা বলেছ— আজ আমার কানে আর একবার বল, কঁই। বল···বল···সনিয়া আমার বর।

কঁই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে রহিল সনিয়ার দিকে। স্বপ্ন দেখছে নাতো? সনিয়া দাদা পাগল হয়ে যায়নি তো? এ কথা সত্যি মানুষের পক্ষে যা ভাবা অসম্ভব সনিয়া তা নির্মমভাবে তা বলে দেয়। কিন্তু মনের গোপন ইচ্ছা কথার মধ্যেই তো প্রকাশ পায়। আজ সনিয়া যা বলছে, সনিয়ার মনে কি এই ইচ্ছাই ছিল? খুবই অস্থির হয়ে পড়ল কঁই। জনকাকা, রহিম, কাশী বেজ আর ভরতের মত সেও সনিয়ার আশ্রয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু আজ একি শুনছে? ও এই ঘরের ঘরনী হবে? একি অসম্ভব নয়? কঁই সনিয়ার স্ত্রী— এ কেউ বিশ্বাস করবে?

সনিয়া আবার জিজ্ঞেস করল— আরে, চুপ করে আছো কেন? আমি তোমার মুখ থেকেই জবাব চাই। তুমি আমার মনের কথা হয়ত বুঝতে পারছ না, কঁই! আমি জাত, ধর্ম, সমাজ— এ সবের বন্ধন মানি না। কিন্তু জীবনের বন্ধন, নারী-পুরুষের মিলন আর দুজনের সম্মিলিত চেষ্টা যে জীবনের পক্ষে জরুরী— এ আমি মানি। এইজন্যই কাঙালদের দল থেকে সনিয়া পরিভা ফিরে এসেছে, মৃত্যু থেকে বেঁচে পালিয়েছে। শোনো, কঁই! আজ রাতের নিভৃতে তোমার সামনে আমি সব কিছু বলতে চাই। সনিয়া তার বিগত জীবনের সমস্ত কথা শোনাল।

কঁইয়ের সঙ্গে সনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে ব্রাহ্মণকে না মন্ত্র পাঠ করতে হল, না যজ্ঞ করতে হল। বিয়েতে কেউ রেজিসটর হয়নি, কোন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয়নি। এ ব্যাপারে নতুন কাপড় বা ফুল-চন্দনের দরকারও হলনা। না হয়েছে আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ, না কোন প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা।

প্রতিদিনের মত বিয়ের দিন এসেছে। আর কেটে গেছে। সনিয়া আর কঁই দুজনেই আকাল পীড়িত। নতুন বাসনা নিয়ে দুজনে

পরস্পরকে পবিত্র মনে ভালবেসেছে। একের আত্মা অন্যজনকে জীবন-সঙ্গী রূপে বেছে নিয়েছে। চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে পরস্পরের মিলন হয়েছে।

সনিয়া আর কঁই ও-ঘরে গেল। ও-ঘরে জনকাকা, রহিম, ভরত আর কাশী বসেছিল। জনকাকা সকলের জীবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলছিল। সনিয়া আর কঁই জানাল তাদের মনের কথা। দুজনে জনকাকার পা স্পর্শ করল। কাকা— অত্যন্ত আদরে দুজনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল— তোমরা দুজনই আমার সন্তান। তোমাদের প্রেম অটুট থাকুক। তোমরা দীর্ঘজীবি হও, সন্তানে সম্পদে সুখী হও, জীবনে সফল হও···। দুজনে উঠে কাশী বেজ আর ভরত সামলকে প্রণাম করল। ওরাও অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে আশীর্বাদ জানাল।

রহিম উঠে দাঁড়াল। তারপর সে সনিয়া আর কঁইয়ের পা স্পর্শ করল। সনিয়া তার এক হাত ধরে আদরের সঙ্গে বলল— না, না, ও আমার ভাই, তোমার নয়।

রহিম হেসে ফেলে। কোন উত্তর দেবার আগেই বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। কে? সকলের নজর পড়ল দরজার ওপর। আরে পুনী! বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পুনী এসেছে। তার পেছনে মধু ভোই।

পুনীর কাছ থেকে ধোবী সর্বকিছু শুনল। সে বলল— তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, পুনী? ও পাগল। ওর সঙ্গে পৃথিবী তো পাগল হয়ে যাবে না? তুই সোজা এখানে এসে ভালোই করেছিস। আমরা সনিয়া দাদার ভালো চাই। কিন্তু ও যদি অন্য পথে চলে, তো আমরা কি করতে পারি?

সন্ধ্যে হতে চলেছে। পুনী একদৃষ্টে ধোবীকে দেখছে আর ভাবছে। ও দুঃখ পেয়েছে। ও বলল— আমি খুব আশা করেছিলাম যে···কিন্তু, একি হ'ল ধোবী দিদি?

—কিসের আশা?— ধোবী একটু হেসে বলে— আমার আশা? সত্যি বলছি পুনী, আমার সব আশা ভেঙে গিয়েছে। একটা খড় যেমন

জলে ভেসে যায়, আমার আশাও ভেসে গেছে। এখনও ভেসে চলেছে। এতে আমার দুঃখ নেই। আনন্দও নেই।

ধোবী তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে পা বাড়াল। রাধামাধবের মূর্তির পায়ে মাথা রেখে, চোখের জল ফেলে প্রার্থনা করল— হে ভগবান! আমাকেও তোমার মত বোবা আর নিষ্ঠুর করে দাও!

চিন্তেই স্বাঁইয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিতেরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। শুধু রাম প্রহরাজ আর গোবিন্দ প্রধান রয়ে গেছেন চিন্তেই স্বাঁইয়ের অনুরোধে।

দিন-দুপুরে সবাই বসে আছে। চিন্তেই স্বাঁইকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মনের কথা গোপন থাকেনি। সনিয়াই তার দুশ্চিন্তার কারণ। ছোট মুখে বড় কথা। সনিয়া কাউকে গ্রাহ্য করেনি। চিন্তেইয়ের স্ত্রীর শেষ ইচ্ছেটুকুও পূর্ণ করতে সনিয়া সাহায্য করল না। তাকে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান হয়েছিল। কিন্তু ও আসেনি। নাপিতের কাছে চিন্তেই স্বাঁইয়ের সম্পর্কে অপমানজনক কথাও বলেছে। চিন্তেইয়ের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সনিয়ার বাবাও একদিন এমনি করেছিল। চিন্তেই স্বাঁই আর কত সহ্য করবেন। আত্মীয়েরা হাসছে। গাঁয়ের লোকে তো অস্থির। প্রহরাজ একটু নস্যি নিয়ে বললেন— আপনি এর জন্যে এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন? গাঁয়ের লোকে আপনার আদেশ পাবার আগেই তাদের কর্তব্য পালন করে ফেলেছে। সনিয়াকে সমাজ থেকে ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখি ও কি ভাবে বেঁচে থাকে!

হরি মহান্তি বললেন— বিষ্ণুপুর তো একটাই গাঁ নয়— আরো অনেক গাঁ আছে। কিন্তু কোন গাঁয়ের লোক এসে সনিয়ার কাজ করে দেবে? ওকে বলা হয়েছে, ভাই, এ গাঁয়ে যদি থাকতে হয়, তাহলে অন্যেরা যে ভাবে আছে, তুমিও থাকো। তা না হলে নিজের পথ দেখ।

স্বাঁই বললেন— একটা লোকের জন্য সারা গাঁয়ের লোকের এত ভাবার কি আছে? ও যে ভাবে থাকতে চায়, থাকুক। এতে আমাদের কি? পৃথিবীতে আরো অনেক বিপথগামী আছে, তাদের মধ্যে সেও

একজন, ব্যস! আমাদের চুপ করে থাকাই ভালো।

গোবিন্দ প্রধান বিরক্ত হয়ে বললেন— শুধু সনিয়াই কি মানুষের বাচ্চা, আর সবাই জানোয়ার? জমিদার ছোট রায় সাহেবকে ও অপমান করেছে, চিন্তেই স্বাঁইকেও অপমান করেছে। তারপরে ও এ গাঁয়ে মেজাজে রয়েছে। মধু ভোই যা বলল, শুনেছেন তো?

প্রহরাজ বললেন— গাঁয়ের লোকে যদি একজোট হয়, তাহলে একটা লোক কি করতে পারে? চারটে বলদ আছে ওর। দু-চার বার যদি ও গুলোকে খোঁয়াড়ে পাঠান যায়, বাগানের বেড়াটা যদি দু-চার জায়গায় ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে সোজা রাস্তায় এসে যাবে।

কিন্তু হরি মহান্তি এই কাজের সমর্থন করলেন না। বললেন— এতো খুব ছোট কাজ, প্রহরাজ মশাই। যদি ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়, তবে ভালোভাবে করা উচিত।

সবাই হরি মহান্তির দিকে তাকিয়ে রইল। মহান্তি একটু হেসে বললেন— ওর বাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায়। অন্য বাড়িগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তাই ভালো সময় দেখে ওর বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া এর থেকে ভালো। তারপর লঙ্গরখানা থেকে আসা লোকগুলো যারা ওখানে রয়েছে, বেরিয়ে আসবে।

নিধি স্বাঁই শিউরে উঠে বললেন— একি বলছেন আপনি? এত বড় অন্যায় কে করবেন? উপরে ভগবান আছেন। তিনি সব দেখছেন।

গোবিন্দ প্রধান কপালে হাত বুলিয়ে বললেন— একটা মশা মারতে কি কামান দাগতে হবে? আমার হিসেবে এটা ঠিক নয়। এমন কাজ করা উচিত, যাতে সনিয়ার দম্ভ ভাঙে আর স্বাঁই মশাইয়ের সম্মানও বাড়ে।

—কি করতে হবে? সবাইকার নজর প্রধানের দিকে।

প্রধান বললেন— আমার হিসেবে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত। তাতে সবাইকার মঙ্গল।

চিন্তেই স্বাঁই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— আমিও তাই চাই।

নিধিও এ-ব্যাপারে সায় দিয়ে বললেন— সনিয়া আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেলে, যারা ওকে উস্কিয়ে ভুল রাস্তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা সবাই পালাবে।

গোবিন্দ প্রধান আবার বললেন— আপনি যা চান সব হবে। কিন্তু তার জন্যে সময়ের দরকার, টাকার দরকার।

—টাকার দরকার?— চিন্তেই স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, টাকার দরকার আছে। জমিদার ছোট রায় সাহেব সনিয়াকে ফাঁদে ফেলেছেন। তিনি মহান মানুষ। আপনি যদি ওঁকে রাজী করাতে পারেন, তাহলে শুধু 'সেলামী'-তেই কাজ হয়ে যাবে।

—সেলামী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেলামী।— প্রধান বললেন— ব্যাপারটা এই যে, আপনি সেলামীর রূপ দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দিন। তারপর সনিয়ার বাড়ি, বাগান-টাগান— সব আপনার হয়ে যাবে। বাজেটে তো এই সম্পত্তির দাম দু-হাজার টাকার কম নয়। আপনি যদি মাত্র এক-হাজার দেন, তাহলে আমি সবকিছু ঠিক করে ফেলব।

—কিন্তু দখল কি করে হবে?

—আরে, সনিয়া কি বাড়িতে আছে না কি? ও তো কবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। খাজনা বকেয়া পড়েছে। কাছারীতে নালিশ ঠোকা সম্পত্তি নীলাম করা আর দখল নেওয়া— এসব হয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে জমিদারের টাকা পাওয়াটা দরকার।

—আপনার কথা বুঝতে পারছি না, প্রধান মশাই।— চিন্তেই বললেন।

প্রধান হেসে ফেললেন— বললেন— আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি সবকিছু বুঝিয়ে দেব।

প্রধান সবাইকার দিকে তাকালেন মহান্তি, প্রহরাজ, নিধি— এঁরা সবাই বুঝে নিলেন যে, কথাটা একটু গোপনীয়। ধীরে ধীরে সবাই বেরিয়ে চলে গেলেন। প্রধান তার মনের কথা জানালেন।

চিন্তেই সব শুনে বললেন— এতো খুব ভালো কথা। চলুন,

আমিও আপনার সঙ্গে জমিদারের কাছে যাব। পয়সা খরচ করাটা কোন বড় কথা নয়। বড় কথাটা হ'ল এই যে, সনিয়াকে কব্জা করে ফেলা। আমি ওকে মুঠোর মধ্যে আনবো। প্রধান মশাই, শুধু আপনার সাহায্যের দরকার।

গোবিন্দ প্রধানের সঙ্গে চিন্তেই স্বাঁই-ও নিমপুরের জমিদারের কাছে গেলেন। ওখানে তাকে দু-দিন থাকতে হ'ল। ছোটরায় এক হাজার টাকা নিলেন। প্রধানও শ'-দুই টাকা পানটান খাবার খরচ হিসেবে নিলেন। তারপর প্রধান আর স্বাঁই দুজনে জাজপুরের সাব-ডিভিশন কাছারীতে গেলেন।

খাজনা সময়ে না দেওয়ার আর বকেয়া রাখার অপরাধে সনিয়ার বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রী পেলেন প্রধান। কাছারীতে হাজিরা দেবার জন্য সনিয়ার নামে যত সমন পাঠান হয়েছিল, সব সে পেয়েছে। সমন পাবার সাক্ষী-ও আছে। জমিদারের নিজের কিছু লোক সাক্ষী হিসেবে সই করেছে। এ'হল গোবিন্দ প্রধানের ষড়যন্ত্রের ফল।

ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহের কোন কারণ রইল না। পেশকার তো গোবিন্দ প্রধানের নিজের লোক। দুজনের খুবই ভালবাসা। দুই ব্যক্তিই তুলসী-মালা পরেন আর 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়েন। তাছাড়া জাজপুরে যখন অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়, গোবিন্দ প্রধান আর পেশকার দুজনে তাতে অংশ নিয়ে হাত তুলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' করেন।

এক-তরফা ডিক্রীর মতন এক-তরফা নীলামের কাগজপত্র বেরুল। কোর্টবাবু জানতেন যে, লঙ্গরখানা থেকে ফিরে সনিয়া কিছু জমি কিনেছিল। এখন সে তার বাড়ি ও জমি ফেলে কোথাও পালিয়েছে। প্রজা পালিয়ে গেলে জমিদার তার সম্পত্তি নিয়েই নেন। কিন্তু কোর্টের মাধ্যমে এই কাজ করা হ'ল যাতে কেউ এর বিরুদ্ধে বলতে না পারে।

সনিয়ার জমি যখন নীলাম হল, তখন চিন্তেই স্বাঁই ভগবান

গোপীনাথজীর তরফ থেকে সামান্য টাকায় তা কিনে নিলেন। এখন জমি দখল করা। এই ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করে চিন্তেই স্বাঁই দুর্গাপুরে ফিরে এলেন। সনিয়ার জমি কেনার কথা এখনো পর্যন্ত তিনি ফাঁস করেননি, নিধিকেও কিছু বলেননি।

দুর্গাপুরে চিন্তেই স্বাঁইয়ের যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে। হরি মহান্তি জমি-সম্পত্তি দেখাশোনা ভালোই করছেন। তাঁর ভাগ্নেও এখন লেখাতে-পড়াতে হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। সে হরিমহান্তিকে ভালোই সাহায্য করছে। চিন্তেই ভাবলেন এখন বিষ্ণুপুরে ফিরে যাওয়া উচিত। তিনি তার সিদ্ধান্ত সবাইকে জানিয়ে দিলেন। সবাই তাতে রাজী হল। কিন্তু ধোবী সায় দিল না।

ধোবী সব সময় দেবতার সামনে বসে থাকে। পূজোর সময় পূজো আর বাকী সময় পুরাণ ইত্যাদি পড়ে সময় কাটায়। মন্দিরে যারা আসে, তাদের প্রসাদ দেয় আর দিনে দু-বার কিছু খায়। একাদশী, সোমবার ইত্যাদি অনেক ব্রত পালন করে, নির্জলা উপবাস করে। কারোর সঙ্গে বেশী কথাবার্তাও বলেনা। অনেক কাজের দায়িত্ব কাকীমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ও একলা বসে থাকে।

আবার কি হ'ল ধোবীর? তার জীবনের এই পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কারোর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। জাজপুর থেকে ফেরবার পর চিন্তেই স্বাঁই ধোবীকে বিষ্ণুপুর ফিরতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ধোবী বলেছে— না, এ আমার কর্মভূমি। আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী এখানেই বেঁচেছিলেন, এখানেই মারা গেছেন। আমার মা-ও এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আমি কি করে এই পবিত্র মাটিকে ছেড়ে যাই? আপনি এখানে থাকুন বাবা! কাকাতো দুর্গাপুরে আছেন। কাকীমা বাচ্চাদের নিয়ে ওখানে চলে যান। কিন্তু আমি যেতে পারবনা।

চিন্তেই স্বাঁই অনেক করে বুঝিয়ে বললেন— মেয়ের বাড়িতে বাবার থাকাটা উচিত নয়, মা! আমার বয়সও বাড়ছে। ভগবান গোপীনাথজীর জন্যে আমি কিছু করতে পারিনি। মন্দিরের দেয়াল

ফেটে গেছে। তুই আমার সঙ্গে চল্। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের উদ্দেশ্য কিছু অন্য। তিনি চিন্তা করছিলেন যে, গাঁয়ের লোকের সাহায্যে সনিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। লঙ্গরখানা থেকে আসা বাউণ্ডুলেগুলো পালিয়ে যাবে। কই পাগলীকেও মেরে তাড়ান হবে। তারপর সনিয়া কোথায় থাকবে? শেষটায় তার পাগলামী ঘুচে যাবে। ও আবার জাতে ফিরবে। সমাজে ভালোমানুষের মত থাকবে। তারপর ধোবীর বিয়ে ওর সঙ্গে দিয়ে তিনি স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবেন। তিনি আরোও ভেবেছেন যে, বিয়ের পর অর্দ্ধেক সম্পত্তি সনিয়ার নামে লিখে দেবেন আর নিশ্চিন্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবেন।

ধোবী বিষ্ণুপুরে না গেলে চিন্তেই স্বাঁইয়ের সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে। অভিমানের বশে সে ভুল করেছে। এর ফলে তার কষ্ট হচ্ছে। এ-কথা ভেবে চিন্তেই স্বাঁই আবার বললেন— ওরে মা, তুই যদি আমার কাছে না থাকিস, তাহলে আমি বাঁচবো না। এই সংসারে তুই ছাড়া আমার আর আপন কে আছে? আচ্ছা, তুই যদি চাস, তাহলে আরো কয়েকটা দিন এখানে থেকে যা। তোর কাকীমাও থাকুক। আমি বিষ্ণুপুরে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে তোদের নিয়ে যাব।

চিন্তেই স্বাঁই বিষ্ণুপুরে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর কোর্টের একজন চাপরাসী বিষ্ণুপুরে এল। গোবিন্দ প্রধানও তার সঙ্গে এলেন। গাঁয়ে ঢ্যাঁড়া পেটা হল। গাঁয়ের লোক ঢ্যাঁড়ার শব্দ শুনল, কিন্তু তার পেছনের ব্যাপারটা জানতে পারলেন না। গোবিন্দ প্রধানের ষড়যন্ত্রে সনিয়ার বাড়ি, জমি— সমস্ত সম্পত্তি চিন্তেই স্বাঁইয়ের দখলে এসে গেল। গাঁয়ের বিশিষ্ট জনেরা দখল নামায় সই করলেন। বাড়িতে থাকলেও সনিয়াকে ফেরার ঘোষণা করা হল।

চিন্তেই স্বাঁই স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রহরাজকে বললেন— এবার কি হবে, প্রহরাজমশাই?

প্রহরাজ একটু নস্যি নিয়ে টিকি দুলিয়ে বললেন— ভগবান

গোপীনাথজীর জয় হোক। তাঁর কৃপায় সব কাজ তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এবার আপনার ইশারা পেলেই গাঁয়ের লোকে সনিয়াকে গাঁ থেকে বের করে দেবে। বাকী আছে তার :কাছের লোকজন। ওরা তো মশামাছি।

চিন্তেই স্বাঁই কোন উত্তর দিলেন না। প্রহরাজ আবার বললেন— প্রতিদিন রাতে গোপীনাথজী স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমায় বলেন— ওরে! আমার মন্দির তো ভগ্নপ্রায়। তুই করছিস কি? ঠিক করে ভোগও দিচ্ছিস না। আমি না খেয়ে কতদিন থাকব? স্বাঁই আমাকে অবহেলা করছে। আমার থাকার বাড়িও নেই, ভরাপেট খাবার নেই। আমার কাপড়ও জোটে না।

স্বাঁই মাথা নেড়ে বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ সবঠিক হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা, প্রহরাজমশাই, বলুন তো, সনিয়া যদি ওই বদমাশগুলোকে ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহলে আবার জাতে উঠবে তো?

এই প্রশ্ন শুনে প্রহরাজ ঘাবড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তিনি কিছু বুঝতে না পেরে একদৃষ্টে স্বাঁইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— উদ্বিগ্ন হবার কোনো দরকার নেই, প্রহরাজ মশাই! গোপীনাথজীর সম্পত্তি থাকবে। আপনাকে তার ট্রাষ্টি করে দেওয়া হবে। আমি নিজে গিয়ে আপনার নামে সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী করিয়ে দেব। সনিয়া এই গাঁয়ের ছেলে। যদি ও ভালো হয়ে জাতে ফিরতে চায়, তাহলে আমি ওকে জমি দেব, বাড়ি করে দেব, বিয়েও দেব। ও সুখেশান্তিতে থাকুক— এই-তো আমি চাই···।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের মনে কি আছে, প্রহরাজমশাই বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন— শাস্ত্র ঘাঁটলে এর কোনো উপায় তো পাওয়াই যাবে। কিন্তু একজন বিধর্মী, বিপথগামী, পাগলের জন্য দরকার কি এমন করার?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— পরে বলব, কি দরকার? আপনি উপায়টা দেখুন তো। হ্যাঁ, মন্দির মেরামত করার জন্য ভালো কারিগর ডাকুন।

জিনিসপত্রও জোগাড় করুন। সব খরচ আমি দেব, যান···।

প্রহরাজ আশীর্বাদ করে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন।

একটা শুভদিন দেখে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে গাঁয়ের লোকে এই কাজে যোগ দিয়েছে। প্রহরাজই কাজের ছক তৈরী করেছেন। স্বাঁই দেদার ভাবে টাকা দিয়েছেন। কটক থেকে ভালো মিস্ত্রী আর কারিগর আনা হয়েছে। দিন-রাত কাজ হচ্ছে। এই খবর পেয়ে ধোবীও দুর্গাপুর থেকে বিষ্ণুপুরে এসেছে। গোপীনাথজীর মন্দির তৈরী হচ্ছে। না দেখে সে কেমন করে থাকে? বাবা-মেয়ের পরামর্শে কাজ হচ্ছে।

চিন্তেই স্বাঁই তাঁর সম্পত্তির দায়িত্ব ছোটভাই নিধির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। নিধি দুর্গাপুর আর বিষ্ণুপুর— দুজায়গার সম্পত্তিই দেখা-শোনা করছেন। চিন্তেই স্বাঁই নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের কাজ করাচ্ছেন। নিধির স্ত্রী মাসের অর্দ্ধেক দিন বিষ্ণুপুরে আর বাকী অর্দ্ধেক দুর্গাপুরে থাকেন। দুই বাড়িতে তিনিই গিন্নী। দুর্গাপুরের সম্পত্তিতে নজর রাখা বিশেষ দরকার। ধোবী বিষ্ণুপুরে থাকলে কাকীমা দুর্গাপুরে। চিন্তেই স্বাঁইয়ের সেবার জন্য দু জনের কেউ-না-কেউ থাকে। ধোবী এখন বিষ্ণুপুরে।

আজ প্রথম অষ্টমী। প্রত্যেক বছর উড়িষ্যায় কার্তিক পূর্ণিমার সাতদিন পরে এই পার্বন ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। বাড়ির বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জন্য এই পার্বন অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। সব বাড়িতে পাটিসাপটা হয়েছে। বাচ্চাদের নতুন জামা কাপড় কেনা হয়েছে। কিন্তু সনিয়ার বাড়িতে আজ আনন্দের কোন চিহ্ন নেই। ভরত সামল আর কাশী বেজকে ঘরের কিছু কাজে রেখে, বাকী সবাই ক্ষেতের কাজে গেছে।

গেরস্তালীর কাজ সেরে ভরত আর কাশী বেজ ভজন গাইছে। জন আর রহিম গোয়াল পরিষ্কার করতে গিয়েছিল। জন ক্লান্তিতে

ভরতের পাশে বসে পড়ে বলে— সনিয়া আর কঁই ঘাম ফেলে খেটে যাচ্ছে। কারোর কথাই শুনছেনা। এভাবে হাড়ভাঙ্গা খাটতে খাটতে কোনদিন হয়ত অসুখে পড়ে যাবে। গান বন্ধ করে ভরত বলল— ভাই, এখনই তো ওদের কাজ করার সময়। এখন না করলে কবে করবে ?

ঢুপুরের পর। সেবা বেহেরা সনিয়ার বাড়িতে এল। বাড়ির একটু দূরে কাটা-ধানের ছোট ছোট ঢুটো ডাঁই। এখন অবধি ফসল ঝাড়াই হয়নি। সেবা বেহেরা ওখানেই গেল। আশ্চর্যের কথা! গাঁয়ের লোকে সনিয়াকে জাত থেকে বের করে দিয়েছে। তার বাড়িতে কেউ আসেনা। লোকে বলে, সনিয়ার বাড়িতে গেলে দেহ অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু সেবা বেহেরা আজ কি করে এল ? সবাই উদ্বিগ্ন হল।

—সনিয়া কোথায় ? —সেবা জিজ্ঞেস করল।

—ক্ষেতে গেছে। —রহিম উত্তর দেয়।

সেবা বলল— চিন্তেই স্বাঁই বলেছেন যে, যে ভাবেই হোক আজ যেন সনিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এই খবরটা দিতেই আমি এসেছি। জরুরী কাজ আছে। ওকে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিন।

সেবা ফিরে গেল।

ঠিক সেই সময়ে সনিয়া আর কঁই ক্ষেত থেকে ফিরেছে। পুকুরে হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করছে। পুকুরের ওপারে সবুজ বাগান। তার পাশেই একটা রাস্তা— মহাদেবের মন্দিরের দিকে গেছে। পুকুরের এপারে সোনালী ধানের ক্ষেত, ওপাশে সবুজ বাগান। চার বছর আগে যে ক্ষেত বন্ধ্যা ছিল, আজ সে পাকা ধানে যেন সোনার থালা হয়ে উঠেছে। গাঁয়ের কেউ কেউ এতে খুবই উদ্বিগ্ন, আবার অনেকে জ্বলেও মরছে।

সনিয়া তার সাফল্যে শিউরে ওঠে। এত বড় সম্পত্তি তৈরী করতে কে উৎসাহ দিয়েছে ? কে টাকা দিয়েছে ? যে এত বিষয় সম্পদ দিয়েছে আর যার প্রেরণায় কঁই-এর হাত ধরে সে সংসারী হয়েছে— সে হ'ল ধোবী। ধোবী বিষ্ণুপুরে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করার

ইচ্ছে তো অনেক। কিন্তু মনের গভীর প্রদেশ থেকে কে যেন বলছে— না, না, না! তার সন্তানের মা হতে চলেছে যে কঁই, সেও যেন তাকে বাধা দিচ্ছে। ধোবীর সঙ্গে দেখা করার কথা কঁইয়ের কাছে বলতে সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু কঁই নিশ্চিন্ত। সনিয়ার ভালবাসা সে পেয়েছে। তার ঘরনী হয়েছে সে। তাছাড়া সনিয়ার সন্তান তার গর্ভে। এখন আর কি ভাবার আছে? বিগত দিনগুলো ভুলে সে নতুন জীবন শুরু করেছে। সংসার তাকে না পুঁছলেও তার কোন ব্যাপার নেই। সংসারকে সে গ্রাহ্য করবে কেন?

কঁই বলল— অনেক বেলা হল। চলো বাড়ি চলো। বাড়িতে সবাই না খেয়ে হয়ত আমাদের পথ চেয়ে আছে।

কঁই সনিয়ার হাত ধরল। চমকে ওঠে সনিয়া একদৃষ্টে কঁইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ডাগর-ডাগর চোখ, ভরন্ত গাল দেখে ক্ষণেকের জন্যে সনিয়া মোহিত হয়ে গেল। একি সেই কঁই— যে সেদিন পাগলীর মত বকবক করছিল? কি ছিল সে, আর কি হয়ে গেছে এখন। কত সুন্দরী সে। বিনা খাওয়া-পরায় সে এক প্রেতিনীর মত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ? কত বদলে গেছে কঁই।

—আরে, কি এত দেখছো? —জিজ্ঞেস করে কঁই।

সনিয়া হেসে বলে— একান্তে তোমাকে ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করছে, কঁই। আজ যদি আমার বাবা-মা এসে যেতেন, জানো কি বলতেন?

—কি বলতেন?

—বলতেন···তুমি বাড়ির লক্ষ্মী।

—ব্যস্, ব্যস্, চলো, খাবার সময় হয়ে গেছে। মিথ্যে অভিমানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কঁই এগিয়ে যায়। কিন্তু সনিয়া তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে। তার ফর্সা গালে চুমু খেয়ে সনিয়া বলে— আচ্ছা, আচ্ছা, এবার চলো···।

সনিয়ার বুকে মাথা রেখে কঁই এদিক ওদিক দেখে বলে— বেহায়া—

কেউ দেখে ফেলবে···।

কঁইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগে তার নজরে পড়ে একটি মেয়ে। পুকুরের ওপারে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ঝুড়ি। পড়ন্ত সূর্যের আলো তার মুখে পড়েছে। তাকে দেখেই সনিয়াকে কঁই একটু দূরে ঠেলে দিল। বলল— ওদিকে দেখছ না, ও দাঁড়িয়ে আছে। সনিয়াও ওপারের দিকে তাকাল। —আরে! ধোবী!

কঁই আবার তাকায়। ধোবী চলে যাচ্ছে। ঘুরেও দেখছে না। ধোবীর সামনে সামনে আর একটি মেয়েও চলেছে।

কঁই জিজ্ঞেস করল— ও কে, ধোবীদিদি?— সনিয়া কোন উত্তর দিল না। বোধহয় দিতে পারল না। বুকে যেন কিছু কষ্ট অনুভব করল। থেমে থেমে বলল— হ্যাঁ, ধোবী।

কঁইয়ের চোখে জল এল। বলল— তুমি বাড়ি যাও। আমি আমার ধোবীদিদিকে একটু ভালো করে দেখে আসি। বাচ্চার মত সে ধোবীর পেছনে পেছন ছুটল। সনিয়া কিছু বলতে পারল না।

সন্ধ্যের আগেই কঁই সনিয়ার কাছে ফিরে এল। পুকুরের ধারে একটা গাছের নীচে সনিয়া অপেক্ষা করছিল। কঁইয়ের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাই দেখে সনিয়া ভাবল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কিন্তু মনের কথা সে প্রকাশ করল না। বলল— খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ-হয়। চলো, এবার বাড়ি যাই।

কঁই কোন উত্তর দিল না। অনেক কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিছুই বলে না। সনিয়ার পেছনে পেছনে সে-ও খানিকটা এল। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। সনিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তার দু-হাত ধরে কঁই বলল— একটা কথা বলব?

—কি?

—ধোবীদিদি আমাকে চিনেও চিনতে পারল না। আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু ও তার কোন উত্তর দিল না। ওর কাছে যেতেই মুখ বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— আমাকে ছুঁস না, একটু

তফাত থেকে কথা বল্।

—তারপর?

—তারপর আর কি? কিছুই নয়।

কঁইয়ের চোখে অশ্রুধারা বইতে লাগল। সে বলল— আমার খেয়াল ছিল না, ধোবীদিদি মহাদেবের মন্দিরে যাচ্ছে। অন্য মেয়েটা হ'ল প্রহরাজের নাতনী। চেঁচিয়ে উঠে সে বলল— আরে! কঁই পাগলী হয়ত মন্দিরের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়বে। —শিগগির ওকে তাড়াও।

ধোবীদিদি আমার দিকে তাকালও না।

সনিয়া কঁইয়ের চোখের জল মুছে দেয়। তার হাত ধরে বলে— তুমি আমার সঙ্গে চল। ওদের কথায় তোমার কি? পৃথিবীতে তোমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। লোকের কথাতেই কি এখন হার মানবে? ওদের বলতে দাও। ওদের কথায় খারাপ ভাবার কোনো দরকার নেই। আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে পালিয়েছি। অনেক কেঁদেছি। এখন হাসিমুখেই এগিয়ে যাব। আবার তো যেখান থেকে ফিরে এসেছি, সেই শ্মশানেই যেতে হবে। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে যাব কেন? হাসতে হাসতেই যাব।

কঁই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সনিয়া আবার বলে। আরে! থেমে গেলে কেন? এসো আমার পেছন পেছন। যারা গর্ব, অভিমান, দাপট নিয়ে আছে, তাদের থেকে আমরা দূরে থাকব— অনেক দূরে। ওরা যদি আমাদের ঘৃণা করে, করতে দাও। আমরা ওদের ঘৃণা করব না।

কঁই কোন উত্তর দিল না। সনিয়ার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

সন্ধ্যে বেলায় রহিম জানাল— সনিয়াদাদা! স্বাঁইমশাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

যাবে কি যাবে না, সনিয়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। অনেক চিন্তা করার পর ও ঠিক করল, যাবে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

শিব ঠাকুরের মন্দির থেকে ফিরে ধোবী তার পুজোর ঘরে এল। সে যা দেখেছে, তা ভুল হতে পারে না। ঘৃণায় সে কঁইকে কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তার মনের গহীনে এ-কথা তাকে বারবার যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধোবী চৌকির ওপর রাখে। ভগবানের কাছে সে ক্ষমা চায়— আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি — আমাকে ক্ষমা করে দাও, ভগবান! সনিয়াদাদা সুখে থাকুক। কঁইকে নিয়ে সে ঘর-সংসার করুক। হে ভগবান! আমি রাগের বশে কিছু বলে ফেলেছি। সনিয়াদাদার প্রতি ভালবাসার যে ক্ষীণ আলো আমার মনে জ্বলছে, তা নিবিয়ে দাও, ভগবান! আমার ভালবাসা, মমতা— সব-কিছু শেষ করে দাও, ভগবান!

ধোবী ভাবল— কঁই কোনই অনিষ্ট করেনি। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও ছুটে এসেছিল, অনেক উৎসাহ নিয়ে। যে স্বামী তার সব-কিছু লুটে নিয়ে তাকে পাগল অনাথ করে রাস্তার ধারে ফেলে চলে গিয়েছিল, যার সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেও বাঁচাতে পারেনি— সেই স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছে। ও সুখী হোক প্রভু!

ধোবী ভগবানের কাছে মাথা খোঁড়ে। ভাবে সনিয়াদাদাকে পাবার জন্যে আমার মনে যে কামনা ছিল, তার জন্যে কঁই দায়ী নয়। কঁই সনিয়াকে ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসে। স্বামী রূপে তাকে গ্রহণ করেছে। এতো আমি আগেই জানতাম, তবুও আমি সনিয়াদাদার ওপর আকৃষ্ট হয়েছি। তাকে আমিও ভালবেসেছি। এ আমারই ভুল ছিল। এখন আমি ছাড়া কে আর দুঃখ সহ্য করবে?

ধোবী ভাবল— সনিয়াদাদা আমাকে ঠকিয়েছে। আমার কাছে সব লুকিয়ে গেছে। কিন্তু ভগবান, তুমি মহৎ। কোনো কথা গোপন নেই। তুমি সনিয়াদাদাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে এসো। ও আবার কঁইকে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু আমি ভুল করেছি। কঁইয়ের ওপর কঠোর হয়ে আমি অত্যন্ত ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্রভু!

ধোবীর চোখে বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। বারেবারে সে বলে উঠেছে— সনিয়াদাদা ঠিক কাজই করেছে। সে বিধর্মী হয়ে গেছে। জাত থেকে ভিন্ন হয়ে একজন অছুঁ্যতের মত বেঁচে আছে। তবুও সে মানুষ হিসেবে বড়। তার হৃদয়টা বড়। তার কর্তব্য সে জানে। সত্যিই সে যা করেছে। ঠিকই করেছে। কিন্তু ভুল করেছি আমি।

ধোবী উঠে আবার বসে পড়ে।

চোখের জল আবার গড়িয়ে পড়ছে। সে আবার হাত জোড় করে। —হে প্রভু! কত চোখের জল দিয়েছ তুমি? নিয়ে নাও! যত চাও নিয়ে নাও। আমাকেও একটা পাথরের মত কঠিন নিষ্প্রাণ করে দাও; প্রভু! আমি স্বীকার করছি, সনিয়াদাদা ঠিক করেছে আর আমিই ভুল করেছি।

ধোবী আবার মাথা খোঁড়ে।

উদ্বেগে রয়েছে সনিয়া। চিন্তেই সাঁই তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করবেন সে ভাবেনি। সেইদিন তেমন দূরে ফেলে আসেনি, যখন চিন্তেই সাঁই তাকে কুকুরের চেয়েও হীন মনে করতেন। কিন্তু আজ তার একি হল? তাকে দেখেই বারান্দা থেকে নেবে এসে বললেন— আরে, সনিয়া বাবাজী! এসো, এসো, ভেতরে এসো।

সনিয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। কি বলবে ভেবেই পেলনা। পাথরের মূর্তির মত চিন্তেই সাঁইয়ের হাত ধরে সে ভেতরে গেল। তিনি তাকে তার শোবার ঘরে পালঙ্কের ওপর বসালেন। দরজা বন্ধ করে সাঁই মশাই আলমারী খুলে কয়েকটা কাগজপত্র বের করলেন। তারপর সনিয়ার কাছে এসে খুব কাছাকাছি বসলেন।

সনিয়া খুব উদ্বিগ্ন হল। সাঁই মশাইয়ের এই ভালবাসার ফল যে কি হবে, সে বুঝতে পারল না। চিন্তেই সাঁই চারদিকে দেখলেন তারপর বললেন— কতদিন তোমার এই পাগলামো থাকবে? হ্যাঁ, রাগ মানুষের হয়। এটা অস্বাভাবিক নয়। আমিও তোমার বাবার ওপর রাগ করেছিলাম। কিন্তু এখন পুরোনো দিনের কথা ভেবে লাভটা কি? সেদিনের কথা ভাবলে শুধু রাগই বাড়বে। সে তো এই

পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আমি কার সঙ্গে লড়াই করব? তুমি যেদিন থেকে এ গাঁয়ে এসেছ, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কালকের ছোকরা তুমি। তবু তোমার দাপট তুমি ছাড়নি। আমিও আমার বড়মানুষি ছাড়িনি। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সে সব কথা ভেবে কি লাভ? আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার মনে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি। আমি আজ ক্ষমা চাইছি, সনিয়া।

চিন্তেই স্বাঁই সনিয়ার হাত ধরেন। তাঁর দাপট আজ সনিয়ার সামনে শেষ হয়ে গেছে। সনিয়ার কাছে তিনি মাথা নীচু করেছেন। নিজের কথা বুঝি তাঁর কানেও পৌঁছোচ্ছেনা। চিন্তেই স্বাঁই হেরে গেছেন। তার চোখই বোধহয় তাঁকে উপহাস করছে।

নিজের মনের দুর্বলতা তিনি বুঝতে পারলেন, কিন্তু কেন এমন হল?

তাঁর স্ত্রীর শেষ আশা ছিল, ধোবীর, বিয়ে সনিয়ার সঙ্গে···। যখন তিনি বেঁচেছিলেন, চিন্তেই স্বাঁই তখন তাঁর সঙ্গে ঠিক করে কথাও বলতেন না। কিন্তু আজ স্ত্রীর স্মৃতি তাকে কষ্ট দিচ্ছে। এছাড়া ধোবীর বিবর্ণ মুখটও তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই দুটি কারণেই চিন্তেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মেয়ের ভালোর জন্যে তিনি কখনো ভাবেননি। সম্পত্তি আর সম্ভ্রম— দুই বৃত্তের মধ্যে তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন। এই কারণে তিনি শপথ নিয়েছেন যে, লোকে মন্দ বললেও তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে ধোবীকে সুখী করবেন।

সনিয়া বলল— আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত কোন কাজ তো আপনি করেননি। আমি কেন ক্ষমা করব? আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমি যদি আপনার কাছে কোন অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমায় ক্ষমা করে দিন। লোকের চোখে আমি অছুঁত পতিত। তবুও আপনি আমায় ডেকেছেন, কাছে বসিয়েছেন। আমার পক্ষে এই অনেক বড়। এবার বলুন, আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন···?

স্বাঁই বললেন— হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি, আমি তোমার পিতৃতুল্য। ছেলে যদি দুষ্টুমি করে, বাবা কি তাকে শাস্তি দেয় না? ছেলে যদি ভুল পথে চলে, বাবা কি তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসে না?

সনিয়া বলল— আমি দ্বিমত করছি না। তবুও বাবা হোক বা ছেলে, প্রত্যেকের বিবেক বুদ্ধি আছে। আমার যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, আমি তাহলে নিশ্চয় আপনার সামনে মাথা নীচু করে মেনে নেব। তাহলে আপনিই বলুন কি আমার অন্যায়?

চিন্তেই স্বাঁই বললেন— তোমার অন্যায় এই যে, তুমি যৌবনের উচ্ছ্বাসে পৃথিবীকে স্বীকার করনি। এই পৃথিবীতে তোমার মত অনেক নির্ভীক তরুণ আছে। তারা ভালো কি মন্দ, বিচার করে না। না ভেবেচিন্তে তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ফলে সেই আগুনেই তারা জ্বলে পুড়ে মরে। কিন্তু সবাইকে বাঁচাতে আমি এগিয়ে যাচ্ছি না। তুমি তো আমাকে ভালোই চেন। তোমার সামনে আমিও কথা লুকোতে চাইনা।

—জানি— সনিয়া বলল।

স্বাঁই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন— যেদিন তোমার বাবা ছেলেপুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যান, সেদিন আমার মনে দুঃখ হয়নি। বরং সেদিন খুসী হয়েছিলাম। কারণ, আমার মনেও প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। যেদিন তুমি কাঙাল হয়ে বিষ্ণুপুরে ফিরে এলে, সেদিনও আমার মনে কোনো মায়া হয়নি। তারপর তুমি অনেকবার আমার বাড়ি এসেছ। কড়া কথা শুনিয়ে তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি। সাথে সাথে তোমার অবস্থা দেখে আমি খুসীই হয়েছি। আজ তুমি জাত-ধর্ম ছেড়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ। তারাও তোমার দিকে ফিরে তাকায় না। এখন তাদের নিয়ে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কত সুন্দর সুযোগ পেয়েছি, তা কি তুমি জান?

—জানি। —সনিয়া বলে।

চিন্তেই স্বাঁই হেসে বললেন— কিন্তু তুমি উল্টোটা বুঝছ। তারও একটা কারণ আছে, সনিয়া। আমি হলাম চিন্তেই স্বাঁই। স্বার্থ ছাড়া

কোন কাজ আমি করিনা। যখন সম্পত্তি করার লক্ষ্য ছিল, তখন আমি মানবিকতার নিয়ম মানিনি। কিন্তু আজ সম্পত্তির লোভ নেই। আমার স্ত্রী মারা যাবার সময়ে তার শেষ ইচ্ছে জানিয়েছিল। সে তোমার নাম ক'রে বলেছিল যে···।

—আমার নাম?

—হ্যাঁ তোমার নাম। তার ইচ্ছে ছিল, তোমার সঙ্গে ধোবীর বিয়ে দিয়ে সে মারা যায়।

সনিয়ার মাথা ঘুরতে লাগল। তার বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে। উদভ্রান্ত হয়ে সে চিন্তেই স্ঁাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। চিন্তেই স্ঁাই বললেন— সে তো চলে গেল। কিন্তু তারপরে আমিও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি। ধোবীর মুখ দেখে বুঝলাম, আমি যা করেছি, সব ভুল। আমি তো মানুষ। মেয়ের জন্যে আমার মনে এখনো ভালবাসা আছে। তুমি যা করছো, আমি তলিয়ে বিচার করলাম। তোমাদের দুজনের মনেই দেখলাম অভিমান রয়েছে। সেই অভিমানেই তোমরা দুজনে আত্মহত্যা করছ। দিনের পর দিন ধোবীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ও বোধহয় বেশীদিন বাঁচবে না। সনিয়া, আমি একজন বাপ। প্রাণ থাকতে কি করে নিজের মেয়ের মৃত্যু দেখি? আজ তাই তোমায় ডেকেছি। আমার দম্ভ, সমস্ত অভিমান আজ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আর··· আর আজ আমি ক্ষমা চাইছি। আমায় ক্ষমা করো, সনিয়া!

উদ্বিগ্ন হয়ে সনিয়া চিন্তেই স্ঁাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না।

চিন্তেই স্ঁাই আবার বললেন— আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। এই নাও আমার দলিল। আমার যা সম্পত্তি আছে, সবই আমি রোজগার করেছি। আর অর্দ্ধেক ভাগের মালিকানা আমার। সেই সম্পত্তি তোমার নামে আমি দলিল করে দিয়েছি।

—আমার নামে?

—হ্যাঁ তোমার নামে। আমি জানি, তুমি আমার কথা মেনে

নেবে।

ধোবী অনেকক্ষণ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রাত বাড়ছে। প্রত্যেকদিন এই সময়ে চিন্তেই স্বাঁই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন। ধোবী নিজের হাতে খাবার বেড়ে দেয়। বুড়ো বাপের সেবা করে। সে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কারো কথা ভাববে না। অকারণ দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। শিমূল তূলো যেমন বাতাসে উড়ে যায়— সে-ও উড়ে যাবে তেমনি সময়ের বাতাসে।

বাবা একটু উঁচু গলায় কথা বলছেন। তাঁর গলা শুনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে একি দেখছে! নিজের চোখকেও যে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বপ্ন দেখছে না তো?

চিন্তেই স্বাঁই বলছেন— কোন কাজ গোলমাল হবে না। তোমার আশ্রিত অনাথেরা কোন অসুবিধেয় পড়বে না। ওদের ঘর তৈরী করে দিও, খানিকটা করে জমিও কিনে দিও। কোন্ জিনিসের অভাব তোমার? শোনো, যা প্রাণ চায় ক'রো। দিনে দুবার দু-মুঠো ঠাকুরের প্রসাদী অন্ন আমার প্রয়োজন। ব্যস! তার বন্দোবস্ত আমি করে নিয়েছি।

ধোবী চিন্তিত হয়ে শোনে।

সনিয়া মাথা তুলে বলে— আপনি হয়ত জানেন যে···

চিন্তেই তাকে কথা শেষ করতে দেন না। বলেন— আমি সব জানি। এই দলিলটা দেখে নাও। গ্রহণ করো। আমি নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকি। তুমি আবার জাতে, সমাজে ফেরো। টাকা-পয়সার কোন চিন্তা ক'রো না। যা খরচ হয়, হোক্। পয়সা খরচ করলে, দেখো, লোকে কি ভাবে মুখ বন্ধ ক'রে থাকে।

চিন্তেই স্বাঁই একটু থেমে আবার বললেন— কি কঁইয়ের কথা ভাবছো? আরে, ও আবার তার বাপ-ঠাকুর্দার জমিতে ফিরে যাবে। ওকে ঘর তৈরী ক'রে দেওয়া হবে। এতে ভাবার কি আছে? আমি জানি, তুমি ছেলে ভালো। তোমার মনে কলঙ্কের দাগ পড়েনি। জানি, দোষী তুমি নও। তোমার হাতে ধোবীকে তুলে দিয়ে আমি

একেবারে নিশ্চিন্ত হব। সুখে শান্তিতে তারপর চোখ বুঁজতে পারব।

সনিয়ার অস্থিরতা বেড়ে যায়। বাইরে ধোবীও অস্থির হচ্ছে। সমস্ত শরীর তার কাঁপছে। একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে অনুভব করে, বাবা এভাবে বলতে থাকলে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তার মন বলছে— না, না, এ অসম্ভব— অসম্ভব। সে যা দেখেছে, জীবনে ভুলতে পারবে না। অর্থ আর সম্ভ্রমের লালসায় সনিয়া হয়ত চিন্তেই স্বাঁইয়ের কথায় মত দেবে। কিন্তু সনিয়া চরিত্রহীন— অকৃতজ্ঞ। এমন মানুষের মনে ধোবীর কোন স্থান হতে পারে না।

—চুপ করে আছ কেন? কথা বলো।

সনিয়ার চোখ জলে ভরে ওঠে। সে বলে— আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার স্নেহ, আপনার দানের আমি যোগ্য নই।

চিন্তেই স্বাঁই চমকে ওঠেন।

ধোবীও চমকে ওঠে। দেয়ালের ওপার থেকে সে সব শুনছে। সে লক্ষ্য করল, চিন্তেই স্বাঁইয়ের হাত থেকে দলিলনামা পড়ে গেল। পালঙ্ক থেকে নেবে তিনি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

সনিয়াও দাঁড়িয়ে আছে। ধোবীর ইচ্ছে হয়, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বাবার হাত ধরে বলে— এ কি করছো তুমি? একটা বিধবা মেয়ের জন্য তোমার সমস্ত আত্ম-সম্মান একজন বিধর্মীর পায়ে লুটিয়ে দিচ্ছো? তোমার রক্ত আমার শরীরেও বইছে। তার কিছু ক্ষমতা আছে। সেই রক্তের জোরেই বলছি, ও একটা চরিত্রহীন কাঙাল! সনিয়া সত্যিই তোমার জামাই হবার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু ধোবীর মুখে কথা এল না। এগোবার চেষ্টা করল, কিন্তু পা এগোল না।

চিন্তেই স্বাঁই মুখ তুলে সনিয়ার দিকে তাকালেন। যেন মনের মধ্যে জ্বলে-ওঠা আগুনে পুড়ে তিনি নিজেই ছাই হয়ে যাবেন। মনে হল, বনেই পরিভার ছেলে সনেই পরিভা তাঁর ওপর কঠোর প্রতিশোধ

নিচ্ছে। তাঁর সমস্ত সম্ভ্রম মাটিতে মিশে গেছে।

তবুও মন মানে না। যদি সনিয়া রাজী হয়ে যায়, এই আশায় তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন— বাবা সনিয়া! তুমি আমার জীবনের শেষ ইচ্ছেটুকু পূর্ণ করবে না? আমি আমার সবকিছু তোমার হাতে সঁপে দেব। আমি প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেয়েছি। এ অবস্থায় তুমি আমায় আরো কষ্ট দেবে? বলো বাবা?

চিন্তেই আবার সনিয়ার হাত ধরলেন।

সনিয়া বলল— আমি আপনার অযোগ্য সন্তান। আমার মনের কথা ঠিক ভাবে বলতে পারছি না। আপনার পায়ে পড়ছি। ক্ষমা আমি চাই না। আমি ক্ষমারও যোগ্য নই। আপনি যা শাস্তি দেবেন আনন্দের সঙ্গে মেনে নেব। কিন্তু আপনার স্নেহ, আপনার দান গ্রহণ করতে পারছি না।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের পায়ে মাথা ঠোকে সনিয়া। ধোবী আর সহ্য করতে পারে না। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত সে দরজা ধাক্কা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

সনিয়া উঠে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ধোবী— তার আত্মা, তার প্রেরণার আধার, তার চোখের অশ্রু।

সনিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। ধোবীর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। ক্ষণিকের জন্যে দুজনের চোখ এক হয়ে যায়। ধোবী দেখে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সনিয়া, যার জন্যে সে বেঁচে আছে, যার জন্যে সে তার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামীর মান-সম্ভ্রম মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সনিয়ার জন্যে তার বাবা মাথা নীচু করেছেন আর সে নিজে জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছে।

বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ধোবী বলে— এ কি করছো, বাবা?

চিন্তেই-ও মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন। মাথায় চুমু খেয়ে বলেন— আমি ভুল করেছি, মা। — তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

শিশুর মত ধোবী তার বাবার বুকে মাথা গুঁজে দেয়। একটা করুণ শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— বাবা!

ধোবীর চুলে হাত বুলিয়ে চিন্তেই বললেন— আমি তোর বুড়ো ছেলে। আমাকে ক্ষমা করে দে, মা। —চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ধোবী।

পরিস্থিতি সনিয়ার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মাথা নীচু ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সামনে ভাসছে কঁইয়ের অশ্রুসজল চোখ। ভেবে দেখে, ধোবীর প্রেমের যোগ্য আর সে নেই। আর কেউ না বুঝুক, ধোবী নিশ্চয় এ কথা বুঝবে।

নিশ্চয় বুঝবে ধোবী— নিশ্চয় বুঝবে।

ধোবী বুঝতে পারল, সে-ই ভুল করেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে এই পৃথিবীতে এসেছে। সবাইকে কাঁদিয়ে, সে নিজেও কেঁদেছে। পৃথিবীতে একা থাকার হাজার চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। রক্ত-মাংসের শরীরে এই পৃথিবীর টান ছেড়ে থাকবে কি ক'রে? এযে অসম্ভব।

ধোবী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে— তোমার পায়ে আমায় স্থান দাও ভগবান। —ওখানেই যে আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী আশ্রয় পেয়েছেন!

দিনের পর দিন ধোবীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। চিন্তেই স্ঁাই খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কবিরাজ বলেছে— শরীরের নয়, এ মনের রোগ। ধোবী অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে। গালের হাড় দেখা যাচ্ছে। হাত পা রোগা হয়ে গেছে। কথা বলতেও তার কষ্ট হয়। সব সময় বিছানায় পড়ে আছে। আর মাঝে মাঝে উঠে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে। কারোর কথার কোনো জবাব দেয় না।

ধোবীর একি হ'ল? চিন্তেই স্ঁাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। আকালের দিনের কথা তাঁর মনে পড়ছে। এক মুঠো ভাতের জন্যে তাঁর বাড়ির চারদিকে লোকে কত কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু চিন্তেই কোনো সাহায্য করেননি। ধোবীর অবস্থা এতই খারাপ যে, তাকে ওই কাঙালদের মত লাগছে। ওদের মধ্যে চিন্তেই স্ঁাইয়ের আপন

বলতে কেউ ছিল না। তিনি কখনো ওদের মায়া-মমতা দেখাননি। বরঞ্চ খিদের জ্বালায় যারা রাস্তার ধারে পড়ে মরেছে, তাদের তিনি ঘৃণার চোখে দেখেছেন। সমস্ত অঞ্চলে লোকে যখন আকালে মারা যাচ্ছে, চিন্তেই স্বাঁই নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। কিন্তু কার জন্যে?

তখন এই প্রশ্ন তাঁর মনে জাগেনি। আজ ধোবীর সুখের জন্যে তিনি সব-কিছু করতে রাজী— সর্বস্ব খরচ করতে রাজী। কিন্তু যাবতীয় সম্পত্তির বিনিময়েও ধোবীর জন্যে আনন্দ [illegible] করা গেল না। তাঁর সমস্ত [illegible], মান-সম্মান মিথ্যে হয়ে গেল। সনিয়াকে ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন। গাঁয়ে ফিরে সে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। মৃত্যুর কবলে ছটফট করেছিল। কিন্তু আজ সে ধনী চিন্তেই স্বাঁইয়ের যাবতীয় সম্পত্তির কোনই পরোয়া করল না।

মা……

ধোবী মাথা তুলে তাকায়। চিন্তেই স্বাঁই তার পাশে বসে আছেন। ধোবীর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন— মা আমার, তোর খারাপ কিছুই হয়নি রে! সবাই বলছে, তোর কোন অসুখ করেনি। কি ভাবছিস্ তুই? বলবি না? আমি তোর বুড়ো ছেলে। তোর মনের কথা আমাকে লুকোনো ঠিক নয়। বল্ না?

ধোবী তার দুর্বল হাতে বাবার হাত ধরে। সামান্য হেসে বলে— বাবা! কেন আজ মিছিমিছি এত চিন্তা করছো? আমি অভাগিনী। এই অভাগিনীর জন্যে তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছো।

ধোবী চোখ বন্ধ করে নেয়। চিন্তেই স্বাঁই আরও উদ্বিগ্ন হল। এ অবস্থার জন্য ভাবেন দায়ী, কে! সনিয়া? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সনিয়াই সম্পূর্ণ দায়ী। ধোবীর আশা সে বরবাদ করেছে। মনে আঘাত দিয়েছে। সে আঘাত সহ্য করা ধোবীর পক্ষে শক্ত। চিন্তেই ভেবে দেখলেন সনিয়ার মাথা নীচু করিয়ে এর প্রতিশোধ নেবেন। অন্যথায় বিষ্ণুপুর থেকে সনিয়ার নামের অস্তিত্ব মুছে দেবেন। তারপর ধোবীর শান্তি হবে।

সনিয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। যেদিন চিন্তেই স্বাঁইয়ের বাড়ি

থেকে সে ফিরে এল, সেদিন থেকেই সে বিমনা। গাঁয়ের লোক ভালো করেই জানে, সনিয়া সব সময় চুপচাপ থাকতে চায়। নিজের কাজেও তার মন নেই।

কি হল সনিয়ার? অনেক বার ভেবেছে— কঁই, এই চুপ করে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করে, কিন্তু করেনি। সে জানে, নিশ্চয় এমন কিছু অসামান্য ঘটনা ঘটে গেছে, যাতে সনিয়ার মত ধৈর্যশীল পুরুষও ধৈর্য্য হারিয়েছে। ধনু সংক্রান্তির আগের রাত্তিরে সনিয়া কঁইকে কাছে ডেকে বলে— কঁই! একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কঁই সনিয়ার দিকে তাকায়। যেন বলতে চায়, কি জিজ্ঞেস করার আছে, করো।

—এই বাড়ি— এই সম্পত্তি কার?

—কেন তোমার নয়?

সনিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দেয়— না! আমার নয়। পরের টাকায় এই সম্পত্তি কিনেছি, বাড়ি তৈরী করেছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেছি। আমার পরিশ্রমে অনুর্বর জমি উর্বর হয়েছে। কিন্তু যার টাকায় এই সমস্ত করেছি, যার উৎসাহে আমার সব দুঃখ ভুলেছি— তার ওপর আমি অন্যায় করেছি। তার মনে আঘাত দিয়েছি।

উৎসুক হয়ে কঁই জিজ্ঞেস করল— সে কে? তার ওপর কেন তুমি অন্যায় করেছ?

সনিয়া কি ভেবে আবার বলে— আমি তোমার কাছে একটা কথা গোপন ক'রে গেছি, কঁই। তাই আমার অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু সে কথা আমার মনেই থাক।

—তোমার ভুল কি এখন শুধরে নেওয়া যায় না? যার মনে দুঃখ দিয়েছ, তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারো না?

—এ ব্যাপারে আমি অনেক ভেবেছি। আমি জেনেশুনে তার মনে দুঃখ দিয়েছি। এখন তা শুধরে নেওয়া শক্ত। শোধরাতে গিয়ে হয়তো আমি আরো বড় ভুল করে বসব। নিজের কাছে, আমার মানবিকতার কাছে আমি একজন অপরাধী হয়ে যাব, কঁই! তাই চুপ করে থাকাই···

সনিয়া চুপ করে যায়।

কঁই বলে— কি চুপ করে গেলে যে? বলো না…।

সনিয়া বলল— মনে হচ্ছে এই বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়। ইচ্ছে হচ্ছে যে রাস্তা থেকে উঠে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাই। ঘাম ঝরিয়ে আবার নতুন সংসার গড়ে তুলি।

—কিন্তু কোথায়?

—তা জানিনা। মানুষের কল্পনার পৃথিবী ছোট হলেও, ক্ষিদে মেটাবার জন্য সে অনেক বড়ো। যেদিকে চোখ যাবে— যেদিকে পা নিয়ে যাবে চলে যাব…।

কঁই বলল— ঠিক আছে! এর জন্যে এত দুঃখ কিসের? যতক্ষণ না পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পোঁছুচ্ছি, তোমার হাত ধরে আমিও চলব। কিন্তু যাঁদের তুমি এই বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছ, তাদের কি হবে?

—ওদের কথাই আমি ভাবছি। যে আদর্শ নিয়ে চলেছিলাম, সবাইকে আপন করে নিয়েছিলাম— সেই আদর্শ আজ আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবুও আমি ওদের মরতে দেবনা। আমার রক্ত দিয়ে ওদের আমি বাঁচিয়ে রাখব।

—আমিও তাই করব— কঁই বলে।

সনিয়ার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ওঠে। সে বুঝতে পেরেছে, তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কঁই, কর্তব্যের পথে অযোগ্য প্রমাণ হবে না। ধোবীর জন্যে মনে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে। ধোবীকে ভুল বুঝে কঁইকে ভালবেসেছে। তাই কঁইকে ভালবেসে সে ভুল করেনি।

সনিয়া কঁইয়ের দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে থেকেই দু-হাতে ধরে ফেলে তার মাথা। কাছে টেনে গালে চুমু খায়। লজ্জায় কঁই আর ওখানে বসতে পারে না।

সনিয়ার মনে হয়, বহু দূর থেকে যেন অশ্রু-ভরা চোখে ধোবী তার দিকে তাকিয়ে আছে। ও যেন বলছে— কত অকৃতজ্ঞ তুমি!

সনিয়ার বুকে কষ্ট হয়। সে ডাকে-- কঁই ?

—কি বলছ ?

—এই বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। এর চেয়ে ভালো, রাস্তার ধারে কোন গাছের নীচে ডেরা বাঁধি। এ'-বাড়ির ছাতের তলায় যেন আগুন জ্বলছে।

—রাস্তাকে আমার ভয় নেই।

—জনকাকা, রহিম, ভরত আর কাশী বেজকে ডাকো তো !

কঁই দরজা ঠেলে ভেতরে চলে যায়।

জন সব শুনল। সামান্য হেসে বলল— মানুষ বলতে শুধু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বোঝায় না। এ'ছাড়াও আরো কিছু আছে, যা চোখে পড়ে না। তা হ'ল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভালবাসা ও আরো অনেক কিছু। দেহের সুখের প্রয়োজন মেটালেই মানুষ সমান হয়ে যায় না। পৃথিবীতে সবাইকার সমান হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির এক নিয়মই হল সমান না হওয়া। এই কারণেই দুজন দুরকম। সব সমান হয়ে গেলে জল-ও বইত না। পৃথিবী স্থির হয়ে যেত। পাহাড়ের পাথরের মত মানুষ জাতটাই অনড় হয়ে যেত।

একটু দম নিয়ে জন বলল— পৃথিবীতে ছোট বড়, জাত, ধর্ম আরো সমস্ত কিছু যে আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ হল এই। নতুন কিছু করতে হলে এখানে বাধার সামনে পড়তেই হবে। মন দিয়ে দেখলে, নতুন জিনিস কোথায় ? যাকেই নতুন বলি, তাই হল পুরোন কথার নতুন চেহারা। তাই আমার বক্তব্য, এ সমাজে আমাদের কোন জায়গা নেই। সমাজের বিরুদ্ধে লড়ার মত শক্তি আমাদের নেই। তাই সমাজেই আমাদের থাকতে হবে। সেখানে থেকেই আস্তে আস্তে নতুন নিয়মগুলো আরম্ভ করতে হবে। তা যদি না করতে পারি, এ সমাজ ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে।

সনিয়া বলল— কিন্তু কাকা, এখানে যে আর মুহূর্তও থাকা সম্ভব নয়।

জনকাকা বলল— আমি জানি। এই ঘর ভেঙে ফেলতে হবে। সবাইকে আবার নিজের নিজের রাস্তায় ফিরে যেতে হবে।

রহিম বলে— জনকাকা! আমি চলে যেতে প্রস্তুত। আমি তো এখানে থাকতে আসিনি। সনিয়াদাদা আমাকে আটকে দিয়েছে। কঁইদিদি এই স্নেহের বাঁধন আরো দৃঢ় করেছে। কেউ এখন তাকে ছিঁড়তে পারবে না। সনিয়াদাদার হাত ধরে চলব। যেখানে নিয়ে যাবে, যাবো।

সনিয়া বলল— আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে কাকা? তোমার আশীর্বাদেই তো আমি আর কঁই পরস্পরের জীবনকে বেঁধেছি। তোমার এক হাত ধরবে রহিম আর অন্য হাত আমি। তুমি আমাদের পথ দেখাবে আমরা চলব।

জন অত্যন্ত খুশী হয়। চোখে জল ভরে আসে। আনন্দে অধীর হয়ে সে বলে— তোমরা আমার দুই ছেলে আর দুটি চোখ। তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

কাশী আর ভরতের মুখে বিষন্নতা। কঁই বলে— কাশী আর ভরত দুজন আমার দুর্বল ছেলে। আমি নিজের হাতে না খাওয়ালে ওরা উপোস ক'রে থাকে। কাকা, ওদের দু-হাত ধরে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

কাশী আর ভরতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সনিয়া জিজ্ঞেস করে— কবে যাব, কাকা?

—দেরী করার কি আছে? —জন উত্তর দেয়।

ভোর হতে চলেছে। রাতের শেষ প্রহরের তারা আকাশে কানামাছি খেলছে। ওই তারা অনাদিকাল থেকে আলো দিয়ে আসছে। যে কালে আমাদের পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, নির্ভীক মানব জাতির জন্ম হয়েছে। সব দেখেছে ওই তারা, চিরকাল দেখবে। এমন দিনও আসবে, যখন আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে— এ সংসার ধ্বংস হবে। সেই সময়েও ওই

তারারা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ধোবী শিউরে ওঠে।

সেদিনকার ঘটনা তার মনে পড়ে যায়ঃ সনিয়ার কাঁধে কই মাথা রেখে আছে— ভয়ে, প্রেমে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার চোখ। অজান্তে ধোবীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে— অকৃতজ্ঞ।

ধোবী দরজার বাইরের দিকে তাকায়। অন্ধকার ছেয়ে গেছে। বাইরে ভয়ঙ্কর আবহাওয়া। পূব আকাশে একটি মাত্র তারা ঝিকমিক করছে। উপহাস করছে যেন।

আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে চিন্তেই স্বাঁই ধোবীর কাছে এসে বললেন। —কি হয়েছে, মা? কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? —তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ধোবীর কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। —মানুষ জাতটাই বড় অকৃতজ্ঞ, মা! মানুষকে কৃতজ্ঞ করে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সনিয়া আবার আসবে। আবার আমার কাছে মাথা নীচু করে আকুতি জানাবে। তুই চিন্তা করিস না। — তিনি বললেন।

ধোবী অস্থির হয়ে ওঠে। ঘরের চারিদিকে চোখ বুলোয়। —বাবা! —মৃদু গলায় সে ডাকে।

—কি মা?

—সনিয়াদাদাকে ক্ষমা করে দিতে পারো না? চিন্তেই স্বাঁই কি ভেবে বললেন— ক্ষমা করতে পারি, মা! কিন্তু একবার অন্ততঃ আমাদের বাড়ি আসুক— সামনে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা বলুক। আমার বিশ্বাস, ও আসবে— নিশ্চয় আসবে। ওর শাস্তি আমি ঠিক করে রেখেছি।

—শাস্তি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাস্তি! তোর কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। বাবা কি ছেলেকে শাস্তি দেয় না? আমার দলিল যত্ন করে রাখা আছে। সনিয়া খুবই ভালো ছেলে। ও তো বলেছে, আমি যে শাস্তি দিই না কেন ও মাথা নীচু ক'রে মেনে নেবে। ও নিশ্চয় স্বীকার করে

নেবে। ওর হাতে সব সম্পত্তি সঁপে দেব···আর···।

—না, না, বাবা! ওর অকৃতজ্ঞতার শাস্তি, হওয়া উচিত। ও পুরস্কারের যোগ্য নয়। ওকে শাস্তি দাও বাবা!

বলতে বলতেই ধোবী বালিসে মুখ লুকোয়। তার চোখ কাঁদে না, কাঁদে তার আত্মা।

চিন্তেই স্বাঁই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

ধোবী মাথা তুলে আবার জিজ্ঞেস করে— কাকা কি আসেন নি?

—বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে ওর ফেরার কথা। কাল আসবে। আমি খরব পাঠিয়েছি।

একটু থেমে ধোবী বলে— বিদেইকে আমি পোষ্য নেব, বাবা। তুমি ব্যবস্থা কর। এখন আমি তোমার কথা শুনতে রাজী।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের মুখ থেকে আস্তে করে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে— পাগলী!

ধনু সংক্রান্তি।

সময়টা সকাল। চিন্তেই স্বাঁই গাঁয়ের লোকজনদের ডেকেছেন। সকলের সামনে তিনি বললেন— ঠাকুরের মন্দির তো আছে, কিন্তু মন্দিরের কাজ চালাতে কিছু টাকার ব্যবস্থা করা দরকার।

দলিলপত্র প্রহরাজের হাতে বাড়িয়ে দিয়ে চিন্তেই বললেন— সনিয়ার যাবতীয় সম্পত্তি দেবত্র হিসেবে কেনা হয়েছে। আইনমতে দখলও নেওয়া হয়েছে। হাজার হোক ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে তো! আমি ওকে ঠিক পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি সার্থক হইনি। অন্যায় ক'রে ও কতদিন গাঁয়ে থাকবে? আমরা তো ভেড়া-ছাগলের মত জন্তু নই। কত আর ওর অন্যায় সহ্য করব? দেবত্র সম্পত্তি গাঁয়ের লোকের দখল করা দরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সাবধানে চলতে হবে।

স্বাঁইমশাই বললেন— কারোর সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না। কেউ যেন মার না খায়। যারা বসে বসে খাচ্ছে, তাদের ওখান থেকে

সবাইকে তাড়াতে হবে।

সেবা বেহেরা বলল— কিন্তু আদালতের ভয় যে আছে।

—আরে, তোমরা চিন্তা ক'রো না। আদালতের সব ব্যাপার আমি সামলে নেব। —সাঁইমশাই আশ্বাস দিয়ে বললেন— জমি খালি পড়েছিল। তোমরা তার ওপর বাড়ি তৈরী করেছ। ধান ফলিয়েছ। অর্দ্ধেক ফসল তোমরা কেটে নিয়েছ। বাকী ফসল আজ কাটা হবে।

এতক্ষণে কথার উদ্দেশ্যটা সেবা বেহেরা বুঝতে পারল। বিনি কাণ্ডী জিজ্ঞেস করল— ওরা যদি আমাদের কাজে বাধা দেয়? আমাদের যদি মারতে আসে, তাহলে কি হবে?

সাঁই বললেন— তাই যদি হয়, তোমাদের কাজ তোমরা সেরে নিও। তবে হ্যাঁ, বেশী কিছু গোলমাল হ'লে, আমাকে খবর দিও।

একটু থেমে সাঁই বললেন— সনিয়ার জমি থেকে যা পাওয়া যাবে, তাতে এক বছরের মন্দিরের খরচ চলতে পারে না। তাই আমার জমি থেকে পনেরো একর আমি মন্দিরের নামে রেজিস্ট্রী করে দিয়েছি। সেই জমির ধান এখনো কাটা হয়নি। সনিয়ার জমির ধান কাটা হয়ে গেলে কেটে নিও। সনিয়ার বাড়ির পাশে সমস্ত ধান একত্র ক'রো।

এ তো খুব ভালো কথা। গাঁয়ের লোকে খুব খুশী হ'ল। হরিবোল দিতে লাগল। প্রহরাজ আনন্দে অধীর হয়ে বললেন— ধন্য সাঁই মশাই! আপনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। ধর্মাত্মা হিসেবে আপনার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সাঁই বললেন— আজ ধনু সংক্রান্তি। ঠাকুরকে খইয়ের প্রসাদ দেওয়া হবে। প্রহরাজ মশাই, আজ রাত্তিরে ভোগের ব্যবস্থা করুন। গাঁয়ের লোক ছাড়া-ও বাইরে থেকে যারা আসবে, সবাই ভোগ পাবে। খরচ যা হবে, আমি দেব। একটা ভালো তিথি দেখে চব্বিশ প্রহর কীর্তনের ব্যবস্থা-ও করুন। তার খরচও আমার। এ বছর থেকেই

শুরু করা যাক। পরের খরচ মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে দেওয়া যাবে।

প্রহরাজ বললেন, স্বাঁইমশাই একজন মহান ধর্মাত্মা। লোকে আবার হরিবোল দিল। স্বাঁইমশাইয়ের হুকুমে লোকজন গাঁয়ের রাস্তায় চলে গেল। প্রহরাজ একা বাড়িতে থাকলেন।

প্রহরাজকে আরো কাছে ডেকে স্বাঁই বললেন— দেখো, সনিয়া আমাদের গাঁয়ের ছেলে। ওকে বিপদে ফেলি কেন? ওর বিরুদ্ধে সত্যিই কিছু করতে চাই না। ওকে আমি ঘেন্না করিনা। লঙ্গরখানা থেকে যারা এসে ওর বাড়িতে জুটেছে, ওরাই ওকে উস্কানি দিচ্ছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সনিয়া খুব আরামে গাঁয়ে থাকবে। হাজার হোক ও আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে তো! বাড়ি ক'রে সুখে থাকুক— এই তো আমি চাই।

প্রহরাজের সন্দেহ হ'ল। এবার কি উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। চিন্তেই তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন— তবে হ্যাঁ, ঠাকুর— দ্বারের সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। আপনি ওকে গিয়ে বলুন— ও যদি আমার কাছে এসে ক্ষমা চায়, আমার কথা মেনে নেয়, তাহলে ওর যত জমি মন্দিরের কাজে নেওয়া হয়েছে, তার দ্বিগুণ আমার সম্পত্তি থেকে দেব। এ ছাড়া ওর বাবার জমিও ফিরিয়ে দেব।

এই কথা শুনে প্রহরাজমশাই খুবই চিন্তায় পড়লেন।

স্বাঁই আবার বললেন— শুনুন! ওকে আড়ালে সব কথা বুঝিয়ে দেবেন। ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে। আপনার কথায় ও যদি পথে ফেরে, তাহলে পাঁচ একর সরেস জমি আপনিও পুরস্কার হিসেবে পাবেন। আমার থেকে ওই জমি আপনার নামে রেজিস্ট্রী করিয়ে দেব। বুঝলেন?

প্রহরাজ খুসী হলেন। জমির নাম শুনেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি জানেন, স্বাঁইমশাইয়ের যেমন কথা তেমন কাজ। একটু নস্যি নিয়ে উনি বললেন— এই ছোট কাজটা আমি করতে পারবনা? সনিয়া কিছুতেই আমার কথা ফেলতে পারবে না।

—যান— চিন্তেই স্বাঁই বললেন।

প্রহরাজ খুসী হয়ে চলে গেলেন। সঁাই দীর্ঘশ্বাস নিলেন আর ভাবনা চিন্তায় ডুবে গেলেন।

সকাল ন'টা···।

পূজো শেষ ক'রে ধোবী ঘর থেকে বেরোয়। খুব দুর্বল হয়ে গেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। রক্ত-মাংসহীন শরীরটা কেঁপে উঠছে। সামনে যেন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। কিছুক্ষণ সে ঠাকুর-ঘরের দরজা ধরে দাঁড়াল। চোখ খুলছে না। দরজায় মাথা দিয়ে সে আবার চোখ বন্ধ ক'রে নেয়— হে রাধামাধব! আর কতদিন কষ্ট দেবে? আমার অপরাধের শাস্তি কি শেষ হয়নি?

বল্লী ঝি ধোবীকে দেখতে পায়। —অষুধ খাবার সময় হয়েছে, দিদি! —সে বলে— দেখো তো কত বেলা হয়ে গেছে।

বল্লীর সাহায্যে আস্তে আস্তে ধোবী তার ঘরের দিকে এগোয়। বিছানায় বসে পড়ে। ওখানে শুয়ে কদিন সে ছটফট করেছে। কিন্তু বিছানায় পড়ে পড়ে দুঃখের সঙ্গে একটু শান্তিও কিন্তু পেয়েছিল। স্বর্গতঃ মানুষগুলোর স্মৃতি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। 'যাঁরা আশেপাশে ঘুরতেন, তাঁরা আজ নেই। তাঁরা ওকে ভালোবাসতেন, হেসে কথা বলতেন। চোখের সামনে তাঁদের মুখ ভেসে উঠেছে। কত সুন্দর স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন দেখলেই এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত—ধীরে ধীরে মন চলে যেত আরেক পৃথিবীর দিকে।

প্রহরাজের নাতনী পার্বতী এসে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধোবী তার দিকে তাকাল। পার্বতী তার কাছে এসে ধোবীর হাতে হাত বুলিয়ে দিল। বল্লী অষুধের গেলাস নিয়ে এল। ধোবীর মুখের কাছে ধরে বলল— খেয়ে নাও, দিদি!

ধোবী মুখ ফিরিয়ে নেয়। —অষুধ খাবে না, দিদি? —পার্বতী বলে।

—আমার অষুধ লাগবে না। বড় বিচ্ছিরি। আমি খাব না।

—এমন ক'রো না। খেয়ে নাও···।

—কেন অষুধ খাব? আমার শরীর তো ভালো হয়ে গেছে। ধোবী আবার পাশ ফিরে শোয়। বল্লী বলে— বাবুকে ডেকে আনি। নইলে দিদি অষুধ খাবে না।

অষুধের গেলাস রেখে বল্লী বেরিয়ে যায়।

ঘরে আবার নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে।

গাঁয়ের কিছু লোকজনের হৈচৈ দূরে শোনা যাচ্ছে, ধোবী একমনে শুনছে। হ্যাঁ, কয়েকজন হরিবোল ধুয়ো তুলেছে। সে জিজ্ঞেস করল— কিছু শুনতে পাচ্ছো, পারো?

—তুমি জানো না? —পারো বলে— দাদু আজ তোমাদের বাড়ি এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে আমাদের চাকর শিবাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। একটা লাঠিও নিলেন। জিজ্ঞেস করাতে বললেন— আজ সনিয়ার বাড়ি দখল করা হবে। —কিন্তু যখন কারণ জিজ্ঞেস করলাম— উনি কোন উত্তর দিলেন না।

ধোবী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বল্লীর পিছন পিছন চিন্তেই স্বাঁই ঘরে ঢুকে বললেন— অষুধ খাচ্ছ না কেন, মা? নাও, খেয়ে নাও!

বাবার অনুরোধে ধোবী অষুধ খেয়ে নিল। ইচ্ছে হ'ল, সনিয়ার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কথা সরে না। ঠোঁট কেঁপে ওঠে। বলল— কাকা আসেন নি, বাবা?

চিন্তেই স্বাঁই বিছানায় বসে পড়লেন। মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। খুব রোগা হয়ে গেছে। একটা কঙ্কালের মত দেখাচ্ছে। চিন্তেই ভাবেন পুরোনো দিনের কথা। মানুষ কঙ্কাল হয়ে গেছে। তাঁর বাড়িতে এসে ভিক্ষে চাইছে। সবাইকে তিনি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

তবুও তাঁর আশা আছে সনিয়া ফিরে আসবে। প্রহরাজ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ধোবীর মুখে আবার হাসি ফুটবে। ধোবী আবার সেরে উঠবে।

—বাবা! কাকা কেন আসছেন না?

—আসবে, মা! —চিন্তেই বললেন— এখনো ওপারে আছে। নদীতে কোনো মাঝি ছিল না। আমি একজন লোক পাঠিয়েছি। সে পার ক'রে দেবে। শিগগিরই তোমার কাকা এসে পৌঁছে যাবে।

ধোবী চুপ ক'রে থাকে। ভাবে— পরের প্রাণ বাঁচাতে যাঁরা নিজের জীবন দিয়েছেন, তাঁদের অমর আত্মা ওই পৃথিবী থেকে ব্যাকুল-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন তাঁরা আসবেন কি ক'রে? কার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন? তাঁদের অভ্যর্থনা করতে তার বুকের অমৃত-ঝোরা তো উথলে উঠল না? সে আজ চোখ বুঁজলে পূর্ব-পুরুষদের আত্মার তৃষ্ণা মেটাবে কে?

ধোবী বলে— দত্তক নেবার লেখাপড়া হয়ে গেছে কি, না হয়নি? বাবা, আমি বিদেইকে পোষ্য নেব!

কি উত্তর দেবেন? —চিন্তেই স্বাঁই ভাবতে লাগলেন। ধোবী যেন উপহাস করছে।

প্রহরাজ খুব খুসী। তিনি ঘরে ঢুকতেই স্বাঁইমশাই উঠে দাঁড়ালেন। দূর থেকে গ্রামবাসীদের ধুয়ো শোনা যাচ্ছে— হরিবোল!

উদ্বিগ্ন হয়ে স্বাঁই জিজ্ঞেস করলেন— কি ব্যাপার, প্রহরাজমশাই? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

—গাঁয়ের লোকে ধান কাটতে লেগে গেছে। কয়েকজন সনিয়ার বাড়ি দখল করেছে। খুব শান্তিতে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। —প্রহরাজ স্বাঁইকে সব বললেন।

ধোবী একমনে সব শুনছে। স্বাঁই বললেন— আচ্ছা, সনিয়ার অবস্থা কেমন?

—সনিয়া তো বাড়িতে নেই। ভগবান জানেন কোথায় চলে গেছে। বাড়ি খোলা পড়ে আছে। —প্রহরাজ বললেন।

চিন্তেই স্বাঁই অকূল চিন্তায় পড়লেন। ধোবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটা পাথরের মূর্তির মতন শুয়ে আছে। চোখ স্থির। কাঁপা ঠোঁট থেকে কিছু শব্দ গভীর যন্ত্রণায় বেরিয়ে আসছে··· ।—

বাড়ি ছেড়ে সনিয়া চলে গেছে। স্বাঁইমশাই বুঝে নিলেন, সনিয়াকে তিনি শাস্তি দিতে পারলেন না। চিন্তেই স্বাঁইয়ের গর্বিত বুকে সনিয়া যেন একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেল। অস্থির হয়ে তিনি বললেন— বল না, প্রহরাজ, সনিয়া কোথায় চলে গেছে?
—কেউ জানে না। অনেকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ তার খবর জানে না। বাড়ি খোলা পড়ে আছে। দরজার শেকলে এই কাগজটা ঝোলানো ছিল। —প্রহরাজ এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন।
—কাগজ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ! এই নিন। এতে লেখা আছেঃ এই বাড়ি, সমস্ত সম্পত্তি ধোবীর টাকায় তৈরী হয়েছে।

ধোবী চিৎকার করে ওঠে— না, না, না।

চিন্তেই স্বাঁইয়ের কম্পিত হাত থেকে কাগজটা পড়ে যায়। ধোবী ওঠার চেষ্টা করে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। উঠতে পারে না। বালিসে আবার মুখ ঢাকে। মুখের দুটি শব্দ বেরিয়ে আসে— ওঃ! ভগবান!!

ধোবীর চোখ বুজে আসছে— ধীরে— খুব ধীরে। এই দেখে চিন্তেই স্বাঁই আরো অস্থির হয়ে ওঠেন। ধোবীর কপালে হাত রেখে খুব আদরের সঙ্গে ডাকেন— ধোবী! আমার লক্ষ্মী ধোবী!!

ধোবী কোন উত্তর দেয় না। ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে···।

—আমাকে পাথরের মত কঠোর ক'রে দাও, বোবা ক'রে দাও, ভগবান! ঠিক তোমার মত।

Printed at Modern Printes, K-30, Naveen Shahdara Delhi-110032